ও নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

ষোড়শ বর্ষ, ১৩১৯ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবক রামচন্দ্র প্রবর্ত্তিত

ও সেবকমণ্ডলী পরিচালিত।

তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়।

৮০।১ নং করপোরেসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

কলিকাতা;

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ৫০০ শত উপদেশ ও বিবিধ শাস্ত্রাদি হইতে তাঁহার সম উক্তি এবং বাক্য। ২য় সংস্করণ, মূল্য ॥০ আট আনা।

পূজার ফুল।

মানবান্তরে প্রেম, ভক্তি ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপক বিবিধ সৎপ্রবন্ধ। মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসার।

ঠাকুরের সুমধুর জীবনচরিত। ২য় সংস্করণ, মূল্য ।০ চারি আনা।

অষ্টকালীন পদাবলী।

ঠাকুরের জীবনের মধুময় ভাব-চিত্র। মূল্য ।০ চারি আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তিশতক।

নিত্যপাঠ্য বাছাই উপদেশ,—২য় সংস্করণ, মূল্য ৴০ এক আনা।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

বৈশাখ, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

শ্রীনাম রামকৃষ্ণায়ন।

(আদ্যলীলা)

১। পরব্রহ্ম নিরঞ্জন রামকৃষ্ণ
২। পরমাত্মা স্বরূপক রামকৃষ্ণ
৩। কলি-কল্মষ নাশন রামকৃষ্ণ
৪। ভক্ত-প্রাণধন রামকৃষ্ণ
৫। বিধৃত শরীর রামকৃষ্ণ
৬। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ
৭। খুদিরাম-নন্দন রামকৃষ্ণ
৮। চন্দ্রমণি-জীবন রামকৃষ্ণ
৯। গদাধর খ্যাত রামকৃষ্ণ
১০। ধনী ক্রোড়াশ্রিত রামকৃষ্ণ
১১। হনুসঙ্গে ক্রীড়ারত রামকৃষ্ণ
১২। পণ্ডিত বিজয়ী রামকৃষ্ণ

জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!

১৩। গোষ্ঠলীলা প্রিয় রামকৃষ্ণ
১৪। বিদ্যালয়গত রামকৃষ্ণ
১৫। গয়াবিষ্ণু-সখা রামকৃষ্ণ
১৬। চিনিবাস-বন্দিত রামকৃষ্ণ
১৭। বিধিতঃ উপবীত রামকৃষ্ণ
১৮। ধনী-ভিক্ষা গ্রাহক রামকৃষ্ণ
১৯। অভিনয় পটু রামকৃষ্ণ
২০। জন-মনোহারী রামকৃষ্ণ

(মধ্যলীলা)

২১। রামকুমারানুগ রামকৃষ্ণ
২২। কলিকাতাস্থিত রামকৃষ্ণ
২৩। দক্ষিণেশ্বরস্থ রামকৃষ্ণ
২৪। মথুর সর্ব্বস্ব রামকৃষ্ণ

জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!

২৫। ভবতারিণী-শ্লোক রামকৃষ্ণ
২৬। রাধাকান্ত-পূজক রামকৃষ্ণ
২৭। রাসমণি আরাধিত রামকৃষ্ণ
২৮। হৃদয়-সেবিত রামকৃষ্ণ
২৯। জন্মভূমিগত রামকৃষ্ণ
৩০। কৃত শুভোদ্বাহ রামকৃষ্ণ
৩১। জয়রামবাটীস্থিত রামকৃষ্ণ
৩২। শ্রীমাতা মিলিত রামকৃষ্ণ
৩৩। পরিহাস-পটু রামকৃষ্ণ
৩৪। লীলারসময় রামকৃষ্ণ
৩৫। দক্ষিণ-সহরে রামকৃষ্ণ
৩৬। সাধন তৎপর রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!
৩৭। গঙ্গাতীরস্থিত রামকৃষ্ণ
৩৮। পঞ্চবটীমূলে রামকৃষ্ণ
৩৯। বিল্বতরুতলে রামকৃষ্ণ
৪০। পঞ্চমুণ্ডাসনে রামকৃষ্ণ
৪১। বদনে মা মা রব রামকৃষ্ণ
৪২। অশ্রুপূর্ণ নেত্র রামকৃষ্ণ
৪৩। সরল বালক রামকৃষ্ণ
৪৪। উন্মত্ত প্রেমিক রামকৃষ্ণ
৪৫। ব্রাহ্মণী-অভীষ্ট রামকৃষ্ণ
৪৬। প্রচারিত স্বরূপ রামকৃষ্ণ
৪৭। শ্রীচৈতন্যরূপ রামকৃষ্ণ
৪৮। গৌরী দর্পহারী রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ!
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!
৪৯। গৌরী উদ্ধারক রামকৃষ্ণ
৫০। বৈষ্ণবচরণ স্তুত রামকৃষ্ণ

৫১। জ্যোতির্ম্মণ্ডিত তনু রামকৃষ্ণ
৫২। মহাযোগেশ্বর রামকৃষ্ণ
৫৩। হনুভাব ভাবিত রামকৃষ্ণ
৫৪। রামলীলা-জীবন রামকৃষ্ণ
৫৫। মথুর পরীক্ষিত রামকৃষ্ণ
৫৬। মদন বিজয়ী রামকৃষ্ণ
৫৭। কাম-কাঞ্চন ত্যাগী রামকৃষ্ণ
৫৮। সর্ব্বাবতার-মূল রামকৃষ্ণ
৫৯। শ্যামা-শিবরূপে রামকৃষ্ণ
৬০। মথুর স্তাবক রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!
৬১। তোতাপুরী-দীক্ষিত রামকৃষ্ণ
৬২। নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ
৬৩। যশোদা ভাবাশ্রিত রামকৃষ্ণ
৬৪। রাধাভাব রঞ্জিত রামকৃষ্ণ
৬৫। গোরাগুণ কীর্ত্তনে রামকৃষ্ণ
৬৬। মোহন নর্ত্তন রামকৃষ্ণ
৬৭। সঙ্গীত সুধাস্রাবী রামকৃষ্ণ
৬৮। জ্ঞান ভক্তি দাতা রামকৃষ্ণ
৬৯। খ্রীষ্ট ইসলাম সিদ্ধ রামকৃষ্ণ
৭০। মেরী-তনয়রূপী রামকৃষ্ণ
৭১। কৃত ধর্ম্ম-সমন্বয় রামকৃষ্ণ
৭২। যুগ ধর্ম্মস্থাপক রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!
৭৩। শ্বশুর ভবনগত রামকৃষ্ণ
৭৪। ষোড়শী পূজন রত রামকৃষ্ণ
৭৫। তীর্থ পর্য্যটনে রামকৃষ্ণ
৭৬। বারাণসীধামে রামকৃষ্ণ

৭৭। ত্রৈলঙ্গ অভ্যর্থিত রামকৃষ্ণ
৭৮। দেহে লীন মহাদেব রামকৃষ্ণ
৭৯। বৃন্দাবনধামে রামকৃষ্ণ
৮০। লীলাস্থল বিহারী রামকৃষ্ণ
৮১। গঙ্গামাতা প্রাণ রামকৃষ্ণ
৮২। দুলালী অভিহিত রামকৃষ্ণ
৮৩। পানিহাটী উৎসবে রামকৃষ্ণ
৮৪। কীর্ত্তন তরঙ্গে রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!
৮৫। শ্রীগৌরাঙ্গ আসনে রামকৃষ্ণ
৮৬। বলরাম-মন্দিরে রামকৃষ্ণ
৮৭। স্বদেশ প্রস্থিত রামকৃষ্ণ
৮৮। মহাসংকীর্ত্তনে রামকৃষ্ণ

(অন্ত্যলীলা)

৮৯। কেশব প্রচারিত রামকৃষ্ণ
৯০। বিজয়াদি বেষ্টিত রামকৃষ্ণ
৯১। রাম নরেন্দ্র প্রাণ রামকৃষ্ণ
৯২। সহজ সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ
৯৩। রাখাল প্রাণারাম রামকৃষ্ণ
৯৪। মহেন্দ্র জীবন রামকৃষ্ণ
৯৫। গিরীশ বকল্মাগ্রাহী রামকৃষ্ণ
৯৬। কালীরূপে পূজিত রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!
৯৭। লক্ষ্মীদেবী বৎসল রামকৃষ্ণ
৯৮। দুর্গাচরণ ইষ্ট রামকৃষ্ণ
৯৯। রামলাল-সেবিত রামকৃষ্ণ
১০০। ব্রাহ্মণী শোকাপহ রামকৃষ্ণ
১০১। অক্ষয় গীত গুণ রামকৃষ্ণ
১০২। শরৎ শশী সেবিত রামকৃষ্ণ
১০৩। জীবপাপ ভারবাহী রামকৃষ্ণ
১০৪। স্বীকৃত ব্যাধিক রামকৃষ্ণ
১০৫। কাশীপুরস্থিত রামকৃষ্ণ
১০৬। কল্পতরুরূপী রামকৃষ্ণ
১০৭। নিত্যপদস্থিত রামকৃষ্ণ
১০৮। গোলোকবিহারী রামকৃষ্ণ
জয় জয় জয় রামকৃষ্ণ !
জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ !!

---:o:---

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র।

ভারতের সাহিত্য-গগন হইতে আর একটী অতুলনীয় সমুজ্জল জ্যোতিষ্ক স্বকার্য্য সাধন করিয়া হাসিতে হাসিতে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ, বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য জগতের একছত্র চক্রবর্ত্তী সম্রাট, নটকুল-চূড়ামণি, নানা বিদ্যাবিশারদ, অসাধারণ প্রতিভাশালী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ বীরভক্ত শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ৬৮ বৎসর বয়সে সংসার রঙ্গমঞ্চের লীলাভিনয় সমাধা করিয়া, গত ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায়

১—২০ মিনিটের সময় (9th February 1912 at 1-20 A. M.) আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও দর্শকগণের সম্মুখে সহাস্যবদনে তাঁহার নশ্বরদেহ মন্দিরটি রক্ষা করিয়া ধীরপদসঞ্চারে সাধারণের অলক্ষ্য-পথে চির-ঈপ্সিত আনন্দময় রামকৃষ্ণ-লোকে গমন করিয়াছেন।

নাট্য-সম্রাট কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম বা তাঁহার বিষয় কিছু না কিছু জানেন না, বঙ্গে এমন কেহ আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ না হইলেও ৬৮ বৎসর ব্যাপী জীবনকাহিনী, কার্য্যপ্রণালী, সুখ দুঃখ, কর্ম্মাকর্ম্ম, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধিভাবসঙ্কুল বিচিত্র ঘটনায় এমনি পরিপূর্ণ যে, তাহা যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করা এ ক্ষুদ্র লেখনীর ত দূরের কথা—বোধ করি খ্যাতনামা সূক্ষ্মদর্শি শ্রেষ্ঠসাহিত্য সেবীরাও, সক্ষম হন কিনা সন্দেহ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে এ অধমের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা বাতুলতা কেন?

এ দাস অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও মহাত্মার সহিত গুরুতর বা আন্তরিক সম্বন্ধ বিধায়, এবং ঘনিষ্টতা হেতু, সময়ে সময়ে তিনি যে আমাদের কত আবদার নিজগুণে সাধ করিয়া সহ্য করিয়াছেন, কতদিন তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় আমাদের অশান্ত প্রাণে শান্তি দিয়াছেন, কখন বা পরমাত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসিয়া আমাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে কৃতার্থ করিয়াছেন, এ জীবনে আর তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা কোথা? আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারই কথা, তাঁহারই গুণগাথা হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যেন শতমুখী হইয়া আপনাপনি প্রকাশ হইতেছে, চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিনা, কি করিব! তাঁহার দুই এক কথা পাঠকগণকে শুনাইলে বোধ করি ব্যথিত হৃদয় কথঞ্চিত শান্ত হইবে।

কলিকাতা মহানগরীর বাগবাজার বসুপাড়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ৺নীলকমল ঘোষ মহাশয়ের মধ্যমপুত্র পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সন ১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন সোমবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীর অষ্টম গর্ভজাত-ক্ষণজন্মা সন্তান হইলেও, বাল্যকালে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে সহধর্ম্মিণীর লোকান্তরজনিত দুর্দ্দমনীয় মর্ম্মব্যথা ও সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত ঘটিত যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশবাবু দুরন্ত ও উদ্ধত-স্বভাব বিশিষ্ট হইলেও নির্ভীকতা ও একটা অসাধারণ গুণ তাঁহাতে প্রকাশ ছিল যে, তাঁহার কোন

কার্য্য, ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক, পিতার নিকট কিছুই লুকাইয়া বা কৌশলে ছাপাইয়া রাখিতেন না ; নিজ দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া পিতাকে অন্যের নিকট উপহাস্যাস্পদ বা অপ্রতিভ করেন নাই, বা করিতে প্রয়াস পান নাই। যাহা করিতেন, অকপটে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই অকপট অর্থাৎ "মন-মুখ এক" ভাব শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল প্রকাশ ছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে আরও কয়েকটী মহৎগুণ যেন জ্বল জ্বল করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সাহিত্য ও কর্ম্মানুরাগ, জীবন্ত প্রতিভা, পরদুঃখকাতরতা, অহমিকাশূন্যতা এবং গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস ও তৎ-পদে অচলাভক্তি।

তাঁহার ভাব-প্রবণ মনে যখন যে কর্ম্মের ভাব জাগরিত হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না। আজীবন—এমন কি রুগ্ন অবস্থাতেও তিনি নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। তিনি নানা দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের যে কত পুস্তক, কত পত্রিকা (Magazine) পাঠ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই অনুরাগ ক্রমশঃ এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আসিতেন, তাহারা দেখিয়া অবাক হইতেন। এমন কি বৃদ্ধ বয়সে যুবক ছাত্রের ন্যায় হোমিওপ্যাথিক বড় বড় গ্রন্থ পাঠ, সমাগত রোগী পরিদর্শন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিবরণ শ্রবণ, বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার সহিত তাহাদিগকে ঔষধ প্রদান করিতে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। তিনি যে সকল রোগীকে ঔষধ প্রদান করিতেন, তাহাদের শান্তির জন্য বিশেষ চিন্তিত থাকিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, গরীব পাড়া-প্রতিবাসীদের কঠিন কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হয় না বলিয়াই তাঁহার পুনরায় হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন। জীবন্ত প্রতিভাগুণে নাট্যজগতে যেন একটী নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। অভিনয়ের জন্য পুস্তকের অভাব হওয়াতে, তিনি লোকশিক্ষাপূর্ণ, চিত্তবিনোদন লোমহর্ষণকারী জীবন্ত চিত্র সমন্বিত খাঁটীভাবপূর্ণ প্রাণস্পর্শী ভাষায় নূতনছন্দে কি পৌরাণিক, কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি উপাখ্যানমূলক শতাধিক নাটক রচনা করিয়া সাহিত্য ও নাট্যজগতে শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবসংক্রমণকারী রচনা নৈপুণ্যের এতদূর প্রভাবে যে, কত লোক আমোদ প্রমোদ রঙ্গরস সম্ভোগ আশায় অর্থব্যয়পূর্ব্বক থিয়েটার দর্শন করিতে গিয়া তাহাদের জীবনের স্রোত তাহাদের অজ্ঞাতসারে ওলট্ পালট্

লইয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীত, সাধক ও সিদ্ধপুরুষদিগের প্রার্থনা ও ভজন-সংগীতের ন্যায় বাঙ্গালীর মুখে মুখে গীত হয়। আর তিনি এই প্রকার সংগীত হাফ্‌আকড়াই, পাঁচালি, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির গান যে কত রচনা করিয়াছেন, বা তাহার সংখ্যা কত, তাহা গিরিশবাবুরই অজ্ঞাত ছিল। প্রতিভা তাঁহার চিরসহচরী ছিল।

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বা চরম সার্থকতা সৎগুরু বা ঈশ্বর লাভ। গুরুবাক্যে ঠিক ঠিক ষোলআনা পূর্ণবিশ্বাস বা শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপাই তৎলাভের একমাত্র উপায়। ইহা যখন যাহার ভাগ্যে ঘটে তিনি মহা ভাগ্যবান। করুণাময় ভগবানের কৃপবারি-সিঞ্চন অনবরতই হইতেছে, উপযুক্ত আধার ব্যতীত ইহা তিষ্ঠিতে পারে না। পাত্র বা আধার যত মহান ও ধীর হইবে, ধারণাও তত অধিক হইবে। আধার সচঞ্চল হইলে আধেয় বস্তু অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেনা, ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। প্রয়োজন বা পিপাসা না থাকিলে অর্থাৎ পাত্রাধার যদি উল্টা বা নতমুখী থাকে,—তাঁহার কৃপাবারি আধার স্পর্শ করিয়াও স্থান পাইবে না। আমাদের পূজনীয় গিরিশবাবুর জীবনে সৎগুরু লাভ অধ্যায়টী অতি মনোরম, চিত্তবিনোদন ও আশাপ্রদ। এবং মানবজীবনের প্রার্থনীয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন যুবক গিরিশচন্দ্র, হিন্দুসমাজের তৎকালীন ধর্ম্মভাবের অবনতি অনুভব করিয়া এবং কয়েকটী ঘৃণাজনক দৃষ্টান্ত চাক্ষুস দর্শনে তাহার প্রতি বীতরাগ হওতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। গিরিশবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন—"স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে ফিরিয়াই, দেওয়ালের মাটী গাড়ুর জলে গুলিয়া ফোঁটা কাটিয়া ভট্টাচার্য্য পুরোহিত গঙ্গাস্নানের ভাণ করিয়া যজমান বাড়ী শালগ্রামের পূজা করিতে গিয়াছেন। দেবতার উপর তখন পুরোহিতের এইরূপ বিশ্বাস ভক্তি।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মদিগের সহিত কিছুকাল উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই এমন একটী ঘটনা তাঁহার নয়নগোচর হইল, যাহাতে তিনি এখানেও বিষম ব্যথা পাইলেন। 'মনে এক মুখে আর' ভাবের ঘরে চুরি হইতেছে, সাধুতা কেবল ভাণমাত্র ভাবিয়া মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, আর কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া একেবারে কালাপাহাড় বিশেষ হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, সাধু দেখিলেই তাহার চিম্‌টে কাড়িয়া লইয়া নির্যাতন করিতে

ছাড়িতেন না। "তাঁহার মন হইতে ঈশ্বর শব্দটী যেন দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্নিহিত পঞ্চকূট পাহাড়ের দুর্গমস্থানে পতিত হইয়া ভয়ে ঈশ্বর শব্দটী তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান গিরিশবাবু আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিয়াছিলেন 'কি? ভয়ে ঈশ্বর বলিলাম! কখন বলিব না। যদি কখন প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাঁহার নাম গ্রহণ করিব!"

ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের একটী মজ্জাগত সুলক্ষণ আছে—ঈশ্বর জ্ঞান ও বিশ্বাস। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সুশিক্ষার অভাবে সঙ্গদোষে বা অবস্থাচক্রে যতই কেন মনের অবস্থা মলিন হউক, বা নাস্তিকভাব ধারণ করুক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেই হইবে। দুর্দ্দিন তাহার সোপান। স্বার্থ-সুখ, ভোগানন্দ কতদিন চলে! কালচক্রের অপ্রতিহত গতি প্রভাবে তিনি এমন এক বিষম বিপদে পড়িয়া গেলেন যে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। বিপদ-জাল হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় না দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে হিন্দুর মজ্জাগত ভাব জাগিয়া উঠিল;—ভাবিলেন ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলেন যে, হে ঈশ্বর যদি থাকো, তবে এ অকূলে আমায় কূল দাও।" গীতার উল্লিখিত অভয়বাণী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। ভগবান বলিয়াছেন "কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই।" সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, অবিলম্বে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার আশা সূর্য্যোদয়ে দূর হওয়াতে তিনি যেন বিপদ-সাগরে কূল পাইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার নাছোড় বান্দা; ঈশ্বরের নাস্তিত্ব বিষয়ে অনেকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহার সংস্কার যায় কোথা? মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়া গিরিশবাবুর হৃদয়কে বড়ই চঞ্চল করিত। কখন বিশ্বাস, কখন সন্দেহ, উভয়ের পুনর্দ্বন্দ্ব হৃদয়মাঝে চলিতে লাগিল। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের সহিত আলোচনা হইলে তাঁহারা বলিতেন যে, গুরু উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। ইহাতে তাঁহার চিত্ত আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহারই মতন হস্তপদবিশিষ্ট ষড়রিপুর বশীভূত মনুষ্যকে গুরু বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিবেন; বিশেষতঃ যাহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—সেবক রামচন্দ্র প্রণীত—১১৯ পৃষ্ঠা।

ইতিপূর্ব্বে গিরিশবাবুর মন নাস্তিক ভাবাবিষ্ট হইলেও তখন তাঁহার চিত্ত শিবচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বর বলিয়া যদি মানিতে ও পূজা করিতে হয়, তবে এইরূপ চরিত্রকে বরং মানা যাইতে পারে, এই ভাব গিরিশবাবুর হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে উদয় হইত। এমন কি তিনি মধ্যে মধ্যে শিব আরাধনা, শিবরাত্রি ব্রতপালন, উপবাস করিয়া পদব্রজে ৺তারকেশ্বরে গমন করতঃ তাঁহার পূজাদি করিতেন এবং তাঁহার কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন "হে জগদ্‌গুরো, তুমি যদি শরীরী হইয়া আসিয়া আমায় দীক্ষা দান কর, উদ্ধার কর, তবেই আমার গতি হয়, মুক্তি হয়, শান্তিলাভে সমর্থ হই; হে অহেতুক-কৃপা-সিন্ধো কৃপা কর, নতুবা দাসের আর নিস্তার নাই।"

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনায় ভক্তের কাতর ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দীনবন্ধু দীননাথ কাঙ্গালের ঠাকুর প্রচ্ছন্নবেশী যুগাবতার পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আর প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারিলেন না। ব্যথাহারী ভগবান ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া স্বয়ং আসিয়া ভক্তকে কোল দিলেন। ধন্য গিরিশবাবু! ধন্য আপনার কাতর প্রার্থনা! ধন্য আপনার ডাকার মতন ডাক! আপনার পাঞ্চভৌতিক শরীরের বিলোপ হইলেও আপনার স্নেহ ও ভালবাসার সহাস্য মধুর মূর্ত্তি যেন মনশ্চক্ষের সম্মুখে জল জল করিতেছে। একবার স্নেহচক্ষে এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ডাক ডাকিতে শিখাইয়া দিন, যে ডাকেতে ভগবান আর লুকাইয়া থাকিতে পারেন না, প্রসন্ন হইয়া কাতর সন্তানকে অভয় দিয়া কোলে করেন।

দিবাকরের প্রকাশ্য উদয় হইবার পূর্ব্বে তাহার অরুণ কিরণে যেমন যামিনীর অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, মহাশক্তির আবাহনের পূর্ব্বে যেমন তাহার বোধন আরম্ভ হয়, ভক্ত ভগবানের শুভসম্মিলন হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সুবাতাস ভক্ত হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে বহিতে থাকে। ভগবানের বৈঠকখানা ভক্ত হৃদয়ে তাঁহার আসনোপযোগী দিব্যভাবের উদ্দীপনা হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখি ঠিক তাই। নতুবা আমোদ প্রমোদ রঙ্গরস সম্ভোগের জন্য প্রতিষ্ঠিত রঙ্গশালায় অভিনয়ার্থ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিবার প্রবৃত্তি গিরিশবাবুর হৃদয়ে তখন জাগরূক হইবে কেন? শুভদিনে ও শুভক্ষণে শ্রীচৈতন্যলীলা এমনভাবে রচিত ও অভিনীত হইল যে, যাহার অভিনয়ে সমগ্র বঙ্গদেশ হরিনামে মাতিয়া উঠিয়া ছিল। এমন কি, মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ

বিদ্যারত্ন মহাশয় চৈতন্যলীলাভিনয় দর্শনের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া ও উক্ত নাটকের দেশব্যাপী সুখ্যাতি শ্রবণে, তাঁহার পুত্র পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্নকে বলেন, হাঁরে থিয়েটারে চৈতন্যলীলা, হোচ্চে কি! 'তবে কি আবার গৌর এলো? একবার কোলকেতা গিয়ে দেখে আয়তো'। মথুরানাথ কলিকাতা আসিয়া চৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া উন্মত্তের ন্যায় গ্রন্থকার গিরিশবাবুর পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আর পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "তোর মনোবাঞ্ছা গৌর পূর্ণ ক'রবেন।"

ধন্য পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়! ধন্য আপনার অনুমান "তবে কি আবার গৌর এলো"! ধন্য পণ্ডিত মথুরানাথ! উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান! অভিনয় দর্শনে এতদূর মুগ্ধ যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদাভেদ লোপ! গিরিশবাবুকে যেন চৈতন্যময় ভাবিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণে অগ্রসর ও তাহাতে বাধা পাইয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ প্রদান।

শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরমভক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুমান এবং প্রভুর লীলাভিনয় দর্শনজনিতভাব-রস-বিভোর মথুরানাথের তৎকালীন আশীর্ব্বাদ হাড়ে হাড়ে ফলিয়া গেল। সত্য সত্যই চৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শন করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পুনরুদয় হইয়াছিল। সত্য সত্যই একাধারে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু বা ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টি প্রচ্ছন্নবেশী অধমতারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ব্বলীলাভিনয় দর্শনছলে ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ষ্টার থিয়েটারে আগমন করিয়াছিলেন।

সেই দিন হইতে গিরিশবাবুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। তিনি রামকৃষ্ণদেবকে অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই। ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তাহার অভ্যাসগত প্রবৃত্তি অনুযায়ী সকল আবদার সহ্য করিয়া ভক্তের ভগবানরূপে গিরিশবাবুর হৃদয়সিংহাসনে বসিলেন। মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে যে গিরিশবাবুর ঘোর আপত্তি, তিনিই একদিন নরতনুধারী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে গিয়া "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" এই মন্ত্রটী মনে মনে আবৃত্তিপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একদিন থিয়েটারে গিয়া গিরিশবাবু একখানি চিরকুট পাইয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে

সিমলা ১১ নং মধুরায়ের গলি ভক্তপ্রবর রামবাবুর বাটীতে পরমহংস আসিবেন। এইরূপ সংবাদে বিনা নিমন্ত্রণে অন্যের বাটীতে কেমন করিয়া যাইবেন? যাওয়া হইবে না স্থির করিলেন; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। সহসা তাঁহার প্রাণের ভিতরে কি যেন এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং তিনি লিখিয়াও গিয়াছেন যে, "সে টানের কথা আর কি বলিব, টান্ ব'লে টান, যেন গলায় গামছা দিয়ে টান্, কিন্তু ব্যাথা লাগছে না।" কিন্তু বিনা আহ্বানে যাইবার ইচ্ছা না থাকায় পথে যাইতে যাইতে তিনি যে কতবার থম্‌কে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু সে টানের জোরে তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। অবশেষে তিনি ভক্তচূড়ামণি রামচন্দ্রের বাটীর ভিতর গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। বাটীর ক্ষুদ্র উঠানে ভক্তসঙ্গে পরমহংসদেব নামসংকীর্ত্তনানন্দে ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন। "নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলেরে" এই গান ধরিয়াছেন, রামচন্দ্র স্বয়ং খোল বাজাইতেছেন। গিরিশবাবু প্রকৃতই অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন রামচন্দ্রের উঠান পরমহংসদেবের পদভরে টল্‌মল্ করিতেছে। যেন এক অতুলনীয় আনন্দের স্রোত বহিতেছে। এই আনন্দে তিনি লজ্জাবশতঃ যোগদান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া বড়ই তাঁহার আপশোষ হইতে লাগিল। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি লইতে গিরিশবাবুর প্রাণে ইচ্ছা হইলেও, কে কি মনে করিবে, এই ভাবিয়া লজ্জাবশতঃ তাহা পারিলেন না। অন্তর্যামী রামকৃষ্ণদেবের বুঝি তাহা অবিদিত রহিল না। সহসা তিনি উত্থিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে যেখানে গিরিশবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইস্থানেই তিনি পুনঃ সমাধিস্থ হইলেন। এই সুযোগে গিরিশবাবু রামকৃষ্ণ-পদরজ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

সংকীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বে একদিন পরমহংসদেব গিরিশবাবুকে বলিয়াছিলেন যে "তোমার মনে বাঁক আছে" তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'বাঁক যাবে ত? পরমদেব "যাবে" বলিয়াছিলেন। অদ্য গিরিশবাবু তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবেত"? পরমহংসদেব উত্তর দিলেন "যাবে।" পুনরায় গিরিশবাবু ঐ প্রশ্ন করিলেন; তিনি ও পুনরায় বলিলেন "যাবে।"

আবার গিরিশবাবু ঐ প্রশ্ন করিলেন ; রামকৃষ্ণদেব তৃতীয়বার বলিলেন "থাবে।" গিরিশবাবুর মুখে তৃতীয়বার ঐ এক প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তপ্রবর মনোমোহন মিত্র মহাশয় তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিলেন "যাওনা, কেন ওঁকে বার বার বিরক্ত কর্চ্ছেন ? যখন উনি একবার বলিয়াছেন, আবার কেন ? যার এক কথায় বিশ্বাস নাই, শতবারেও তার বিশ্বাস নাই।" সর্ব্বসমক্ষে এরূপ ভর্ৎসনায় গিরিশবাবু তাহার প্রত্যুত্তর না দিয়া নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যরূপ হইল। ইহাতে গিরিশবাবুর চৈতন্য হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, সত্যইত। যার এক কথায় বিশ্বাস হয় না, শতবার বলিলেই যে বিশ্বাস হইবে, তার প্রমাণ কি ? যে অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ধারণার অতীত। এঁর কথা বেদবাক্যবৎ ধ্রুব বিশ্বাস করা উচিৎ। সুতরাং পরমহংস-দেবের প্রতি গিরিশবাবুর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল।

বিনা নিমন্ত্রণে বা আহ্বানে অন্য ভদ্রলোকের বাটী পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার জন্য মান্যাভিমানী গিরিশবাবুর স্বইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবল আকর্ষণ, তথায় তাঁহার গমন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নদে টলমলকারী অমানুষিক নৃত্য ও ভাব সমাধি দর্শন, তাঁহার পদরজ গ্রহণ ও অপরিচিত ভক্তমুখ নিঃসৃত ভর্ৎসনাবাক্যে গিরিশবাবুর চৈতন্যোৎপাদন এই সকল বিষয় বুদ্ধিমান পাঠক! ক্ষণ চিন্তা করিলে, বোধ হইবে, যেন ইহা একটী দৈবলীলা, যেন আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গিরিশবাবুকে খাড়া করিয়া পরমহংসদেব এই খেলা খেলিতেছেন বা তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

সেবকানুসেবক—শ্রীঅক্ষয়কুমার পাত্র।

—০—

ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক।

"Religion is the manifestation of the Divinity already in man."—Swami Vivekananda.

"Religious men who give to God and Man their dues". Wordsworth.

শীর্ষোক্ত উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখিতেছি, স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, যাহা মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে পরিস্ফুট করে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। একটু মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখিলে বাস্তবিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মের এমন সুন্দর সংজ্ঞা বোধ হয় কাহারও বোধের অগম্য হইবে

না। আর একটা কথা মনে হয় যে, এমন সংজ্ঞা যিনি দিতে পারিয়াছেন তিনি স্বয়ং অনুভবী, তিনি স্বয়ং ধর্ম্মপথের পথিক, ধর্ম্ম কি তিনি বুঝি তাহার সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে দেখিয়াছেন। কেন না, আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি যে, মানব যে অবস্থায় আছে সে তাহাতে সন্তুষ্ট নহে, সে সেখানে থাকিবে না, সে আরও উঁচুতে উঠিবার জন্য সোপান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তবে সে কি চায়? দার্শনিকের মতে সে পশুত্ব হইতে মানবত্বে উঠিয়াছে। এইবার মানবত্ব হইতে আবার দেবত্বে যেতে চায় এই তার সাধ। তুমি নিজের এই সাধপূর্ণ করিতে পার তো তুমি ধার্ম্মিক—অপরের পূর্ণ করিয়া দিতে পার তো সে তোমার চরণে—তোমাকে গুরু মনে করিয়া, তোমার পদসেবা করিয়া, তোমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া লুটোপুটি খাইতে রাজি আছে। প্রত্যেক মানবেরই এই প্রকৃতি। তবে কেহ গোড়া হইতে কেহ বা শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। ভারতের লোককে তুমি আশ্বাস দিলেই তৎক্ষণাৎ সে তোমার শ্রীচরণদাস, ইংরাজ বা মার্কিণের তাহা নহে, তুমি তাহাকে দেবত্বের সোপান দেখাও, সে যখন ঠিক ঠিক দেখিতে পারিয়াছে জানিবে, তখন তোমাকে তাহার সর্ব্বস্ব উপহার দিতে প্রস্তুত। তবে দেখিতেছি মানব মানবত্বে থাকিতে চাহেনা, সে দেবত্ব চায়। সংসারের রীতিই কি এই? ধনী আরও ধন চায়। বিদ্বান্ আরও বিদ্যা চায়। মানী আরও মান চায় ইত্যাদি। কেহ কখন আপন আপন স্থানে সন্তুষ্ট নহে। বাস্তবিক সন্তুষ্ট থাকিবারও কথা নয়। তবে যেখানে সে সন্তোষ দেখিতে পাই, তাহা সন্তোষ নহে, তন্দ্রা! কারণ, মানবের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপ সেই অনন্তের দিকে ধাবমান, সে এমন কি বস্তু লাভ করিতে পারে যে, যাহাতে তাহার সেই অনন্ত-গমন-পিপাসার নিবৃত্তি হইবে? সে অগ্রসর হইবেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত পাঠক পাঠিকা! ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'এগিয়ে যাও' গল্পটা বোধ হয় এখন স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে? কথাটা বাস্তবিকই ঠিক। যেখানে এগিয়ে যাওয়া নাই, সেখানে ধর্ম্মের ঢাক ঢোল বাজিলেও সেখানে ঠিক ঠিক ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম পিপাসা নাই, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা নাই।

এখন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ধার্ম্মিক কথাটার যে সংজ্ঞা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, দেখি আমাদের উপরোক্ত ধর্ম্মের সংজ্ঞার সহিত মিল খায় কিনা। তিনি বলিতেছেন, যাঁহারা মানব এবং ঈশ্বরকে তাঁহাদের প্রাপ্য দেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিক। তবে দেখা যাক মানব চায় কি, এবং ঈশ্বরই বা চান কি? মানব চায়—শান্তি এবং ভগবান্‌

চান ভক্তি। মানব সে শান্তি পাইবার উপায় জানুক আর নাই জানুক, ভ্রমেই পড়ুক বা ঠিক পথে যাক, কিন্তু সে সেই ধন, জন, দারা, পুত্র সকলের ভিতর দিয়া একটু শান্তি চায়। আপনি হায় হায় করিয়া বলিতে পারেন, মানুষ শান্তি খুঁজিতে জানে না কিন্তু একথা বলিতে পারিবেন না যে, সে শান্তি খুঁজিতে চায় না। তার চাই সেই বেদারাধিত শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ভগবান চান তুমি শান্তি পাইবে ভাল, কিন্তু জানিও ভক্তি আর শান্তির চিরদিন সখ্যতা, চিরদিন একত্র বাস, চিরদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শান্তি ভক্তির কৃতদাসী। যদি কেহ ভক্তিকে লইয়া নিজের হৃদয় সিংহাসনেস্থান দিতে পারেন, শান্তিকে গলায় কাপড় দিয়া, করযোড় করিয়া, হত্যা দিয়া ডাকিতে হইবেনা, সে আপনিই ভক্তির সহগামিনী হইবে। আমরা শ্রীচৈতন্য শ্রীরামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনানক ইত্যাদির জীবন-মুকুরে ইহার প্রতিবিম্ব—প্রোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি। তবে দেখিলাম উপরোক্ত ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিকের সংজ্ঞা দুইটি আমাদের বেশ মনোমত হইয়াছে। সুধু কথায় নয়, কার্য্যেও আমরা সে সংজ্ঞা দুইটির যাথার্থ অনুভব করিতে পারিতেছি। তবে বুঝিতে পারিলাম—ধর্ম্ম দেবত্ব চায়, শান্তি দেবত্বে নিহিত, এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক সেই শান্তি-প্রধান ধর্ম্মের গ্রাহক হইতে সর্ব্বদা অগ্রসর।

বর্ত্তমানে দেখা যাক্, আমরা সেই দেবত্ব এবং শান্তি কোথায় পাই। এই খানেই নানামুনির নানামত। আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটী মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি দেখিতে পারিলেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

একদল বলিতেছেন "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" ইহাঁরা বলেন পিতাকে ভক্তি করা একমাত্র ধর্ম্ম। পিতা জীবন্ত দেবতা, তাঁহার পূজা না করিয়া আবার কাহার পূজা করিব? যিনি সাক্ষাৎ অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, তিনি যদি পূজ্য নহেন, তবে যে ঈশ্বরকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার কথা কখনও শুনি নাই, যিনি কখনও রোগে, শোকে কাছে আসিয়া দাঁড়ান নাই, তিনি কি পূজ্য হইতে পারেন? পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়—কাশীতে পাণ্ডাগণ পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে পর তিনি আপনার পিতামাতাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার হর-পার্ব্বতীতে আমার বিশ্বাস নাই, এই দেখ সাক্ষাৎ হর-পার্ব্বতী আমার পিতৃ-মাতৃরূপে বিদ্যমান।" এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকের সংখ্যা অধিক না হইলেও বড় অল্প নহে।

আবার আর এক শ্রেণীর ধার্ম্মিক বলেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ইহাঁদের মধ্যে দুইটী শাখা আছে। এক শাখা বলেন জননীর পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম। তিনি সেই গর্ভ সঞ্চারের সময় হইতে পুত্রের শৈশবাবস্থা, বাল্যাবস্থা, মানবাবস্থা এমন কি তাঁহার প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত পুত্রের জন্য ভাবনার বিরাম নাই। ভাল জিনিস, ভাল কথা, ভাল যাহা কিছু সকলই ছেলে ভোগ করুক, তাঁহাকে যদি সেজন্য মন্দের ভাগী হইতে হয় তবুও মুখে কথা নাই! সংসারে আমার ছেলে ধনী হোক্, বিদ্বান, হোক্, মান পাক্, চিরজীবী হোক্ মার সদাসর্ব্বদা কেবল এই ইচ্ছা। পুত্রের অমঙ্গলে নিজের তদপেক্ষা অমঙ্গল ভাবিয়া শশব্যস্ততা ইত্যাদি মাতার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রমাণস্থল। এমন মাকে ছাড়িয়া এমন কোমলতার আধার ছাড়িয়া, এমন পবিত্র ভালবাসার আকর ছাড়িয়া, মানব আর কোথায় শান্তি পাইতে পারে, কোথায় এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে? আর এক শাখা বলেন "জন্মভূমি"র সেবা না করিতে পারিলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই কথার কথা, সকলই ফক্কিকারী, সকলই প্রতারণা! আগে দেশের শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষার দিকে মনোযোগী হও, দেশ থেকে দারিদ্র্য-রাক্ষসকে তাড়াইয়া দাও, অজ্ঞানের অন্ধকারকে শিক্ষার আলোক দিয়া অপসারণ কর, তবেত শান্তি, তবেত ধর্ম্ম। কিছু না করিয়া সুধু মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিবে, ভাই সুধু কথায় চিড়ে ভিজে না!

অপর এক সম্প্রদায় গভীর নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন—রেখে দাও তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, রেখে দাও তোমার ভাই-বন্ধু, রেখে দাও তোমার শাস্ত্র-টাস্ত্র, এস—যদি প্রকৃত ধর্ম্ম কি জানিতে চাও, এস—দেখে যাও সেখানে বিধবা বসিয়া চক্ষের জলে কাপড় ভিজাইয়া ফেলিতেছে, দেখে যাও এখানে পুরুষ বহু দারপরিগ্রহণ করিয়া পুরুষত্বে জলাঞ্জলি দিতেছে, দেখে যাও ঘরে ঘরে বাল্য-বিবাহের অত্যাচারে দেশ ছারখার হইতে বসিয়াছে; চোখ খোল, দেখ, সমাজ সংস্কারে বদ্ধপরিকর হও!! নতুবা তোমার মিছে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সিন্দুকে পুরে রেখে দাও!

আবার কতকগুলি লোক বলিতেছেন—দেশের উন্নতি, সাহিত্যের উন্নতির সহগামী। যে জাতির সাহিত্য অনুন্নত, সে জাতিটাও অনুন্নত। সাহিত্য দেশ এবং সমাজের উন্নতির পরিমাপক। সব ছাড়িয়া সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করিও। তাহাতেই ধর্ম্ম। যে জাতি আপনার সাহিত্যের উন্নতি

সাধন করিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, সেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে শোভা পায়।

আবার শুনিতে পাই কেহ কেহ বলিতেছেন, এই দরিদ্র, পদদলিত, নিরাশ্রয় ইহাঁরাই আমাদের ঈশ্বর। ইহাঁদের সেবা করিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যায়। যে বিধবার চক্ষের জল মুছিতে পারে না, যে বুভুক্ষুকে দুটী অন্ন দিতে পারে না, যে উলঙ্গকে বস্ত্র দান করিতে পারে না, তাহার ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলা বিড়ম্বনা।

ওই শুনুন আর একসম্প্রদায় বলিতেছেন, চরিত্র! পবিত্রতা! নীতি! এ সব না হইলে কখনও ধর্ম্ম হয়? যে নীতিপরায়ণ নয়, যে পবিত্রতার ধার ধারে না, যাহার চরিত্র কলঙ্কিত, সে আবার ধর্ম্মের নাম মুখে আনে কেন? সে কি জানেনা যে নীতি-নৈতিক চরিত্রই একমাত্র ধর্ম্ম?—কারণ, ইহাতে বিমল শান্তি উপভোগ করিতে পারা যায়। যাহার চরিত্র নাই, সেত মৃত। সে আবার ধর্ম্ম করিবে কি?

আর এক মহাদেশ হইতে উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাইতেছি, তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন—স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল, ক্রিকেট খেলায় বেশী ধর্ম্ম আছে। রোগী কখনও ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। রোগী কদাপি কুত্রাপি মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। জান না, আগে রোমানরা শীর্ণকায় শিশু জাত হওয়া মাত্রেই তাহাকে মারিয়া ফেলিত? বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। এখানে যাহারা শরীর পালন করিতে পারে না, তাহাদের ধর্ম্মার্জ্জন'ত দূরের কথা, জীবন ধারণ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না।

ওই দেখুন টিকি নাড়িতে নাড়িতে, নস্য শুঁকিতে শুঁকিতে, গাত্র হেলাইতে হেলাইতে আর একদল উপস্থিত। বলিতেছেন—যাগ-যজ্ঞ গেল, শাস্ত্রপাঠ গেল, বামুন পুরোহিত গেল, বাবুরা উপাসনা মন্দিরে গিয়া চোখ বুজিয়া ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ করিলেন!! রামো! রামো! কি ছিল, কি হ'ল! ওহে ভায়া! সেই এক কাল, আর এই এক কাল! ছাই, ছাই!! তোমাদের মুখে ছাই, তোমাদের ধর্ম্মের মুখে ছাই!! যাতে করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের খোঁজ খপর লয় না—সে ধর্ম্মের থাকাও যা, না থাকাও তা। বাপু দেখ, আমরা এখনও ধর্ম্মের খোঁটা ধরে বিদ্যমান। আমাদের জন্যই ধর্ম্ম-কর্ম্ম এতদিন সংসারে রয়েছে। না হয় কোন দিন সব প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভেসে যেত!! যদি ধর্ম্ম কি বুঝতে চাও, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা কর, যাগযজ্ঞাদি

কর, ভাল করে নৈবিদ্যের ব্যবস্থা কর, দেখ, প্রাচীন ধর্ম্ম আবার জেগে উঠবে !!

এই পর্য্যন্ত নয়, আবার এক শ্রেণী বলিতেছেন—সত্য ধর্ম্ম আচরণ করিতে যদি বাসনা থাকে তবে কূপ, পুষ্করিণী খনন করাও, অন্নসত্র দাও, রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য ডাক্তারখানার ব্যবস্থা কর, তবে তো ধর্ম্ম, না হয় কিসের ধর্ম্ম? পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু সকলের যাহাতে উপকার না হয় সে আবার কি ধর্ম্ম?—ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গই এই সব। আর যদি বেশী চাও, যদি শক্তি সামর্থ থাকে তবে দেবালয় নির্ম্মাণ করে দাও, তোমার ধর্ম্মের ধ্বজা চিরকাল উড্ডীয়মান থাকবে।

আবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখুন, কি দেখিতেছেন? পৃথিবীর প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন বুকে হাত দিয়া বলিতেছেন—"ভাই, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার কর, ভাই-বন্ধু লইয়া সুখ উপভোগ কর, ধন সম্পত্তি লইয়া আপনার মনোমত ব্যয় কর, এমন ধর্ম্ম—সংসারের মত এমন সুন্দর ধর্ম্ম আর পাইবেন না। দেখিতেছনা রামচন্দ্র সংসারে থাকিয়া পূজ্য, জনক সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসীরও গুরুস্থানীয়, কেন মিছে এধার সেধার করে নিষ্ফল খেয়ে মর, এমন সুন্দর সংসার ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের প্রশংসায় সাবিত্রী শত মুখ—সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, সে ধর্ম্ম একবার আস্বাদন কর। তবে আমরা যে যখন তখন মনে মনে ঘরের কোনে বসিয়া বসিয়া সংসার মধু পান করে নাকে কাঁদি, সেতো সকলেই তাই করে—রাম করে, শ্যাম করে, রাখাল করে, একা তো একজন করে না !!! সংসার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

এই তো গেল ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মতামত। এই সব মতামতের ভিতর যে অল্প বিস্তর সত্য নিহিত, সে কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ উপরোক্ত মতামতের কোন একটী ধরিয়া চলিলেই যে অল্পাধিক শান্তি পাওয়া যাইবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব? পিতৃভক্তি বলুন, মাতৃভক্তি বলুন, দেশ-সেবা বলুন, সাহিত্য সেবা বলুন, শাস্ত্র পাঠই বলুন, আর যাহাই বলুন, সকলেই সেই গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য দুর্ব্বল বা সবল নিয়ামক মাত্র।

তবে আমরা এইটুকু বলি যে উপরোক্ত উপায় গুলি জীবনের আদর্শ হইতে পারে না—সেই এক আদর্শের নিকটবর্ত্তী করিবার যন্ত্র বা উপায় মাত্র। কেন না, পরাপ্রাপ্তিই মানবের আদর্শ। নশ্বরে অস্থায়ী শান্তি এবং অবিনশ্বরেই

পরাশান্তির উদ্ভব। আমরা যে উপায় গুলির কথা আগে বলিয়া গিয়াছি, সে সব নশ্বরেই অবস্থিত। পিতামাতাই বলুন, সাহিত্যই বলুন, আর যাহাই বলুন, সেগুলিকে নশ্বর ছাড়া কি বলিব? তবে যদি ভগবান সেইগুলির মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছেন, এরূপ দৃঢ়ভাব সত্য সত্য কাহারও মনে কার্য্যক্ষেত্রও বিস্মরণ না হয়, আমরা তাঁহাদেব সম্বন্ধে নীরব। দুই একজনের কথা বাদ দিলে বাকী যত সবই যেক্ষেত্রে যখন থাকেন, তখন সেই ক্ষেত্রেরই একমাত্র অনুগত হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা যে যে ক্ষেত্রেই থাকিনা কেন, আদর্শটা যেন ভুলিয়া না যাই।

কবি গাহিয়াছেন—"কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি-কুলের ভরম।" ধন্য কবি! বুঝি এ সংসারের ধর্ম্ম-কর্ম্মতে তোমার মনোরথপূর্ণ হইল না। তুমি শান্তি পাইলে না! বেশ বলিয়াছ! লোকে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত, তুমি তা'র উপরে উঠিতে চাহ বুঝিতে পারিয়াছি! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ভাব!! ধন্য তোমার গান!!! আমরা যাহাকে সচরাচর ধর্ম্ম কর্ম্ম বলি, তাহা সাধন করিয়া কে কবে ভগবান লাভ করিয়াছে? প্রহ্লাদকে দেখিলাম, ধ্রুবকে দেখিলাম, বিল্বমঙ্গলকে দেখিলাম—দেখিয়া বাস্তবিক তোমার গানে মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা যাহাকে 'ধর্ম্ম' বলি—কোই ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিল্ব-মঙ্গল ত তাহা সাধন করেন নাই! তাঁহাদের সে "ধরম করম" গিয়াছিল, তাঁহারা বুঝি অন্য একটা ভাবে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন! বুঝিয়াছি—প্রাণের ধর্ম্মে ভগবান লাভ হয়, বাহিরের ধর্ম্মে নহে। প্রাণ কাঁদিলে তবে! তাই বুঝি জাতিকুলের বেড়া ভাঙ্গিয়া কবির কাঁদিবার সাধ হইয়াছে? ধর্ম্ম কি তুমিই জান! তুমিই প্রকৃত ধার্ম্মিক! ভক্ত কবি! তুমি ধন্য! তোমার লেখনী ধন্যা! কে তোমায় বলিয়া দিল, সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণের আবেগে প্রাণেশ্বরের শরণ লইতে হইবে? তুমি কি কুরুক্ষেত্রে মানস-চক্ষুর সাহায্যে সকল দেখিতেছিলে? তুমি কি ভক্তবীর সেই অর্জ্জুনকে দেখিলে? তারপর সেই অর্জ্জুন সারথীকে দেখিলে? ভাগ্যবান্ কবি! একবার সরল প্রাণে, সুস্থির মনে বল, তুমি যখন কুরুক্ষেত্রের নিভৃত পার্শ্বে অনন্যমনে ভক্তপ্রাণ ভগবানের শরণপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলে, তখন কি ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তোমাকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

জাগ্রত ভাব।

জাগ্রতভাব, আগে দেখা যাউক,—কিসের কোন ভাবে জাগ্রত হইলে জাগ্রত ভাব উপস্থিত হয়। জীব জগৎ আপনার সহিত একাত্ম জ্ঞান না জন্মিলে আত্মজ্ঞান বা জাগ্রতভাব হয় না। সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় মনে না করিতে পারিলে, তাহাদের সহিত মনে ও আত্মাব সংযুক্ত না হইতে পারিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে না। আত্মজ্ঞান না জন্মিলেও জাগ্রতভাব লাভ হয় না। আত্মজ্ঞানে ভেদাভেদ নাই, মান অপমান নাই, উচ্চ নিম্নতা নাই, বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নাই—সমাজ সমাজিকতা নাই—আছে কেবল প্রেম, আছে কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমাকর্ষণ।

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
তদ্‌ব্রহ্মাহসিত জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥

৮ম শ্লোকঃ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

সেই ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ পরমব্রহ্ম বুদ্ধ্যাদি কলারহিত, নির্ব্বিকল্প এবং নিরঞ্জন। এই ব্রহ্ম ও "অহং" প্রত্যয়গম্য, জীবের ঐক্যজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হয়েন।"

এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে—এইরূপ ভাবে জগতে শ্রীভগবানের ঐক্যজ্ঞান হৃদয়াকাশে চির উদ্ভাসিত থাকিলে তবে জাগ্রতভাব আসিতে পারে। তবে মনে এভাব হইলে চলিবে না, আত্মাতে আত্মারামের মঞ্চ রচনা করা চাই। আবার উপনিষদকার বলিতেছেন—

ন বিরোধা ন চোৎপত্তির্ণ বন্ধো নচ শাসনম্।
ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা॥

১০ম শ্লোক ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

আত্মার মৃত্যু নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই এবং আত্মবিষয়ক কোন উপদেশও নাই। ইহার মুক্তি বিষয়ণী ইচ্ছা বা শক্তিও নাই। মানব-মনে যখন এই প্রকার বৃত্তি উদ্ভাসিত হয় তখন সত্য বস্তুর জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজীবে ভগবানের বিকাশ বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরের রূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা না হইলে, এই অবস্থায় উন্নীত না হইতে পারিলে, আমার জগত, আমার ভাই, আমার ভগ্নী, "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য প্রয়োগে কোনই ফল ফলিবে না!

জগতে শ্রীভগবানের বিশ্বময় বিশ্বেশ্বররূপ না দর্শন করিতে পারিলে এবং

আমাকে, ও এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে অর্পণ না করিতে পারিলে, অভেদ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। আর অভেদ জ্ঞানের উদয় না হইলেও জাগ্রতভাব হৃদয়ে পোষিত হইবে না।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্ব ভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

(গীতা ৬অঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২শ শ্লোক)

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী মহাত্মা আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন, তিনি আমা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হন না এবং আমিও তাহা হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইনা। যিনি সর্ব্ব ভূতস্থিত আত্মাকে অর্থাৎ আমাকে সকলের সহিত অভিন্ন-ভাবে ভজন করেন, তিনি নিয়ত আমাতে অবস্থিতি করেন এবং আমিও নিয়ত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। সর্ব্বত্র সমদর্শী যে যোগী নিজের ন্যায় অন্যের সুখ দুঃখ উপলব্ধি করেন—হে অর্জ্জুন তিনিই পরমযোগী।

সুতরাং সর্ব্বজীবে শ্রীভগবানের দর্শন ব্যতীত শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বা জাগ্রত ভাব প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।

শ্রীভগবান আবার বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

গীতা ৯ম অঃ ২৯ শ্লোক।

আমি সমস্ত ভূতের পক্ষেই সমান, আমার পক্ষে কেহ অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। যে ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

ভজনা ব্যতীত—আত্মায় আত্মারামের ধ্যান ব্যতীত শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পথ নাই। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন ব্যতীত জাগ্রতভাব

পাওয়াও অসম্ভব। তবে তাহার কি রূপ, তাহাকে কোন্ জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় তন্ত্রীতে গ্রথিত করিতে পারা যায়? তদুত্তরে উপনিষদকার বলিতেছেন—

এক এব দি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতাঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
ঘট সম্ভৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটে নীয়েতে নাকাশং তদ্বজ্জীবোনভোপরঃ।
ঘটবাদ্বিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
তদ্ভগ্নং ন চ জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ॥

ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ ১২, ১৩, ১৪শ শ্লোক।

জলস্থিত চন্দ্র যেমন বহু আকারে ও বহু প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়—তেমনি এক আত্মাই প্রত্যেক ভূতে অবস্থিত থাকিলেও উপাধি ভেদে নানারূপ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন ঘট স্থানান্তরিত করিলে ঘট পরিচ্ছিন্ন আকাশও স্থানান্তরিত হয় বলিয়া ব্যবহার হয়—তেমনি জীবও উপাধি সহযোগে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে আকাশ ব্যাপক-পদার্থ সুতরাং তাহার গমন অসম্ভব, উপাধির গমন দ্বারাই আকাশের গমন ব্যবহৃত হয়। আত্মাও তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপক সুতরাং তাঁহার গমন অসম্ভব হইলেও উপাধিভূত লিঙ্গদেহের গমন দ্বারা আত্মার গমন উপচারিত হইয়া থাকে। যেমন ঘট পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়, সেই প্রকার সেই দেহই বিনাশ পায়। দেহ পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইয়াও নিত্য আত্মাকে জানিতে পারে না—কিন্তু আত্মা সেই দেহাদিতে সমস্তই জানিতে পারেন।

গাভী যেমন বিবিধ বর্ণের হইলেও তাহার দুগ্ধ একই বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি আত্মা বহুরূপে নানা স্থানে নানা ভাবে সন্নিবদ্ধ থাকিলেও সেই একই আত্মা সর্ব্বত্র পরিবিরাজমান। যথা—

গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্ত গবাং যথা॥ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ১৯ শ্লোক।

অর্থাৎ গাভী সকল বিবিধবর্ণ হইলেও দুগ্ধ একপ্রকার বর্ণের হইয়া থাকে। বেত্রধারী গো-পালকগণ যেমন বিবিধবর্ণ গাভী হইতে এক প্রকার বর্ণবিশিষ্ট দুগ্ধই দোহন করে তেমনি বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়াও এক আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানই গৃহীত হইয়া থাকে।

সেই দুগ্ধের মধ্যে যেমন নিগূঢ়ভাবে ঘৃত বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক

ভূতের মধ্যেই জ্ঞানময় আত্মা বিদ্যমান থাকেন। মন্থনদণ্ড দিয়া মন্থন করিলে যেমন ঘৃত উৎপন্ন হয়, তেমনই মনদ্বারা সেই চিদানন্দ চিদ্‌ঘন বস্তুকে লাভ করা যায়। যথা—

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থান ভূতেন।

(ব্রহ্মবিন্দূপণিষদ ২০শ শ্লোক)।

এই যে সর্ব্বময় বিরাজমান আত্মা ইনি কেবল এক শরীরস্থ নহে। আত্মা সর্ব্বত্র গমনশীল, ইনি দিব্য আদিত্যরূপে অবস্তিত, ইনি অষ্টবসুরূপে বিদ্যমান, ইনি বায়ু আকারে অন্তরীক্ষ প্রদেশে বিজানিত, ইনি অগ্নিরূপে উৎপন্ন। এই সকলেরই আত্মরূপে অবস্থিত সত্যস্বরূপ একই পরম পদার্থ। ইহাতে কোন প্রকার মলিনতা নাই—ইনি সর্ব্বব্যাপক পদার্থ।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষ সদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজাঋতম্বৃহৎ॥

কঠোপনিষদ ৫মবল্লরী ২য় শ্লোকঃ।

অর্থাৎ এই যে আত্মা ইনি এক শরীরবর্ত্তী নহেন। সর্ব্বত্র বিরাজমান সর্ব্ব-পুরবর্ত্তী তাই উপনিষদকার বলিতেছেন, আত্মা হংস অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমনশীল, ইনি দিব্য আদিত্যরূপে অবস্থিত, অষ্টবসুরূপে বিদ্যমান, বায়ুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, অগ্নিরূপে সর্ব্বত্র দহমান, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তমান, ইনি অতিথি-রূপে বিদ্যমান। সোম রস আকারে আবার কুম্ভের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। ইনি পর্ব্বতাদি হইতে নদ্যাকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই ব্রহ্ম সকলের আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়াও সত্যস্বরূপ। ইহাতে কোন প্রকার আবিলতা নাই। ইনি সর্ব্বব্যাপক পদার্থ। ইহাকে চিনিতে পারিলে, ইহাকে এই সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির স্রষ্টা, চিন্ময় অদ্বিতীয় ও নির্গুণ পদার্থরূপে জানিতে পারিলে, মানবের নিত্যশান্তি লাভ হইয়া থাকে। নিত্যশান্তিপ্রদ কি হইতে পারে? কিসের দ্বারা সেই চিন্ময় অচিন্তনীয় বস্তুকে জ্ঞানের গণ্ডীতে ধারণা করা যাইতে পারে? বুদ্ধিকে অরণি এবং প্রণবকে (ওঁকারকে) উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ মন্থনদণ্ড দিয়া মথিত করিতে পারিলে প্রকাশমান আত্মাকে নিগূঢ়ভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ যজ্ঞাদি স্থলে অগ্নি জ্বালিবার সময় কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে। এই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অধোবর্ত্তী কাষ্ঠকে অর্থাৎ যাহার উপর ঘর্ষণ করা হয় সেই কাষ্ঠকে অরণি এবং উপরস্থিত কাষ্ঠকে

উত্তরারণি বলে। "যেমন অরণি ও উত্তরারণি ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপত্তি হয়, তেমনি প্রণবের ধ্যানরূপ মন্থনদ্বারা আত্মপ্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে।

তবে উপায় কি? পরিদৃশ্যমান জগতে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, প্রতিনিয়ত জীবস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তকাল ধরিয়া যে স্রোত চলিয়া আসিতেছে, সেই স্রোত অনন্তকালই চলিবে, তাহার গতিরোধ করিতে কেহই সক্ষম হইবে না। পাঞ্চভৌতিক দেহের বিকার এবং তাহার গুণ ও ক্রিয়াবৃত্তি, যতদিন দেহ আছে, ততদিন থাকিবেই থাকিবে। জীবের জন্য ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের জন্য জীব, জীব ও জগতের অস্তিত্ব অনন্য সাপেক্ষ। জীব আসে—সংসারে পুড়িয়া ভাজা ভাজা হইয়া ছারখার হইয়া আবার কোন অজানা পথে—অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যায়। পাঞ্চভৌতিক দেহের বিশ্লেষণ হেতু জগতের অস্তিত্ব স্বত্বেও জীবের অনুভূতির বহির্ভূত হইয়া যায়। জগতে এরূপ জীব নাই যাহার ত্রিতাপ জ্বালায় বিদগ্ধীভূত হইতে হয় নাই। জীব অবিদ্যা ও মায়ার কুহকে ভুলিয়া আপনাকে ভগবান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, তখন মোহের কালিমা জালের প্ররোচনায় স্বীয় আত্মজ্ঞান নাশ করিয়া ফেলে। কিন্তু শ্রীভগবান কখনও জীবকে পরিত্যাগ করেন না। ভগবান ভুলেন না বলিয়াই, জীবের জন্য তাঁহাকে বারে বারে মানুষ হইয়া মানুষের মাঝে আসিতে হয় এবং সাধন ভজন, আত্মজ্ঞান, সর্ব্বময় তাঁহারই বিভূতি, যত্র জীব তত্র শিব, শিবোহম্, আমি দাস—তুমি প্রভু ইত্যাদি উপায় দ্বারা যে পরমপদ লাভ হয়, তাহাও দেখাইয়া থাকেন। পরমহংস প্রেমানন্দ স্বামী গাহিতেন—

জীব আমি নইরে দূরে, আছিরে অন্তরে—
বারেক চাহিয়া দেখনা,
তুমি দূর বোধ ক'রে, ডাকিছ আমারে
আমি যে ডাকি তা শুননা।
সদা নিকটেতে রই কভু ছাড়া নই,
ছাড়িলেও আমি ছাড়িনা,
আমি অহরহ নিশি, কত মত তুষি,
তাতেও তোমার মনে হয় না।

জীব ও জগত-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অবস্থিত, জীব যখন ব্রহ্ম সান্নিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় তখন আর তাহাকে ত্রিতাপতাপে দহন করিতে পারে না, তখন সে জড়ের অতীত হইয়া জাগ্রতভাব প্রাপ্ত হয়। জীবের ভগবান সান্নিধ্য লাভ,

বা তাহার সেবাপরায়ণ না হইলে, দুঃখ নিবৃত্তির কোন উপায়ই নাই। *জীব সংসারে যত আকৃষ্ট হয়, তত ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। দু'নৌকায় পা' দেওয়া চলেনা। ব্রজগোপীগণ দু'কূল বজায় রাখিতে গিয়া কৃষ্ণ প্রেমলাভ করিতে পারে নাই। বাসনাশূন্য আত্মবৎ ইষ্ট সেবা দ্বারা জীব ধন্য হয়। তাই ঊনবিংশ শতাব্দিতে দয়াবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়া ছিলেন 'মা তুই আমার সব নে; ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, সিদ্ধি, সাধনা, জ্ঞানকর্ম্ম প্রভৃতি জীবের যত প্রকার বাঞ্ছা অভিলাষ আছে, যত কিছু বন্ধন আছে তুই সব নে; আমায় কেবল তোর অভয় চরণে শুদ্ধাভক্তি দে।" জগৎপালিনী ব্রহ্মময়ী সন্তানের প্রাণের নির্ম্মল প্রার্থনা, ভক্তের চির বাঞ্ছিত শুদ্ধাভক্তি না দিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। জগতে উপাস্য উপাসক ও জীব সকলেই ধন্য হইল। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় প্রীতি—প্রেম—পবিত্রতা! তথন মাকে সমস্ত সমর্পণান্তর, মায়েরপদে কামনা অর্পণ করিবার পর আর তাঁহার ভয় নাই! ভয় কাটিয়া গিয়াছে। জগতে মায়ের মূর্ত্তি, সর্ব্বময় মায়ের শক্তি বিরাজময়ী দেখিতেছেন! তিনি মায়ের পদে সমস্ত অর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন—তিনি নিজ দেহে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের সমন্বয় করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে পরমার্থ পদের অধিকারী করিয়াছিলেন—তিনি একাধারে সর্ব্ব সাধনার মূল। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর উপদেশে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আসল কথা প্রাণ কাঁদা চাই। যাহার জন্য প্রাণ আকুল, তাহাই পাইয়া জড়ের বন্ধন জ্বালা বিমুক্ত হয়।

"হলে আকুল মিলে বকুল
শীত গ্রীষ্ম মানে না।
কুল তলাতে খুঁজলে বকুল
কোন কালেই মেলে না।"

আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিলে ভক্তিলাভ হয়, অন্য কিছুতেই হয় না। তাই ঠাকুর বলিতেন—কাঁদ, কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের ময়লা কেটে গিয়ে তাঁকে দেখতে পাবে।" প্রাণের ক্রন্দনের আবেগে জীব তখন তাঁহার হইয়া পড়ে, আর পৃথক সত্বার অনুভূতি থাকে না। তখন জীব শিব হইয়া যায়। "জীব শিব এক না পরঃ" জ্ঞানে হৃদয়াকাশ চির আবৃত থাকে। জ্ঞানপথের পথিক হইলে, জ্ঞানমার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে জীবের প্রাণে পরম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, এবং অনুকূল তত্ত্বাদির দ্বারা জীব পরমব্রহ্মে স্থিতি হইয়া জাগ্রত ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন উচ্চকণ্ঠে গাহিতে শিখিবে—

"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটী অজা
জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।

* * * *

শুচি অশুচিরে লয়ে এক শয্যায় শুয়ে রবি,
দু'সতীনে পিরীত হলে
(মন) শ্যামা মাকে দেখতে পাবি।"

তখন সর্ব্বময় সেই পরমাত্মার বিকাশ, সর্ব্বময় প্রেমাস্পদের অবস্থান দেখিতে সক্ষম হইবে। দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা বিদূরিত হইয়া চিদানন্দের চির শান্তিপ্রদ—চিৎঘনের জগত পরিব্যক্ত বিশ্বময় মূর্ত্তি ভাসমান থাকিবে। তখন মুঞ্জ তৃণ হইতে যেমন ইষীকাকে পৃথক করে, তখন নিজ শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক করিবার উপলব্ধি জন্মিবে। শরীর হইতে নিকৃষ্ট বস্তুকেও শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এই চিন্ময় বস্তুকে জগত পরিব্যাপ্ত জ্ঞান হইয়া যখন এক দিব্যবস্তু সর্ব্বপ্রাণীতে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন পরিলক্ষিত হইবে তখন জাগ্রত ভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্বময় চিদানন্দের বিশ্বময় মূর্ত্তি হৃদয়াকাশে পরিলক্ষিত হইয়া তুমিই জগতের আদ্যন্ত, তুমিই সর্ব্বময়। আমি কিছুই নয়, আমি খেলার পুতুল।—

"যখন বাঁচাও তখন বাঁচি
যখন মার তখন মরি।"

তখন আমার অহংজ্ঞান, তখন আমার আমিত্ব বলে যে অহঙ্কার, আমার এই ধন সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র পরিবারের গরিমা সকলই অন্তর্হিত হইয়া হৃদয়-পদ্মে সেই শক্তিময়ের সদা জাগ্রত ভাব ভাসমান হইবে। তখন বলিতে সক্ষম হইব—ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি! ওঁ হরি ওঁ!

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

—০—

সংবাদ।

১৮ই বৈশাখ, বুধবার, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফুলদোল মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ভক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁহার আহিরীটোলাস্থ বাটীতে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া ভক্তসেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

(১৩১৬ সালের ২৩ পৃষ্ঠার পর)

৪৯২। যিনি পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

৪৯৩। সংসার প্রতিপালন করা ও ছেলে পিলেদের মানুষ করা—খাওয়ান পরাণ, গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৪৯৪। দেবদেবীর প্রতিমা কাঠমাটির মনে করোনা, ভাববে যে, চিন্ময়ী প্রতিমা।

৪৯৫। মহাপুরুষেরা সিংহস্বরূপ, তাঁরা একলা থাকতে—একলা বেড়াতে ভালবাসেন। আত্মারাম।

৪৯৬। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর মত এই—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জীব জগৎ, এ সবই শক্তির খেলা। বিচার করলে, সমস্তই স্বপ্নবৎ, কেবল ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।

৪৯৭। হাজার বিচার করো, সমাধিস্থ না হলে, শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি'—'আমি ঈশ্বর চিন্তা করছি'—এ সবই শক্তির এলাকার মধ্যে—শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

৪৯৮। মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। যে মনে করে, আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি—আমার কোনও বন্ধন নাই; আমি

ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে?—সে মুক্তই হয়ে যায়।

৪৯৯। সাধন দ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে, পরে সংসার করা উচিত।

৫০০। ঈশ্বরে অনুরাগ—টান্—ভালবাসা, এইটাই দরকার। তাঁর প্রতি ভালবাসা হলে তাঁকে পাওয়া যায়।

৫০১। গুরু মেলে লাখ্ লাখ্; চেলা নাহি মেলে এক্।

৫০২। ভগবানের স্বরূপের ইতি করা যায় না।

৫০৩। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'—মানুষের আমিত্ব গেলে সকল প্রকার অশান্তির হাত থেকে নিস্তার পায়।

৫০৪। ঈশ্বরের সাকার রূপও দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। এ উপলব্ধির বস্তু, বোঝাবার নয়।

৫০৫। ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেইরূপেই তিনি তাকে দেখা দেন। তিনি যে ভক্তবৎসল!

৫০৬। বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ্ সব উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম সত্য, আর নাম-রূপ-গুণযুক্ত জগৎ মিথ্যা।

৫০৭। ভক্তের 'আমি' অভিমান আছে বলে, সে ভগবান থেকে একটু দূরে আছে। তিনি আর আমি এক—এ বোধ সে রাখতে চায়না। তাই তার শ্যামারূপ বা শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া। যেমন সূর্য্য দূরে ব'লে ছোট দেখায়, কাছে গেলে এত বড় যে, ধারণা করা যায় না।

৫০৮। দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রং নাই। ভক্ত 'আমি' 'তুমি' ব্যবধান রেখেছে বলে মাকে কালো দেখে, যার পূর্ণজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সে আর পার্থক্য দেখতে পায়না।

৫০৯। যতক্ষণ আমি, ততক্ষণ জগৎ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে হবে।

৫১০। প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কর্ম্ম কমবে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

৫১১। ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ কর। তাঁর ঐশ্বর্য্যের দিকে নজর দিওনা। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে দেখলেই আনন্দ হয়। তার ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত লোকজন দাস দাসী, এর খবর কে নিয়ে থাকে? ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য! তার খবরে আমাদের কি দরকার!

৫১২। ভক্ত ঈশ্বরের লীলা দেখতে চায়, লীলা দেখতে ভালবাসে। রাবণ বধের পর যখন রামচন্দ্র রাক্ষসপুরী প্রবেশ কল্লেন—তখন রাবণের মা নিকষা বুড়ী দৌড়ে পালাতে লাগলো। লক্ষ্মণ তা দেখে অবাক হয়ে রামকে বল্লেন "একি! যে এত বুড়ী, আর এত পুত্রশোকে কাতর, তারও প্রাণের ভয়?" রাম তখন নিকষাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে—"রাম, ভাগ্যে এতদিন বেঁচেছিলাম, তাই তোমার দর্শন পেলাম, আর এই সব লীলা দেখলাম, যদি আরও কিছুদিন বাঁচি, তা হলে আরও কত লীলা দেখতে পাবো।"

৫১৩। সংসারী বদ্ধ জীব—কলঙ্কসাগরের মধ্যে ডুবে আছে, কিন্তু মনে করে, বেশ আছি।

৫১৪। মুমুক্ষু বা মুক্তজীবের সংসার পাতকোয়া বলে মনে হয়।

৫১৫। 'সোহম্'—আমি সেই, এ অভিমান ভাল নয়। দেহ বুদ্ধি থাকতে যে এরূপ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, বরং ক্রমশঃ অধঃপতন হয়।

৫১৬। যার ঈশ্বরে ভালবাসা জন্মায়, তার স্ত্রীপুত্র আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। তার সংসার বিদেশ ব'লে বোধ হয়, একটী কর্ম্মভূমি বলে মনে হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলিকাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম্ম করবার জন্য।

৫১৭। চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হয়ে রয়েছে, চোখের জলে এ ময়লা ধুয়ে ফেলো। তা'হলে মন-ছুঁচকে ঈশ্বর-চুম্বক টেনে লবেন।

৫১৮। ভাঁড়ার ঘরে একজন থাকলে, সেখানে বাড়ীর কর্ত্তা কোনও কাজে যান না, কেউ কিছু চাইলে বলেন 'যাও, ভাঁড়ারে লোক আছে—চাওগে যাও'। তেমনি যেখানে মানুষ নিজে কর্ত্তা হয়ে বসে আছে, সেখানে ভগবান এগোন না, সে হৃদয়ে তিনি সহজে আসেন না।

৫১৯। তাঁর কৃপা হইলেই তাঁর দর্শন মেলে। পাহারাওয়ালা আঁধারে লণ্ঠন হাতে ধ'রে সকলের মুখ দেখতে পায়, কিন্তু সে যদি সেই আলো তার নিজের মুখের দিকে ফিরিয়ে না ধরে, তার মুখ কেউ দেখতে পায় না।

৫২০। নিত্যসিদ্ধ একটা আলাদা থাক। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। সাধ্য সাধনা করে যে ভক্তি লাভ হয়, নিত্যসিদ্ধের ভক্তি—সে ভক্তি নয়। এদের ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা।*

৫২১। হাঁড়ির ভিতরকার মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে তার মন যেমন আনন্দিত হয়, সমাধি অবস্থায় মানব মনের অবস্থা সেই রকম।

৫২২। ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। যার উপলব্ধি হয়, সে কিছু বলতে পারে না, খবর দিতে পারে না। যেমন, কয়জন বন্ধু বেড়াতে গিয়ে, খুব উচু পাচীল ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। তার ভিতরে কি আছে, তাদের জানবার বড়ই ইচ্ছা হল। একজন পাচীল বেয়ে উঠে, ভিতর দিকে দেখে, হো হো হো করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো। যে উঠে, সেই এমনি করে ভিতরে পড়ে যায়। আর কেউ খবর দিলে না!

৫২৩। মত প্রচার করা বা লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তাঁর আদেশ হওয়া চাই।

৫২৪। যিনি ভগবান, তিনিই একরূপে ভক্ত, তিনিই একরূপে ভাগবত।

৫২৫। ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে, সে অবস্থা হয়না।

৫২৬। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে, ঈশ্বরকে জানতে দেয় না।

৫২৭। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর দেখেন যে, জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, সবই সেই একজনই হয়েছেন,—তিনিই উত্তম ভক্ত।

৫২৮। অদ্বৈতজ্ঞান হলে তবে চৈতন্য লাভ হয়। তখন মানুষ দেখতে পায় যে, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি বিরাজ করছেন। এই চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। তাই—'অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ।' (ক্রমশঃ)

—•—

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ-সেবক ভক্তচূড়ামণি পরমার্চ্চনীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় গিরিশবাবুর একদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ করিলে, বোধ করি পাঠকগণ অতৃপ্ত হইবে না।*

"পরমহংসদেবকে তিনি (গিরিশ বাবু) অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে

* সেবক রামচন্দ্র প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত ষষ্ঠ বিংশ পরিচ্ছেদে ১২০—১২১ পৃষ্ঠা।

পারিয়াও তাঁহার চিত্ত বোধ হয় পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। পরমহংসদেব একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে গিরিশবাবু পরমহংসদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক, কথায় কথায় (কোন এক বিষয়ে তিনি স্বীকার না হওয়ায়) তাঁহাকে এ প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা লেখাপড়ায় প্রকাশ করা যায় না। বরং জগাই মাধাই কর্ত্তৃক নিত্যানন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহস্র গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশবাবুর সেই দিনের গালাগালির তুলনা নাই। কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু কবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মর্ম্মে মর্ম্মে যাইয়া বিদ্ধ হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া ক র্ত্তব্য। এই গালাগালিতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও তেমনি হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইলেন। * *

"অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবামাত্র তিনি কহিলেন, "গিরিশ আমায় গালি দিয়াছে।" আমরা কহিলাম, "কি করিবেন?" তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমায় যদি মারে?" আমরা কহিলাম "মার খাইবেন।" তিনি কহিলেন, "মার খাইতে হইবে?" আমরা বলিলাম, "গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়ের যথাবিহিত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "তুমি কি জন্য বিষ উদ্গীরণ কর?" কালীয় সানুনয়ে কহিয়াছিল, "প্রভু! যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় ঠাকুর বিষ দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব?" গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, যে সকল পদার্থ দ্বারা তাহার হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকূটসম বাক্যগুলি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? উহা যথায় নিক্ষিপ্ত হইত, তথায় বিপরীত কার্য্য হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে, হয়ত, এতক্ষণ তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হইত, এই সকল বুঝিয়া, প্রভু! আপনি নিজে অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সাধে কি বলি পতিতপাবন দয়াময়! অমনি তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাঁহার অক্ষিদ্বয়ে জল আসিল এবং তখনই গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত

উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গিরিশ তাঁহার নিজ কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। তিনি কেমন করিয়া ভক্তসমাজে মুখ দেখাইবেন ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনা দূরীকৃত হইল। পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্তসহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন যে, গিরিশ বাবুর মনে যে সকল দুঃখ এবং লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ পরমহংসদেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন।” শুনিয়াছি গিরিশবাবু সেই অবস্থায় তাঁহার বাটীতে উক্ত দিবসে পরমহংস-দেবের সেই ভাবে ভক্তগণ সঙ্গে সহসা আগমনে, তাঁহাকে নরদেহধারী প্রত্যক্ষ পতিতপাবন ভগবান জ্ঞানে, তিনি (গিরিশবাবু) আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধে মুগ্ধ হইয়া এক অপূর্ব্ব স্তবে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

একদিন মহাভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে রামকৃষ্ণদেব কতিপয় ভক্ত সঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সহসা পরমহংসদেবের ভাবাবেশ হইল। সেই সময় গিরিশ বাবু মনে মনে কি প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরমহংসদেব ভাবাবেশে কিঞ্চিৎ জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও গিরিশ! ভাবছ কি? এর পর তোমাকে দেখিয়া সকলে অবাক হইবে।” (এইরূপে বার বার তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে লাগিল।) অনন্তর একদিন অধরলাল সেন মহাশয়ের বাটীতে সুরার বোতল, ডিঃ গুপ্ত ঔষধে পরিণত হইতে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবের প্রতি গিরিশবাবুর অকপট বিশ্বাসের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অতঃপর একদিন তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) গিরিশ বাবুকে কহিলেন, “আর কিছু করিতে পার আর নাহি পার, প্রত্যহ একবার ঈশ্বরকে ডাকিও। তুমি বলিবে, তাহা যদি না পারি? একবার না হয় সন্ধ্যার পর একটা প্রণাম করিও। তুমি বলিবে, তাহাও যদি সুবিধা না হয়? ভাল, আমায় বকল্‌মা দিয়া যাও।” গিরিশবাবুর মনের আকাঙ্ক্ষা সেই মুহূর্ত্ত হইতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিজ জীবনের শুভাশুভ দায়িত্ব ভার তিনি রামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া, একেবারে নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হইলেন। অহেতুকী কৃপাসিন্ধু রামকৃষ্ণদেব গিরিশ বাবুর পরিত্রাণের ভার সাদরে যাচিয়া লইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

যে কয়দিন সংসারে আছ, সে কয়দিন শীঘ্র শীঘ্র খেয়েনে পরেনে ইত্যাদি।

সদাচার-বিহীন, সাধন-ভজন-হীন গিরিশবাবু পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, তাহাই রহিলেন, কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন। পরেশ মণি সংস্পর্শে লৌহময় তরবারি কাঞ্চনময় হইল। যেমন দূর হইতে বীরত্বের পরিচায়ক তরবারির চর্ম্ম নির্ম্মিত খাপ দর্শনে তরবারির বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ স্বনাম প্রসিদ্ধ গিরিশ বাবুকে দূর হইতে অনুমান করা বড় কঠিন বা বুঝা যায় না। যিনি যত তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, যিনি যত তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা করিয়াছেন, তিনি তত তাঁহার দিব্যজ্ঞান ও অমিয় প্রেমভক্তি রসাভিসক্ত "মনমুখ এক" বা সহজ ও সরল প্রাণস্পর্শী ব্যবহারে বিস্মৃত ও মুগ্ধ হইয়াছেন, আর কেহবা ভাগ্যগুণে কলির জীব দুর্লভ শ্রীগুরু বা ভগবানে ষোল আনা ঠিক ঠিক বিশ্বাসের একখানি নিখুত ফটো (Photo) তুলিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। সহজে শাদা কথায় তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সন্দেহ ভঞ্জন করিতে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দেখা গিয়াছে। তাঁহার বাক্য বিন্যাসে কেমন একটা মাধুর্য্য ও আকর্ষণ ছিল যে, যাঁহারা তাঁহার নিকটে একবার আসিত ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিত, বোধ করি কেহ অতৃপ্ত হইত না। এইজন্য তাঁহার ঘর প্রায় সকল সময়েই গুল্‌জার—কেহ না কেহ তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। আগন্তুকের ভাব অনুযায়ী নানাবিধ প্রসঙ্গ চলিয়াছে। সাহিত্যসেবীর সহিত সাহিত্যিক প্রসঙ্গ, চিকিৎসকের সহিত চিকিৎসা বিষয়ক, দার্শনিকের সহিত দর্শন শাস্ত্রীয়, ধর্ম্মতত্ত্ব পিপাসুর সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলিয়াছে। তিনি পাশ্চাত্যভাষাজ্ঞ নবীন যুবকই হউন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই হউন, সংসারত্যাগী জ্ঞানী হউন বা ভক্তিমান গৃহীই হউন, সকলেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হইতেন। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে গিরিশ বাবুর যেন একটা অজ্ঞানাহত শক্তির বিকাশ হইত, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইতেন। যেদিন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের সহিত তত্ত্বালাপে মাতিয়া যাইতেন, সেদিন তাঁহার সকল কর্ম্ম যেন ভাসিয়া যাইত, সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। কখন কখন এমনও ঘটিয়াছে যে, এই ভাবে বিভোর ও আত্মহারা হেতু রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইবার জন্য উপর্য্যুপরি আহ্বান সত্বেও যাইতে না পারায় থিয়েটারে অভিনয়ার্থ নির্দ্দিষ্ট নাটকের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

নানাগুণ সত্ত্বেও গিরিশবাবু প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে, অন্যান্য কৃতবিদ্য নাট্য বা কাব্য সাহিত্যিকদিগের ন্যায় প্রায় মিশিতেন না বলিয়া, তাঁহার একটা দুর্নাম আছে। সেটা যে তিনি তাচ্ছিল্য বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যোগদান করিতেন না, বোধ করি তাহা নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য দর্শন ও তাঁহার কৃপালাভের পর হইতেই গিরিশবাবুর অন্তর্জাগতিক ভাব এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, তিনি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে বা মিলিতে পারিতেন না। চিন্তাশীল পাঠক! এ বড় শিক্ষাপ্রদ মধুর সমস্যা। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তিনি অশেষ গুণ সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় গুণ-গরিমা বা সাধুতা প্রকাশ করিতেন না, এবং আত্মদোষটী অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোকের ভাব ঠিক বিপরীত; প্রায় সকলেই সাধ্যানুসারে আত্মদোষ গোপন পূর্ব্বক ভদ্র লোক সাজিয়া কপট সাধুতারই পরিচয় দেয় ও সুযোগ পাইলেই স্বীয় গুণের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সাধারণের চক্ষে তিনি নিষ্ঠাচার-বিহীন নাট্যকলা বিশারদ গৃহী; কিন্তু জ্ঞানী, যোগী, সাধুর দৃষ্টিতে তিনি নির্লিপ্ত তেজীয়ান মহাজ্ঞানী, পঙ্কিল সরোবরে পাঁকাল মৎস্যের ন্যায় নির্লিপ্ত সংসারী; ভক্তিমান বৈরাগী সাধুর চক্ষে তিনি ভগবানে আত্মনির্ভররূপ তপস্যার চরম ফলভোগী বীর বিশ্বাসী প্রেমিক ভক্ত।

ধর্ম্মপথ অতি কঠিন পথ। ঈশ্বর লাভই লক্ষ্য, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ ও তৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা তাহার সূচনা, সৎগুরু বা সাধুসঙ্গ সেই পথে অগ্রসর হইবার উপায়। গুরু উপদেশানুযায়ী হাতে খড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে সাধনার স্তরে স্তরে ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে, গুরুকৃপায় ঈশ্বর দর্শন ও সিদ্ধিলাভ ঘটে। কিন্তু গিরিশবাবুর ইহার বিপরীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, সময় না হইলে কিছু হয়না। সে সুসময় যে কখন কাহার ভাগ্যে উদয় হয়, তাহা কে জানে? গিরিশবাবু বলিতেন যে, তাঁহার এমন একদিন গিয়াছে যে তিনি ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সহজে মানিতেন না। আর ও বলিতেন যে "আমাদের জীবনধারণোপযোগী জল, বায়ু, আলো প্রভৃতি যাহা নইলে নয়, যখন তাহা না চাহিতেই পাই, আর ঈশ্বর যদি থাকেন, আর তাঁর সহিত জীবের যদি নিত্যসম্বন্ধ এবং অতি প্রয়োজনীয় হয়; তাহা হইলে জল, বায়ু, আলোকের মত নিশ্চয়ই পাব।" কি জোর আবদার! কি বিশ্বাস! তাহার পর তাঁহার এমন এক অপূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল। তিনি কহিতেন যে,

"আমার তখন এমন অবস্থা যে ভগবান না থাকলে, এবং তিনি না এলে, চলে না। আর দশজনের ভগবান না এলেও চলতে পারে—তাদের অন্তরে সান্ত্বনা পাবার—আশ্বস্ত হ'বার, ধৈর্য্য ধরবার কিছু না কিছু উপলক্ষ্য আছে, আমি যে সব ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, আমার ভগবান না এলে একেবারেই চল্‌তনা।" পাঠক! এই অবস্থাটী কয়জনের ভাগ্যে উদয় হয়? তাহার পর অকস্মাৎ কৃপাসিন্ধু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতন গুরুলাভ। তাঁহার বাক্যে বা তাঁহাকে ষোল আনা বিশ্বাস। সাধনার রাজ্যে পদার্পণ না করিয়া, জগাই মাধাইয়ের ন্যায়, চিদানন্দমূর্ত্তি নিত্যানন্দকে কলসীর কাণাঘাতে সৎগুরুর কৃপালাভ,—কর্ম্মবন্ধন মুক্ত! এ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? তত্ত্ববিদ্যার হাতে খড়ি দিয়া পাঠশালে স্কুলে না পড়িয়া, একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে (College Class) বিদ্যারম্ভ আর ঝপ্ ঝপ্ পাশ! যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। কেন যে গিরিশবাবু সাধারণ সভায় যোগদান করিতে বা মিশিতে পারিতেন না, এক্ষণে বোধ করি পাঠক কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

ভাই পাঠক! ভাই বঙ্গবাসী! ভাই ভারতবাসী! আজ যে কি উজ্জ্বল মানবরত্ন হারাইয়াছ, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। বহুভাগ্য ফলে সে রত্ন সংস্পর্শে আমরা ধন্য হইয়াছি। এ দাসের ক্ষুদ্র হৃদয়ফলকে তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি যে ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা এ পাঞ্চভৌতিক শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও অন্তর-রাজ্য হইতে মুছিবার নয়। পাঠক! যত দিন যাইবে, ততই তাঁহার অভাব সকলে বোধ করিবে। যত তাঁহার অভাব বোধ হইবে, ততই তাঁহার কথা আলোচনা হইবে, ততই পাঠক! তাঁহার দেব-সদৃশ মূর্ত্তিকে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি উপহারে আমাদেরই ন্যায় পূজা না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

হে বীর বিশ্বাসী, নিত্য প্রণম্য দেবতা! তুমি যে ডাকেতে তোমার হৃদয়-বল্লভকে সশরীরে আকর্ষণ করিয়াছিলে, যে ডাকেতে তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া তোমাকে অভয়দানে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, যে বিশ্বাসে তুমি আপনাকে পতিতজ্ঞানে পতিতপাবন নরহরিরূপধারী রামকৃষ্ণপদে বিকাইয়াছিলে, যে বিশ্বাস ও আকর্ষণে তিনি তোমার অবস্থাগত শত অপরাধ হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া কোল দিয়াছিলেন, যে বিশ্বাস ও ভক্তির জোরে তিনি যাচিয়া তোমার জীবনের শুভাশুভ দায়িত্ব-ভার নিজে গ্রহণ করিয়া তোমাকে সর্ব্ব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, প্রার্থনা করি—দয়া করিয়া এ দাসের এই শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর এবং আমাদের প্রতি স্নেহবশে এই

আশীর্ব্বাদ কর, যেন হৃদয়বিহারী শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের জন্য প্রাণের সেইরূপ আকর্ষণ হয়, যেন সেইরূপ টান অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ ঠিক ঠিক জোর অটল বিশ্বাসে রামকৃষ্ণপাদপদ্মে একেবারে ষোল আনা বিকাইতে পারি। আত্মাভিমান এই পথের প্রধান অন্তরায়। তাহা দূর করিবার জন্য চিন্তামণি চরিত্রে যে জীবন্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন অবশিষ্ট জীবনে পালন করিতে পারি,—

"অভিমান কর পরিহার, চূর্ণ কর
বল অবিস্তার, জেনো সার—অহঙ্কার
নরক দুস্তর। শক্তি কার? মূলাধার
ভগবান্—শক্তির আকর, ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে! জলধরে
বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর। জেনো স্থির
শক্তি সেই মত। অনিবার্য্য ফলে কার্য্য
ঈশ্বর ইচ্ছায়! হয় মানব-নিচয়
ফলভোগী তার—কর্ত্তাজ্ঞানে আপনার।
"অহম্ অহম্" ত্যজ বিচক্ষণ! জপ
"তুঁহু তুঁহু নাহম্ নাহম্"; পাশমুক্ত হবে,
হৃদিপদ্মে বসিবেন শান্তিদেবী—।"

আর আশীর্ব্বাদ কর দেব! যেন আমাদের সেই চক্ষু খোলে যে চক্ষে তোমার হৃদয়বল্লভকে দেখিতে পাই, অনুভব করিতে পারি, যেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আগলিয়া আছেন। পাছে বিপথে পদস্খলিত হই, তাই যেন তিনি আমাদের হাতটী ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। যেন তোমার দেবসংগীত প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া গাহিতে পারি—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
যেখানে যাই, সে যায় সাথে,
আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কত রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলেম তাই,
কে বলেরে আপনার রতন নাই;
সত্যি মিছে দ্যাখনা কাছে, কচ্চে কথা সোহাগ ভরে॥"

সেবকানুসেবক—শ্রীঅক্ষয়কুমার পাত্র।

মুক্তির উপায়।

আমাদের কার্য্যতৎপরতার প্রত্যেক অংশের মূলে কিছু না কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং এই পরিজ্ঞাত কর্ম্মতৎপরতাই জীবন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেখানে কর্ম্মতৎপরতা জ্ঞানগম্য, সেখানেই উহাকে আমরা জীবন আখ্যা দিয়া থাকি, কিন্তু যখন উহা অনুপলব্ধ অবস্থায় চলিতে থাকে, যেমন বড় বড় ইঞ্জিনে, কিম্বা কলকারখানায়, তখন উহাকে আমরা জীবন বলিয়া গণনা করি না। একমাত্র কর্ম্মের সম্যক্ উপলব্ধিতেই জীবনীশক্তির সত্তা প্রমাণিত হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, প্রত্যেক কর্ম্মই কোনও না কোন অভাব দ্বারা প্রণোদিত। কি আমাকে কার্য্যে অনুপ্রেরিত করিতেছে? ইহার উত্তর—কোন বস্তুলাভের আশা। তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ?—কারণ তোমার ধারণা আছে যে, এখানে আসিলে তোমার কোন জ্ঞানলাভ হইবে, কিম্বা কোন না কোন প্রকারের সাহায্য তুমি পাইতে পারিবে। কোন বস্তুলাভের কিম্বা জ্ঞান লাভের আশা না করিয়া আমরা কোনও কার্য্যে একপদও অগ্রসর হই না। প্রত্যেক কর্ম্মের মূলেই চঞ্চলতা আছে এবং এই অস্থিরতা অভাব হইতে জন্মিয়া থাকে। যতদিন তোমাতে এই চাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তোমাকে কর্ম্মতৎপর হইতেই হইবে, কারণ তোমার অভাব পূরণার্থে তোমাকে সচেষ্ট হইতেই হইবে।

কিন্তু এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে মানুষের কোন অভাব আছে কি না। শ্রীকৃষ্ণের মত (দেব-মানব) মহাত্মারা এবং ঈশা ও বুদ্ধের মত অবতার পুরুষেরা অন্যভাবে জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মনুষ্য শব্দের সংজ্ঞা "আশ্চর্য্যজনক।"† তাঁহারা বলেন মানুষ‡ জন্মহীন, মৃত্যুহীন, অভাবহীন, আনন্দময়, সৎ ও চিন্ময়। এমন কি শিবের ত্রিশূলেরও তাহাকে বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই। স্বভাবতঃই সে অনন্ত ও অবিনাশী। ইহাই যদি মনুষ্য শব্দের সংজ্ঞা হইল, তবে আমি কি? আমিও

---

* পরম পূজ্যপাদ মহাসমাধিস্থ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের The Path to Perfection" নামক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

† আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ ইত্যাদি—গীতা ২য় অঃ ২৯ শ্লোক।

‡ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
গীতা ২য় অঃ, ২০ শ্লোক।

মনুষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি ; কিন্তু আমি তো সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্যের মধ্যে আবদ্ধ, আমার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে এবং অনেক অভাবও রহিয়াছে। দরিদ্র শ্রমজীবী হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থার মনুষ্যের মধ্যে এমন একজনকে কি দেখাইতে পার, যাহার জীবনে অভাব নাই? প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ অভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হইবার পরমুহূর্ত্তেই কাঁদিয়া উঠে। কেন? কারণ ইহার কিছু অভাব আছে। মানুষ অভাবে জন্মগ্রহণ করে, অভাবেই বাঁচিয়া থাকে এবং অভাবেই মরিয়া যায়। অভাব হেতুই সে জন্মিয়াছিল, অভাবেই তাহার জীবনের পুষ্টি সাধিত হইল এবং অভাবই তাহার মৃত্যু আনিয়া ছিল।

এখন দেখা যাউক—উক্ত দুইজনের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য বা সামঞ্জস্য কোথায়—কি প্রকারেই বা একজন অপর ব্যক্তির সমতুল্য হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা উভয়ে মিলনের সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে? ইহাদের মধ্যে একজনের অভাব বলিতে কিছুই নাই; তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই। অপর ব্যক্তি কিন্তু সকল প্রকার ভয়ের আধার ও কামনায় পরিপূর্ণ। সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে মরিতেও হইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি ইহারা একই সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। এই ব্যক্তিই, যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি কোন একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ, স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছেন যে, তিনিও সেই একই অনন্তের অধিকারী। মানব মন সর্ব্বদাই অস্থির ভাবাপন্ন, নিরন্তর সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক। ইহার এ অস্থিরতা কেন? কারণ, মানুষ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না—কিছুতেই তাহাকে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগের অধিকারী করিতে পারে না এবং তিনি যে তাঁহার এই আবদ্ধ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন—ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, তাঁহার এ অবস্থা স্বাভাবিক নহে। তাঁহার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, আরও অধিক পাইবার অতৃপ্ত দুরন্ত ক্ষুধাই প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি সসীম নহেন, তিনি অনন্তের অধিকারী এবং এই নিমিত্তই কোন সসীম ক্ষুদ্র পদার্থ তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারে না।

যে কোন ব্যক্তির নিকটই তুমি যাওনা কেন, তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহার আবদ্ধ অবস্থায় আদৌ সন্তুষ্ট নহে—এমন একজনও পাইবে না যে, সন্তোষামৃততৃপ্ত। তুমি হয়ত বলিতে পার যে, তোমার উপার্জিত অর্থে

একশত টাকাতেই তুমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট; কিন্তু ইহা তোমার অলসতা বই আর কিছুই নহে। তুমি কখনও অলসতাকে সন্তোষ বলিয়া ভুল বুঝিও না। প্রকৃত সন্তোষ কি, তাহা আমরা নচিকেতার নিকট শিক্ষা করিতে পারি। মৃত্যুরাজ্যের অধীশ্বর যম তাহাকে ধন, রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি নানা প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু নচিকেতা জানিত যে, একমাত্র সত্যই তাহাকে সন্তোষামৃত প্রদান করিতে পারে। তাই বালক নচিকেতা যমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু একশত টাকা বেতনের স্থানে যদি কেহ তোমাকে দুইশত টাকা দিবার প্রস্তাব করে, তাহা হইলে উহা কি তুমি গ্রহণ করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। এতদ্দারাই প্রমাণিত হইতেছে যে তোমার এখন যাহা আছে, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ, তুমি যদি তোমার মন বিশ্লেষণ কর, তাহা দেখিতে পাইবে যে তোমার মনের আকাঙ্ক্ষার সীমা বা শেষ নাই। তাহা হইলে কখন এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চিরশান্তিতে পরিণত হইবে? এই শান্তি কেবল তখনই তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে, যখন তুমি বলিতে পারিবে "আমিই সকলের প্রভু; সমস্ত জগতই আমার; আমার কোনও অভাব নাই, আমি মৃত্যুর অতীত এবং আমি কাহারও নিকট দায়ীত্বে আবদ্ধ নহি।" অন্তরে এ ভাবের উদয়ের পূর্ব্বে তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না। তুমি সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তে মিশিতে চাহ বটে, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বলিতে পারিতেছ যে, তুমি অসীম, মৃত্যুহীন, অমর, ততক্ষণ তোমার শান্তি নাই।

এই শান্তি লাভই মুক্তি। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যদিও এই ক্ষুদ্র ও মহৎ ব্যক্তির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তথাপি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি অনন্তের অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকিবে না। এতদ্দারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অনন্তত্বই তাহার প্রকৃত স্বভাব। তুমি যদি একটি মৎস্যকে সাজাহানের (ভারতের জনৈক সম্রাট) ময়ূর সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া সসম্ভ্রমে পূজা করিতে থাক, তাহা হইলে উহা কি সন্তুষ্ট হইবে? না—মৎস্যটী বরং বলিবে "না হয় আমাকে একটি পচা নালাতেও নিক্ষেপ কর, কিন্তু আমাকে জল হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখিও না" কারণ জলই উহার জীবনের স্বাভাবিক প্রধান অংশ। ঠিক এইরূপ তোমরা সকলেই তোমাদের অপগত স্বভাবের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত অস্থির।

এমন লোক নাই, যে চঞ্চল নহে। এ অস্থিরতার কারণ কি? সে যে তাহার প্রকৃত স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে, সে যে অসীম, অনন্ত তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, ইহার পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত সে চঞ্চল। এই চঞ্চল ব্যক্তিই ধন্য; আর যে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট রহিয়াছে, সে নিতান্তই হতভাগ্য। এইরূপ সন্তুষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট মানব, মানবই নহে। সে ইতর প্রাণী অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। তুমি একটি হস্তীকে ইহার সমস্ত জীবন ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পার এবং যদি তুমি ইহাকে কিছু কিছু আহার প্রদান কর, তাহা হইলে হস্তীটিও ইহার আবদ্ধ অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবে না। এইরূপ ভাবাপন্ন সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ, পশুগণ অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। "খাওয়া, ঘুমানো, সন্তানোৎপাদনকরা এবং ভীত হওয়া, এ সমস্ত বিষয়ে ইতর প্রাণীগণের সহিত আমাদেরও সমানতা।" আমরা যদি ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর ও শ্রেয়স্কর কার্য্য করিতে না জানি, তাহা হইলে উহাদের হইতে আমাদের বিশেষত্ব কোথায়? তুমি নিশ্চিত জানিও যে, যেখানেই অসন্তোষ, সেইখানেই মহত্ত্বের বীজ রহিয়াছে। যে কোন মহৎ ব্যক্তির জীবনালোচনা কর, দেখিতে পাইবে, অধিক হইতে অধিকতর জ্ঞানলাভের আশায় তিনি কিরূপ সচেষ্ট ও চঞ্চল ছিলেন। কিন্তু বিশ্রাম সুখলোলুপ আগ্রহবিহীন ব্যক্তিগণ কুলিদিগের ন্যায় হতভাগ্য জীবনভার বহন করিতে বাধ্য। এইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কলুর বলিবর্দ্দগণের ন্যায় সারাদিন ঘুরিয়াই মরে কিন্তু অঙ্কিত বৃত্তাকার পথ পরিত্যাগ করিতে জানে না। পাঠ্যাবস্থায় এই সকল ব্যক্তি শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাহারা শ্রেণীর নিম্নাংশেই বসিয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এমন কতকগুলি বালক থাকে, যাহারা অধিকতর শিক্ষালাভের আশায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত—ইহারাই দেশের আধুনিক উচ্চ কর্ম্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। মহাত্মাগণের জীবনী পাঠে দেখিতে পাইবে যে, তাঁহারা সকলেই চঞ্চল ছিলেন এবং চঞ্চলতাই তাঁহাদিগকে মহত্ত্বে লইয়া গিয়াছে। তাই তোমরা সচেষ্ট হইতে বিরত হইও না।

অল্পে কখনও তুষ্ট থাকিও না। তুমি অসীম, অনন্ত, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন এবং তুমি অনন্তের অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকিও না। এ চিন্তা মনেও স্থান দিওনা যে, বুদ্ধি-জগতে তোমার রাজ্য সীমাবদ্ধ। মহাত্মা সক্রেটীসের ন্যায় তোমার মস্তিষ্ক ও নিউটনের ন্যায় তোমার প্রতিভা

রহিয়াছে। তোমার এই অনন্তশক্তি তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ না, কারণ তুমি ইহাকে ধূলি ও আবর্জ্জনার আবরণে আবৃত হইতে দিয়াছ। ধূলিকণা পরিষ্কার করিয়া ফেল, তোমার আকাঙ্ক্ষা বৃত্তিকে জাগাইয়া তোল; তোমার সমস্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবীত করিয়া তোল—দেখিতে পাইবে, সমস্ত শক্তি তোমাতেই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি সীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহ। দেশ ও কাল পুরাকালের যে সমস্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষির ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য সৃজন করিতে পারে নাই, সেই সকল ঋষিগণের ন্যায় তুমিও অসীম, অনন্ত।

কোন ব্যক্তিকে পাপী বলাই মহৎ পাপের কার্য্য—ইহা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আমাদিগকে নিরন্তর শিক্ষা দিতেছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে পাপী ও দুর্ব্বল বলিয়া মনে কর, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি তোমার অনন্ত সত্ত্বার কথা ভুলিয়া গিয়া উহাকে শরীর ও মনের সহিত মিলাইয়া ফেল। নিজের অনন্ত সত্ত্বাকে সীমাবদ্ধ শরীর ও মন বলিয়া ধারণা হইতেই তোমার যত প্রকার দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি। তুমি যদি তোমার অনন্ত স্বভাবকে পুনর্লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমার সীমাবদ্ধ জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে। তোমার দেহ ও মনকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। শরীর ও মন হইতে তোমার সত্ত্বাকে পৃথক করিয়া ফেল। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে দেখিতে পাইবে যে, তুমি সর্ব্বদাই দেহ ও মন হইতে নিজকে পৃথক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছ। তুমি কি সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাক "আমি লম্বা কি খর্ব্বাকৃতি, কুৎসিৎ কি সুন্দর, সরু কি মোটা ইত্যাদি?" যখন তুমি কোন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াও তখনই এই সকল তোমার চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। স্বাস্থ্য বলিতে তোমারা কি বুঝিয়া থাক? মানুষ তখনই সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া বোধ করে, যখন তাহার শরীরের অস্তিত্ব বোধ থাকে না। মাথা ধরিলে মাথার অস্তিত্ব ও পায়ে বেদনা হইলে পায়ের অস্তিত্ব বোধ হইয়া থাকে। তুমিই আত্মা, তুমিই জীবনী-শক্তি। তোমার দেহাত্ম-বোধ অত্যন্ত প্রবল হইলেও ইহা তোমাকে কোন প্রকারে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না—যে তুমিই আত্মা নও। কোন রমনীয় দৃশ্য কিম্বা শ্রুতিমধুর সঙ্গীত সম্ভোগের সময় তুমি তোমার দেহকে ভুলিয়া যাও অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য তোমার মন এত উচ্চে অবস্থান করে যে, তোমার দেহের অস্তিত্ব বোধ থাকে না। ইহাই তোমার স্বাভাবিক অবস্থা এবং এই জন্যই "তোমরা

কোন বিমোহন দৃশ্যে কিম্বা মধুর সঙ্গীতালাপে এত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাক। যখন তুমি ধীর, স্থির ও গভীর চিন্তামগ্ন থাক, তখনও তোমার দেহাত্ম-বোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় হঠাৎ কোন বাধার উৎপত্তি হইলেই, উহাকে তোমরা বেদনা আখ্যা দিয়া থাক।

আনন্দসম্ভোগে চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ। চিন্তামগ্নাবস্থায় তোমার দেহাত্ম-বোধ থাকে না। সে সময় তুমি কোথায় চলিয়া যাও? সে অবস্থায় তুমি তোমার দেহ ও মনোরাজ্যের বহির্দ্দেশে চলিয়া যাও এবং উহাই পূর্ণ সম্ভোগ। আনন্দই তোমার প্রকৃত সত্ত্বা এবং তজ্জন্যই আনন্দ সম্ভোগ তোমার এত প্রিয়। সুখান্বেষণে মানুষ সর্ব্বদাই চঞ্চল। কোন যন্ত্রণাপ্রদ দুঃখই এই চঞ্চলতার প্রতিকারণ। মানুষ সর্ব্বদাই সুখসম্ভোগে লালায়িত এবং তাহার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ও দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবার উদ্দেশ্যই—এই হারাণো আনন্দের পুনরুদ্ধার সাধন। এই আনন্দান্বেষণই ভগবদন্বেষণ, কারণ ভগবান ও আনন্দ একই পদার্থ। উহারা অন্যোন্যদ্যোতক। এইজন্য কথিত আছে 'হৃদয়ে ভগবান নাই—ইহা নির্ব্বোধের বাক্য" কারণ, এক ঈশ্বর হইতেই সমস্ত আনন্দ প্রসূত হইয়াছে এবং যে আনন্দান্বেষণ করে, সে ভগবানকেই অন্বেষণ করিয়া থাকে।

ঈশ্বর বলিতে আমরা খাঁটি আনন্দকেই বুঝিয়া থাকি। এমন কোন আস্তিক নাই—যে আনন্দাকাঙ্ক্ষা নহে। এই আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ। আনন্দ হইতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি; এই আনন্দেই ইহার স্থিতি এবং এই আনন্দেই ইহার বিলয়। ঈশ্বর হইতেই আমাদের সত্ত্বার উৎপত্তি; তিনিই আমাদের ভরসা এবং তাঁহার নিকটেই আমরা চলিয়া যাইব। তাহা হইলে এই আনন্দ ও ঈশ্বর অভিন্ন ও অন্যোন্যদ্যোতক। সুতরাং কেহই বলিতে পারেন না যে তিনি নাস্তিক, কারণ সকলেই আনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং এই আনন্দই ঈশ্বর। প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখান্বেষণ করিয়া থাকে। তোমার কি প্রকারের সুখের প্রয়োজন? যে সুখ অবসাদহীন ও নিরবচ্ছিন্ন। তুমি সামান্য সুখের প্রত্যাশী, কাজেই এতটুকু আনন্দলাভের আশায় ক্ষণিক জাগতিক সুখকেও তুমি সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পার; কিন্তু তোমার লক্ষ্য সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

অবিচ্ছিন্ন আনন্দই ঈশ্বর নামে অভিহিত। যাহাতে বিচ্ছেদ রহিয়াছে, তাহা ইন্দ্রিয় পারতন্ত্র্য নিবন্ধন মত্ততা। আনন্দলাভে মুহূর্ত্তের জন্য পরিতৃপ্ত সসীম আনন্দলাভে মুহূর্ত্তের জন্য পরিতৃপ্ত থাকিতে পার; কিন্তু অসীম অবিচ্ছিন্ন আনন্দই

তোমার চরম লক্ষ্য এবং উহার সম্ভোগ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সবেগে অফিসে গিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করে। সেও সুখান্বেষী, যেহেতু শ্রমলব্ধ অর্থাগমই উহার প্রতিকারণ। অপর এক ব্যক্তি ঘরের এক কোণে বসিয়া মনকে কেন্দ্রীভূত করিতেছেন ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বহির্জ্জগতকে ভুলিয়া অন্তরে ঈশ্বরানুভূতির চেষ্টা পাইতেছেন। ইনিও সেই সুখেরই অনুধাবন করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারী শত্রুঘ্ন।

—০:*:০—

ন্যাংটাবাবার দেহত্যাগ।

এই পরিদৃশ্যমান নশ্বর সংসারের যাবতীয় প্রাণী বা পদার্থপুঞ্জ ক্ষয়নিয়ন্তা। এ সংসারে যে আসিয়াছে, তাহাকে একদিন কালের কোলে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, আবার যে আসিবে আসিবে করিতেছে, তাহাকেও একদিন না একদিন কাল-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাইত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"জাতস্য হি ধ্রুবর্ম্মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাৎ অপরিহার্য্য বিষয়ে শোচিতুম্ নার্হসি॥"

তাইত বঙ্গকবি মধুসূদন বলিয়াছেন ;—

"জন্মিলে মরিতে হ'বে,
অমর কে কোথা কবে ?
চির-স্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে !"

কিন্তু যাঁহার মৃত্যু—যাঁহার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন সাধারণের অবস্থা অতিক্রম করিয়া জগতে এক নূতন আদর্শ, নূতন দৃশ্য স্থাপিত করিয়া যায়, তাঁহার মৃত্যু বা তাঁহার দেহত্যাগ নিতান্তই উল্লেখ যোগ্য।

সেদিনের কথা নয়—প্রায় ৪ মাস হইল, অবিমুক্ত বারাণসীধামে এরূপ একটী অভিনব আদর্শের স্থাপনা হইয়াছে। করালবদনা মা কালিকাদেবীর প্রিয়সন্তান সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের ইচ্ছামৃত্যুর পর বোধ হয় ভারত এরূপ অলৌকিক দৃশ্য চক্ষুতে নিরীক্ষণ বা শ্রবণে শ্রবণ করে নাই। এ মহাত্মার পূর্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই এবং জানিবারও উপায় নাই।

কেন না, ইনি বিংশবৎসরব্যাপী সাধনকালে কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, অথবা ইঙ্গিতেও কাহাকেও স্বাভিপ্রায় জানান নাই। যিনিই বারাণসীধামে ভ্রমণ বা তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে গমন করিয়াছেন, তিনিই নিঃসন্দেহে বিশ্ব-বিশ্রুত দশাশ্বমেধঘাটের সোপানোপরি একজন সুন্দর, সুপুরুষ, সুঠাম, বাক্যহীন, নগ্নসন্ন্যাসীকে অবলোকন করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস ঢাকা জেলায় ছিল এবং সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধি সম্পন্নবংশের সন্তান বলিয়া দেশের মধ্যে ইঁহার প্রতিপত্তি ও সম্মান যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ভগবান যাহাকে জগত-নাট্যে যে নাট্যের অভিনয় করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য কি যে সে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে? সাধু বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভগবান প্রেরণ করিয়াছিলেন—শীতে বাতে হিমাদ্রীর ন্যায় অচল অটল থাকিয়া ভগবচ্চরণারাধনা করিতে, তিনি কি সংসারের মোহ-জালে সমাচ্ছাদিত থাকিতে পারেন? সন ১২৯৮ সালের একদিন সুমধুর প্রভাতকালে একজন বিষয়বিরাগী ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে গান ধরিল;—

"এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে,
রঙ্গের নট, নটবর হরি, যাকে যা সাজান সে তাই সাজে।
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
নানা রঙ্গের অভিনেতা এসেছেন আজ কতই সাজে॥
(কিন্তু) যার যখন হ'তেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমের অভিনয়,
কা কস্য পরিবেদনা তখন সে আর কারো নয়,
(তার) কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়,
পুত্র কন্যার কাতর বিনয়,
শুনে না সে কারো অনুনয় চলে সাজ সজ্জা তেজে॥"

গান সমাপ্ত হইল—ভিক্ষু ভিক্ষা লইয়া গমনোদ্যোগী হইলেন—অকস্মাৎ বিহারীলাল গিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সংসারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী, জননী সকলই ছিলেন, তখন সকলেই আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত করিতে শত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বর্ষার প্রবল স্রোত কে রোধ করিতে পারে?

সেই তরুণ অরুণ কিরণ প্রতিভাত প্রভাতকালে অনিন্দ্যসুন্দরী ভার্য্যার

"হা হুতাশ"—জননীর হৃদয়-ভেদী বিলাপের মধ্যে একজন অপরিচিত ভিক্ষুকের সহিত বিহারীলাল কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন, শত অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহার অনুসন্ধান পাইল না।

এই ঘটনার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে একটী মহাজনশ্রুতি উঠিল যে, দশাশ্বমেধঘাটে একজন নগ্ন, মৌনী সন্ন্যাসী আজ কয়েকদিন হইতে আসিয়াছেন, তিনি কাহারও সহিত কথাও বলেন না, কিংবা এই দুঃসহ শীতে গাত্রে কোনওরূপ আচ্ছাদনও দেন না। এই কোলাহল শুনিয়া শত শত লোক তাহাকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল—কতজনে তাঁহাকে ফল, মূল, বস্ত্র প্রভৃতি লইবার জন্য অনুরোধ করিল, ত্যাগব্রতে ব্রতী শুকদেব তাহাতে কোনই উত্তর দিলেন না। এই ভাবে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে—তাঁহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া দিন দিন লোকে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে কয়েকজন শিষ্য মিলিয়া একখানি কাষ্ঠ চতুর্দ্দোলা নির্ম্মাণ করতঃ দশাশ্বমেধঘাটের সোপানোপরি প্রতিষ্ঠা করতঃ এই মহাপুরুষকে তন্মধ্যে স্থাপিত করিলেন।

তিনি তদবধি গত মাঘমাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক্ অবস্থায় নগ্নদেহে সেই দোলার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই দীর্ঘ বিশবৎসর ধরিয়া তিনি কাহারও নিকট বিন্দুপরিমাণ দ্রব্য যাচ্ঞা করেন নাই, অথবা কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকান নাই। নিশিদিন তাঁহার পূত-দৃষ্টি কেবল পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর দিকে থাকিত। অহো! কি কঠোর তপস্যা! কি মহান্ ব্রত! কি অত্যুদার ত্যাগ।

১৩১৮ সালের মাঘমাস পূর্ণ প্রায়। এ সময় বারাণসীধামে এরূপ প্রবল শীত যে প্রভাতকালে আপাদ মস্তক উষ্ণবস্ত্রে আবৃত না করিলে গৃহের বাহির হওয়া সুকঠিন। আমরা সকলে স্ব স্ব পুস্তক লইয়া শয্যাপরি শয়ন করিয়াই অধ্যয়ন করিতেছি। ইতিমধ্যে কি যেন কি একটা কোলাহল শ্রবণ গোচর হইল। বাহির হইয়া দেখি, পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় লোক দশাশ্বমেধঘাটের দিকে ছুটিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। যাইয়া দেখি, দশাশ্বমেধ ঘাট লক্ষ লক্ষ লোকে পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, গত কল্য সন্ধ্যাবেলায় নাকি "ন্যাংটাবাবা" কয়েকজন লোকের নিকট বলিয়াছেন,—"অদ্য প্রাতঃকালে তিনি দেহত্যাগ করিবেন।" সেই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হওয়ায়, ঊষার আলোক পূর্ব্বাকাশে রঞ্জিত হইতে না হইতে, এই

ভাবে লোকসমূহ শ্মশানমেধে উপস্থিত হইয়াছে। আমি শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। সাধু, সন্ন্যাসীর সংস্রব বিহীন আমি—আমার পক্ষে এরূপ বিস্ময় কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

অতি কষ্টে মাথা উঁচু করিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দোলার মধ্যে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি ন্যাংটাবাবা সমাসীন। ভাবিলাম—এমনই ভাবে ত তিনি চিরদিনই বসিয়া থাকেন, তবে এত লোক কোলাহল কেন?

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। সমবেত জনমণ্ডলী একদৃষ্টে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মহাত্মার মুখারবিন্দপানে দৃষ্টিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। আমি ইত্যবসরে লোক-স্রোতের ভিতর দিয়া সুদক্ষ মাঝির ন্যায় আমার দেহ তরণীখানি তাঁহার চতুর্দ্দোলার সমীপে স্থাপিত করিলাম। জানি-না-কেন তাঁহার চরণ পঙ্কজ দর্শন করিয়া অন্যদিনের ন্যায় হৃদয়ে প্রগাঢভক্তির পরিবর্ত্তে, নয়ন দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই ভাবে কতক্ষণ দণ্ডায়মান আছি, অকস্মাৎ শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের একতান বাদ্যে আমার চমক ভাঙ্গিল—চাহিয়া দেখি, পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া কয়েকজন পাণ্ডা তাঁহাকে চতুর্দ্দোলা হইতে নিম্নে নামাইতেছে। আমিত অবাক! এক নিমিষের মধ্যে সব হইয়া গেল! লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের "জয়" "জয়" ধ্বনির মধ্যে তখন বাবাকে নৌকায় স্থাপনা করা হইল। নৌকাখানি মৃদু মন্দগতিতে সংসারত্যাগী আদর্শ পুরুষকে বক্ষে লইয়া, কেদারঘাট অভিমুখে চলিতে লাগিল। তীর দিয়া ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই নির্ব্বাকাবস্থায় নৌকার অনুসরণ করিতে লাগিল। তৎপর ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ মহারাজা হরিশ্চন্দ্র যেখানে আপন পুত্র রোহিতাশ্বকে সৎকার করিতে গিয়া-ছিলেন, সেই পুরাণ বিখ্যাত মণিকর্ণিকায় আনিয়া প্রস্তর বিনির্ম্মিত বাক্স করিয়া শত শত কণ্ঠের জয় জয় নাদের মধ্যে মহাপুরুষের দেহ বিসর্জ্জিত হইল।

ন্যাংটাবাবা গেলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ তপঃপ্রভা তাঁহার স্মৃতি বঙ্গবাসী—তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে চির জাগরুক রাখিবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শিল্প।

মনুষ্য নির্ম্মিত প্রত্যেক [illegible] বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা 'সূক্ষ্মশিল্প' এই অর্থে শি[illegible] [illegible]ব হস্ত নির্ম্মিত যে কোন দ্রব্য আমাদের মনে [illegible] করে, তাহাকেই শিল্প বলা উচিত, অথবা মানব হৃদয় নিহিত সৌ[illegible] পিপাসাই শিল্পের জন্মদাত্রী।

কিরূপে মানব মনে শিল্পের চিন্তা প্রথমে উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।

গম্ভীর সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে কাহার মনে না যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হয়? অত্যুচ্চ শৃঙ্গমালাপূর্ণ গগণস্পর্শী পর্ব্বত শ্রেণী, গম্ভীরনাদী উত্তালতরঙ্গবিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষ, শত ক্রোশব্যাপী অসূর্য্যস্পর্শ চিরান্ধকারময় গহন কানন, শিশিরসিক্ত পুষ্পবাস পরিপূর্ণ উষা, অস্তোন্মুখ দিবাকর রঞ্জিত বিচিত্রবর্ণ শোভিত পশ্চিম গগন, অনন্ত নক্ষত্রমালা বেষ্টিত জ্যোৎস্নাময়ী শারদেন্দু—এই সমস্ত সুন্দর দৃশ্য দর্শনে, জগতের আদিকাল হইতে মানবহৃদয় স্বতঃই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কিন্তু, মানব মন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে শুধু বিস্মিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অতি আদিমকাল হইতেই মানব জড়প্রকৃতিকে অনুকরণ করিতে একান্ত মনে চেষ্টিত হইয়াছে। প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বস্তুর অনুকরণে সেও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। নিজ হস্ত নির্ম্মিত নানা দ্রব্যে মানব যেন আর একটী সুন্দরজগত সৃষ্টি করিয়াছে। সে যে পরিমাণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতে সফলকাম হইয়াছে, সেই পরিমাণে বিভিন্ন সময়ে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। তবে একটী কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বাহ্যজগতের অন্ধ অনুকরণ শিল্পের চরম আদর্শ নহে। কল্পনার সাহায্যে মনোমধ্যে কোন একটী সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করিয়া প্রতিভাবলে তাহার বাহ্য প্রকাশই শিল্পের লক্ষ্য।

নানাবিধ উচ্চ গুণ ও শক্তি বর্ত্তমান থাকায় মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে সেগুলির মধ্যে প্রধান—বিবেচনা শক্তি ও বাক্‌শক্তি। কিন্তু আর একটী বিষয়ে যে মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে কথা বোধ হয় আমাদের মধ্যে

অনেকেই অবগত নহেন। সেটী—সৌন্দর্য্য বোধশক্তি এবং স্বহস্ত নির্ম্মিত নানা শিল্পে সেই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বাহ্যিক বিকাশ ক্ষমতা।

পশুদিগের মধ্যেও কর্ম্মশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরূপ নৈপুণ্যের সহিত তাহারা কর্ম্ম করে যে, তদ্দর্শনে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। বিবরদিগের সুন্দর বাসভূমি, মধুমক্ষিকার সুদৃশ্য মধুচক্র প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণের নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কিন্তু যদিও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটী ইতর প্রাণী একজন বিজ্ঞানবিদের সমান বুদ্ধিমান, তথাপি একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাকে কখনও শিল্পী বলা যাইতে পারে না।

একটী ইতর প্রাণী তাহার বাসগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে কেবল প্রয়োজনীয়তার দিকেই লক্ষ্য রাখে। সেই প্রয়োজনীয়তা সাধনে যে পরিমাণ সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন, তাহার বাসগৃহ সেই পরিমাণেই সুন্দর হয়। অনাদি অনন্তকাল হইতে তাহার বাসগৃহ একইরূপে নির্ম্মিত হইতেছে। আবশ্যক ব্যতিরেকেও যে সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সম্ভব, তাহার মনে ইহা কখনই স্থান পায় না। তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান অতীব সীমাবদ্ধ।

কিন্তু মানবের চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য্য, সুন্দর গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, পার্থিব প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত মানব মনের সৌন্দর্য্য পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য মানব প্রত্যেক কার্য্যের কোনও কোনও অংশ অতীব সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করে।

এমন কি অতি বর্ব্বর অবস্থায় যখন সভ্যতার ক্ষীণতম রশ্মিও জগতকে আলোকিত করে নাই, তখনও মানব-মনে সৌন্দর্য্য পিপাসার অভাব দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকার কৃষ্ণচর্ম্ম নিগ্রো, আমেরিকার লোহিতবর্ণ আদিম অধিবাসী, অষ্ট্রেলিয়ার বন্যজাতি, পশুচর্ম্মাচ্ছাদিত মেরুবাসী, ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অনার্য্য দস্যু, সকলেই আপনার ধারণানুযায়ী স্বহস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যরাজি সুন্দর করিতে যত্নশীল—এমন কি বদ্ধপরিকর। আদিম অবস্থাতেও মানব বৃক্ষকর্ত্তনে ব্যবহৃত কুঠারের কাষ্ঠজাত হস্তধারণীর উপর নানাবিধ লতাপাতা খোদিত করে। পশুচর্ম্মনির্ম্মিত, শয়নকার্য্যে নিয়োজিত স্বীয় তাম্বুও ঝালর দ্বারা শোভিত করে। এ সমস্তই তাহার সহজাত সৌন্দর্য্যজ্ঞানের নিদর্শন।

মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্তোলিত বহু প্রাচীন যুগের যে সমস্ত শিল্প-সামগ্রী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তৎসমুদায় দর্শনে ইহা নিশ্চিত বোধ হয়

যে, মানব যখন শ্বাপদসঙ্কুল বৃহৎ বনানী মধ্যে পশুমাংস ভক্ষণে জীবন যাপন করিত, সেই অসভ্যাবস্থায়ও এই সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়কন্দরে নিহিত ছিল।

ইহা সত্য যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পর শিল্প উন্নতি শিখরে উঠিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সৃষ্টির যুগ হইতেই মানুষ ক্রমাগত শিল্পের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী। অল্পে অল্পে, শত চেষ্টা করিয়া তবে মানুষ সূক্ষ্মশিল্প গঠনে সফলকাম। একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নানা বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ সুখ দুঃখময় মানব জীবনেতিহাসে এমন একটী কালও দৃষ্ট হয় না, যে সময় শিল্পের প্রতি অনুরাগ মানব মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কত ভীষণ দুর্ঘটনা, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত রোগ মহামারী মানবজীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে! করাল দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী কত শত জন মানবপূর্ণ নগরী শ্মশানে পরিণত করিয়াছে! কত শতাব্দী দাসত্ব প্রথার প্রভাবে মানব হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়াছে, এই সমস্ত সময়ে মনে হয় বুঝি সৌন্দর্য্যের অনুশীলন বা শিল্পের চর্চ্চা মানব মন হইতে দুরীভূত হইয়াছিল, মনে হয় বুঝি বা কেবল জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থূল দ্রব্য নির্ম্মাণে মানব স্বীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অন্ধকারময় যুগে অনেক সময়ে আমরা শিল্পের অতীব উন্নতি দেখিতে পাই। সূর্য্য যেরূপ মানবকে সুখে দুঃখে উত্তাপ প্রদান করিয়া আসিতেছে, সেইরূপ এই শিল্প চর্চ্চা মানব মনকে চিরদিন সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দান করিয়া এবং তথায় নব নব আশা জাগরুক করিয়া আসিতেছে।

ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া শুধু সৌন্দর্য্য চর্চ্চা বা সূক্ষ্মশিল্পের অনুসরণ, যাহা আমাদের সাংসারিক জীবন যাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে, তাহাতে লাভ কি? কাহারও কাহারও মনে এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কেবল বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা মানব মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে না। মানব-মন চিরদিনই সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং সৌন্দর্য্যের উপাসনা হইতেই শিল্পের উৎপত্তি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ।

৩০শে বৈশাখ, সোমবার, ভক্তবর শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেনগুপ্ত মহাশয় তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়ে ঠাকুরের একটী উৎসব করেন। তিনি স্বয়ং ঠাকুরের বহুবিধ স্তব ও স্তোত্র পাঠ করিয়া উপস্থিত সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, কুমারহট্ট (হালিসহর) নিবাসী সিদ্ধ ভক্তকবি প্রাতঃস্মরণীয় ৺রামপ্রসাদ সেনের সিদ্ধপীঠে তদস্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের উদ্যোগে প্রাতঃ ৭॥০ ঘটিকায় একটী বিশেষ সভা আহুত হইয়াছিল। ঐদিন দশহরার যোগ থাকায়, সকলেই প্রভাতে পূত-সলিলা ভাগীরথীতে স্নাত হইয়া, অতি শুদ্ধ ও পবিত্রভাব হৃদয়ে লইয়া এই পুণ্যময় স্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ২০০ শত গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় সভাপতিরূপে বরিত হয়েন। বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত লেখক, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় এই সভাস্থলে "রামপ্রসাদ" নামক তাঁহার একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধের ভাব, ভাষা ও লালিত্য অপূর্ব্ব ও ভক্তিরস পরিপূর্ণ। প্রবন্ধ পাঠের সহিত মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দ 'মা' নামের ধ্বনি তুলিয়া সভাস্থল মুখরিত করিয়াছিলেন। আর ভক্তগণ সমবেত হইয়া রামপ্রসাদের অনেকগুলি মধুর সংগীত তথায় গান করিয়াছিলেন। মাতৃসাধক শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র, তত্ত্ব-মঞ্জরীর সম্পাদক, ও শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেনগুপ্ত মহোদয়গণ সভাস্থলে ক্ষেত্রোপযোগী বক্তৃতা দ্বারায় সকলকে বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দপ্রদান করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, যেন বর্ষে বর্ষে সেই মহাপুরুষের সিদ্ধপীঠে এইরূপে উৎসবাদি হইয়া মা নামের অপূর্ব্ব মহিমা প্রচারিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

আষাঢ়, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮ পৃষ্ঠার পর।)

৫২৯। যতক্ষণ অন্তরে ভোগ বাসনা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়না। ছেলের যতক্ষণ খেলা ভাল লাগে, বা আনন্দে সন্দেশ চাকৃতে থাকে, ততক্ষণ মাকে ভুলে থাকে। যখন খেলাও ভাল লাগেনা, সন্দেশও ভাল লাগেনা, তখন মার কাছে যাবার জন্য কাঁদে। ভোগ-বাসনা গেলেই ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

৫৩০। যাকে অনেকে মানে গণে, জানবে—তার মধ্যে ঈশ্বরের কিছু বিশেষ শক্তি আছে।

৫৩১। যার সত্যে আঁট নাই, ক্রমে তার সব নষ্ট হয়ে যায়।

৫৩২। ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক বহুকাল ধরে হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে ঘোরতর তপস্যা ক’রে জ্ঞান লাভের পর তবে সংসারে ফিরে এসেছিলেন।

৫৩৩। জ্ঞান ভক্তি লাভ করে সংসার কল্লে, জড়িয়ে পড়বার আর বড় বেশী ভয় থাকে না।

৫৩৪। ভগবানকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এই মনের দ্বারা জানা যায় না।

যে মনে বিষয় বাসনা নাই, এরূপ শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়, আর এরূপ শুদ্ধ-মন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও হন।

৫৩৫। সাধু সঙ্গ, তাঁর নাম গুণ গান এবং সর্ব্বদা তাঁর চরণে প্রার্থনা—এই গুলি হোলো সংসার বিকারের ঔষধ।

৫৩৬। তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দিবেন, সব ভার লবেন। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হোক্।

৫৩৭। তিনি না বুঝিয়ে দিলে, এ বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। একসের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? সেই অনন্ত-জ্ঞানাধারের নিকট আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান কতটুকু!

৫৩৮। জ্ঞানের দ্বারা নেতি নেতি বিচার করে ব্রহ্মকে জানবার উপায়ের নাম জ্ঞানযোগ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বিচার। সৎ অসৎ বিচার। বিচারের শেষ হলেই সমাধি—আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

৫৩৯। কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ। তবে, এই কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে হবে। কর্ম্মফল তাঁতেই অর্পণ করতে হবে।

৫৪০। ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব ক'রে তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ।

৫৪১। অনেক পণ্ডিত আছে, তাদের চিল শকুনির স্বভাব। চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। তেমনি অনেক পণ্ডিত, খুব লম্বা লম্বা কথা কয়—শাস্ত্রের মতে অনেক কাজও করেছে—কিন্তু তাদের মন বড়ই বিষয়াসক্ত, টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, বিদায়—এই সব দিকেই নজর।

৫৪২। ছেলে ঘুড়ি কেনবার জন্য মার কাছে পয়সা চাচ্ছে। মা হয়ত তখন অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। ছেলে তখন মার কাপড় ধরে টানতে লাগলো। মা তখন—"পয়সা নিয়ে নষ্ট করবি, তিনি এসে বক্‌বেন" ইত্যাদি বলে ছেলেকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো। ছেলে তবুও ছাড়েনা; সে মাকে আরও জোরে টান্‌তে লাগলো, আর কাঁদতে লাগলো। তখন মা গল্প রেখে উঠে এসে, বাক্স খুলে পয়সা দিয়ে দেয়। ঈশ্বরকে পাবার জন্য এইরূপ আবদার কর, তাঁকে পাবে।

৫৪৩। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল। দেখতে দেখতে বল্লে 'মা, যতই সাজো গোজো, তিন দিন পরে তোমায় টেনে নিয়ে গঙ্গায়

ফেলে দেবে।' সংসারের পদ-মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য সবই তেমনি দুদিনের জন্য। কিছুরই অহঙ্কার করতে নাই।

৫৪৪। যে সত্ত্বগুণী ভক্ত, সে ঠাকুরদের পায়েস দেয়; যে রজোগুণী, সে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করে ভোগ দেয়; যে তমোগুণী, সে ছাগ ও অন্যান্য বলির ব্যবস্থা করে। প্রকৃতি ভেদে সকল জিনিসেরই তারতম্য হয়।

৫৪৫। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই সব কাজ করেন, তখনই শক্তি বা কালী।

৫৪৬। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে, দুলচে, তরঙ্গ হচ্ছে,—শক্তির উপমা।

৫৪৭। যিনি মহাকাল বা ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী।

৫৪৮। শাস্ত্র কত পড়বে! শুধু বিচার করলে কি হবে! তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কর্ম্ম কর।

৫৪৯। গুরু যদি না থাকেন, ভগবানের কাছে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ, তিনি কেমন—তিনিই তোমায় জানিয়ে দেবেন।

৫৫০। যতক্ষণ না হাটে পৌছান যায়, দূর থেকে একটা হো হো শব্দ শোনা যায়। হাটে না পৌছিলে কিছু বোঝা যায় না। শাস্ত্রাদি সেই রকম দূর থেকে ভগবানের আভাস দিচ্ছে, তাঁকে না পেলে তিনি যে কেমন, তা বোঝবার যো নাই।

৫৫১। দূর থেকে সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যায়, কাছে না গেলে সমুদ্র কেমন, তা বুঝা যায় না; শাস্ত্রপড়াও সেই রকম, তাতে ঈশ্বরের কথা আছে, কিন্তু ভগবানকে উপলব্ধি হয় না। তাঁকে পেলে—শাস্ত্র, বই, সায়ান্স, এ সব খড়কুটো বলে মনে হয়।

৫৫২। যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কর, তখন তার কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, সবই জানতে পারবে। তিনিই সব তোমাকে বলবেন, আর চাকরদের খোসামোদ করতে হবে না। তেমনি যদি ভগবানকে লাভ করতে পার, শাস্ত্র আর পড়তে হবেনা, সকল সত্য ও সকল তত্ত্ব, তোমার ভিতরে আপনিই প্রকাশ পাবে।

৫৫৩। যদি তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা থাকে, তবে তাঁর কৃপাতে নানা সুযোগও হয়ে যায়। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সৎগুরুলাভ, হয় ত কোনও ভাই বা আর কেউ সংসারের সব ভার নিলে, স্ত্রীটি হয়তো বিদ্যাশক্তি—ধার্ম্মিক, কি আদপে বিবাহই হল না—সংসারে জড়াতে হল না। এই রকমের সব যোগাযোগ হয়ে যায়।

৫৫৪। সংসারে থাক্‌বেনা তো কোথায় যাবে? যেখানেই থাকনা কেন, সবই সেই রামের অযোধ্যা। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা মনে করবে।

৫৫৫। রামচন্দ্র জ্ঞানলাভ করবার পর বল্লেন যে, সংসার ত্যাগ করবো। দশরথ এই কথা শুনে, তাঁকে বশিষ্ঠের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বল্লেন যে, রাম, এ সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? যদি তা হয়, তবে তুমি সংসার ত্যাগ কর। রাম দেখলেন যে, ঈশ্বরই জীব জগৎ সংসার সব হয়েছেন, সুতরাং আর কথা চল্লোনা—চুপ করে রইলেন।

৫৫৬। বেঙ্গাচির যতদিন লেজ না খসে, ততদিন জলে থাকে। লেজ খসলে তখন ড্যাঙ্গায়ও থাকে, আবার জলেও থাকতে পারে। তেমনি জীব যতক্ষণ অবিদ্যার ঘোরে থাকে, ততক্ষণ সংসারে ডুবে থাকে; যখন সে ঘোর কেটে যায়—জ্ঞান হয়, তখন মুক্ত হয়ে আনন্দ মনে বেড়াতেও পারে, আবার ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে পারে।

৫৫৭। একজন কেরাণী জেলে গিয়েছিল। খালাস পেয়ে এসে আবার সে কেরাণীগিরিই করতে লাগলো—সে কি আর ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে? সেই রকম লোকে সংসার মুক্ত হয়েও আবার সেই সংসারেই থাকে।

৫৫৮। কুল খাবে, কাঁটার খোঁজে কি দরকার? তেমনি যার কাছে যা ভাল দেখতে পাবে সেইটুকু নেবে, তার ছিদ্র খোঁজবার কি দরকার?

৫৫৯। নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকে নিত্য। লীলা ধ'রে স্থুল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার মহাকারণ থেকে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থুল দেখা দেয়; তুরীয় থেকে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা এসে পড়ে। মহাসমুদ্রের ঢেউ, মহাসমুদ্রেই লয় হয়। চিৎ সমুদ্রের অন্ত নাই, তাতেই এই সমস্ত লীলা উঠছে, আবার তাতেই লয় হচ্ছে।

৫৬০। মানুষ যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা হলে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করবার জন্য, বা অর্থ, মান, যশ সম্ভ্রমের জন্য তার মন আর দৌড়য় না।

৫৬১। বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, আর অন্ধকারে যায় না। জীব যদি একবার ঈশ্বরের আলো দেখতে পায়, তবে আর সংসারে থাকতে পারে না।

৫৬২। ভগবান শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা তাঁকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন। (ক্রমশঃ)।

মুক্তির উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪১ পৃষ্ঠার পর।)

এখন আমরা সুখ অন্বেষণ করিবার এই দুইটী উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রথম উপায়টীর প্রধান লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন, কারণ এই বিত্তই নিজের ও পরিবারবর্গের আহার্য্য ও শারীরিক সুখ সাচ্ছন্দ্য আনিয়া দিবে। এই নিমিত্তই প্রথমোক্ত ব্যক্তি বিত্তোপার্জ্জন ও ক্ষমতা-লাভে সচেষ্ট। সে জানে যে, এই ক্ষমতা লাভ করিলে সে জগৎকে বাধ্য করিয়া সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু এ উপায় অত্যন্ত অনিশ্চিত। তিনি অর্থলাভ করিতে পারেন কিন্তু হয়ত তাঁহার আহার্য্য হজম করিবার শক্তি নাই কিম্বা অর্থাগম জনিত সুখসম্ভোগে তিনি অসমর্থ। কলিকাতার একজন ক্রোড়পতি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, বার্লি ভিন্ন অন্য কিছু হজম করিতে পারিতেন না। এই শারীরিক সুখ সম্ভোগ বিষয়ে তিনি তাঁহার সামান্য ভৃত্য অপেক্ষাও দুঃখী। তারপর অর্থ থাকিলেই তিনি উহা কতদিন ভোগ করিতে পারিবেন?—যতদিন এই শরীরটী জীবিত থাকে। আমরা সকলেই জানি যে, জীবনের ন্যায় চঞ্চল বস্তু এ জগতে আর কিছুই নাই। মৃত্যু,—শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী ও নির্ধন সকলকেই যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং যখন আমরা নিজেকে দেহ ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারি না, যখন আমরা শারীরিক কিম্বা মানসিক সম্ভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত বলিয়া বোধ করি, তখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারি—সুখ কিরূপ ধ্বংসশীল।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ছয়প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রথমতঃ শিশু গর্ভে থাকে, কিন্তু গর্ভে থাকে বলিয়াই উহা বাহির হইয়া আসে না। গর্ভস্থ শিশুর জন্মও অনেক পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আয়তন বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ইহার বাল্য, যৌবন ও পরিণতাবস্থা একে একে আসিতে বাধ্য।

এই শারীরিক উন্নতির পর কি আসিবে? শারীরিক অধোগতি। চক্ষু ক্রমশঃ দৃষ্টিহীন হইয়া আসিবে, কর্ণের শ্রবণশক্তির হ্রাস পাইবে; হস্ত-পদাদি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং ধারণাশক্তি লোপ পাইবে। এই তো গেল প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেতিহাস। যে মানব এত পরিবর্ত্তনশীল, যে

একটা দেহপিণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এবং যাহার মন সর্ব্বপ্রকার সন্দেহে পরিপূর্ণ, সে মানব কিরূপে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে পারিবে?

মানব জীবন এত পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও কেহ মরিতে চাহে না। লোকে মৃত্যুকে যত ঘৃণা করে এমন আর কাহাকেও করে না। আমাদের এই জীবনই যদি একমাত্র ও শেষ জীবনই হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকে পরিহার করা মানুষের অসাধ্য। মৃত্যু অপরিহার্য্য হইলে মানবের সুখের আশাও বৃথা। কিন্তু জীবন বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? জীবনের অর্থ সৎ আর মৃত্যুর অর্থ অসৎ। এক্ষণে আমাদের বেশ জানা আছে যে, সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি কখনও হইতে পারে না এবং অসতের পরিণতি সৎও হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জীবন কখনও মৃত্যুতে বিকৃত হইতে কিম্বা মৃত্যু জীবনে পরিণত হইতে পারে না। অতএব জীবিত ব্যক্তির মরণ নাই। কিন্তু মানুষ সে জীবন কোথায় পাইবে যাহা মৃত্যুতেও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়া যায়। এই অবিনশ্বর জীবন পাইতে হইলে তাহাকে দেহাত্ম-বোধের বাহিরে যাইতে হইবে এবং এই দেহাত্ম-বোধের বিলোপ সাধন হইলেই সমস্ত জগতের বিলোপ সাধন হইল। কারণ তোমার দেহাত্ম-বোধ আছে বলিয়াই, সমগ্র জগতের সত্তাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। চক্ষুর অস্তিত্বে রূপ-জগতের, কর্ণের অস্তিত্বে শব্দ-জগতের ও জিহ্বার অস্তিত্বে আস্বাদ-জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

আমাদের ঘুমন্ত অবস্থাই এ বিষয়ের সহজ সিদ্ধান্ত। যতক্ষণ তোমার দৃষ্টিশক্তি আছে ততক্ষণ রূপ-জগতেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে; তোমার নাসিকা আছে, তাই গন্ধও রহিয়াছে; কর্ণ আছে বলিয়াই তোমার নিকট শব্দও রহিয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এই একই নিয়ম বর্ত্তমান। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুকর্ণেত্যাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন রূপরসেত্যাদি গ্রহণ করিতে সমর্থ, তখনই তোমাদের জাগ্রতাবস্থা। তারপর তোমার আর একটী অবস্থা আছে উহা চিন্তার অবস্থা। এ সময়ে তুমি জাগ্রত কিন্তু মনেই বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে, যাহাতে তুমি ইন্দ্রিয় ও মন হইতে বহুদূরে চলিয়া যাও, উহাই তোমার সুষুপ্তাবস্থা। এতদবস্থায় কোন বন্ধু আসিয়া তোমার পার্শ্বে সুললিত তানে গান গাহিলেও তুমি উহা শুনিতে পাইবে না, কারণ তুমি তখন তোমার কর্ণেন্দ্রিয়ে বিদ্যমান নও। ইন্দ্রিয়

ও মন হইতে দূরে থাকিয়াও তুমি যে জীবন্ত ও তোমার দেহেই বিদ্যমান রহিয়াছ, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আমি তোমাকে জোরে ধাক্কা দিলেই তুমি জাগিয়া উঠ। এইরূপে জাগিয়া উঠিবার অর্থ কি? ইহাতে তুমি তোমার মন ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট ফিরিয়া আইস। সুপ্তাবস্থায় তোমার স্ত্রী তোমার পার্শ্বে থাকিলেও তুমি উহা জানিতে পার নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেও সেইরূপ তাহারা বিদ্যমান থাকিলেও তোমার জ্ঞানগম্য ছিল না। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সমগ্র জগতের অস্তিত্ব তোমার মন ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। সুষুপ্তাবস্থায় তোমার নিকট কোন জগতের অস্তিত্ব ছিল কি? কোন জগতের স্মৃতি মাত্রও কি তোমার মনে বিদ্যমান ছিল?—না তাহা ছিল না। সুতরাং দেখ, যদিও এই ক্ষুদ্র দেহ সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি এই দেহ দণ্ডের উপরেই সমগ্র জগতের অবস্থান। অর্থাৎ এই দেহাত্মবোধ হইতেই যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎপত্তি। কাজেই জগৎ হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার অর্থ—মন ও ইন্দ্রিয়গণের রাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়া। এই ইন্দ্রিয় মনাতীত অবস্থাই অনন্ত জীবনোপলব্ধি। এই উপায়েই তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন। বাহেন্দ্রিয়ের ও অন্তরেন্দ্রিয়ের (মনের) সংযমেই তাঁহারা এই শান্তাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তুমিও যদি এই উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমারও অনন্ত-জীবন লাভ হইবে। তখন তোমার দেহ মন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যাইবে। ইহাই মানবের মুক্তাবস্থা। ইহাই মুক্তি।

তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, একটী উপায় তোমাকে তোমার লক্ষ্য হইতে দূরে ও অপরটী তোমাকে লক্ষ্যের দিকেই লইয়া যাইতেছে। অর্থোপার্জ্জনরূপ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া তুমি অগ্রসর হইতেছ, উহা অসদুপায়, কারণ উহাদ্বারা তুমি তোমার দেহেরই পূজা করিতেছ। দেহই তোমার পক্ষে একমাত্র দেবতা যাহাকে তোমার সমস্ত পূজোপচার অর্পণ করিতেছ এবং এই দেহ-দেবতার পূজা করিতেছ বলিয়াই, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসিতেছ, উত্তম আহার্য্যে রুচি রহিয়াছে, সুন্দর দৃশ্যপট দেখিতে তোমার নয়ন আকৃষ্ট হইতেছে ও সুললিত সঙ্গীত-স্বরে তোমার কর্ণেন্দ্রিয়ের তুষ্টি সাধিত হইতেছে। ভৃত্য প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু না কিছু আশা করিয়া থাকে। কিন্তু তুমি যে

তোমার দেহ-দেবতাকে এইরূপে সেবা করিয়া আসিতেছ, তাহার জন্য তোমার কি লাভ হইতেছে? এই সেবা—যাহাকে তুমি অত্যন্ত ঘৃণা কর, তাহারই দিকে তোমাকে লইয়া যাইতেছে। ইহা তোমাকে মৃত্যুর নিকটেই লইয়া যাইতেছে।

এই দেবতাকে তুমি কত জীবন ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছ, কিন্তু তিনি তোমাকে প্রতিবারই মৃত্যু দিয়া পুরস্কৃত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং এরূপ সেবা প্রকৃত সেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি তুমি প্রকৃতই সেবা করিতে চাও, যদ্দ্বারা তোমার যথার্থ পুরস্কার লাভ হইবে, তাহা হইলে এক সদ্বস্তু, ভগবান্‌কেই সেবা কর। ইহাতেই তোমার অনন্তজীবন লাভ হইবে।

যে পথ অবলম্বন করিয়া তুমি এই যথার্থ সেবাকার্য্যে ব্রতী হইতেছ, উহা অন্তররাজ্যাভিমুখেই প্রসারিত, বহির্জগতের দিকে উহার প্রসার আদৌ নাই। যে উপায় অবলম্বন করিয়া তুমি অনন্তজীবন লাভ করিতে যাইতেছ, উহা শারীরিক শক্তি নিচয়ের বাহ্য পরিচালনা নহে, কিন্তু মানসিক শক্তিপুঞ্জের যথাযথ অন্তঃসঞ্চালন। তোমার সমস্ত শক্তিকে অন্তরাভিমুখেই নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমি অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি ইতর প্রাণী অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নও। প্রকৃত জীবনের বিকাশ অন্তরেই হইয়া থাকে, বাহিরে নহে। কিন্তু ইহার বিকাশ কঠোর সাধন সাপেক্ষ। কত জীবন ধরিয়া নিরন্তর দেহ পরিচর্য্যায় অভ্যস্ত তোমাদের পক্ষে একেবারেই ঈশ্বরোপাসনা করা তত সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে না। মনোজগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অপেক্ষা বহির্জগতের উপর প্রভুত্ব সহজতর। এই জন্যই অর্জ্জুনের মত মহারথীকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার অনেক রাজ্য অধিকার করা সত্ত্বেও, তিনি নিজ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কি? অর্জ্জুনের বীরত্বে কেহ সন্দিহান নহে ইহা সত্য কিন্তু তিনি তো মনোরাজ্যে বীরত্ব প্রকাশ কথনও করেন নাই! তাই তিনি এ ক্ষেত্রে নিজকে এত বীর্য্যহীন বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ন্যায় আমরাও কথন মনের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করি নাই। কিন্তু ইহ-জীবনেই তোমার অনন্ত সত্তার উপলব্ধি করিতে হইলে, তোমাকে মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় পথ নাই।"

"নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৬ষ্ঠ অঃ ১৫শ শ্লোক।

তাহা হইলে দেখিতে পাইলে জীবনে সুখী, ধনী ও শক্তিমান হইবার ইহাই একমাত্র পথ। এই পথ অনুসরণ করিতে হইলে কোন্ শক্তির প্রয়োজন? প্রবল ইচ্ছাশক্তি। কার্য্যকরী বলবতী ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে এই পথের সন্ধানমাত্র জানিয়া কোন লাভ নাই।

নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় হয়ত তোমার জানা থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি রন্ধনশালায় গিয়া সত্য সত্যই সে গুলিকে প্রস্তুত না কর, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তোমার জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই। সুতরাং মুক্তির পথ যে অন্তর্জগতেই বিদ্যমান,—শুধু এই জ্ঞান তোমাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না। অন্তররাজ্যে প্রবেশ লাভ কবিতে হইলে তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে। এই নিমিত্তই ধর্ম্ম কেবলমাত্র সাধন সাপেক্ষ। ধর্ম্মলাভের সহিত নিরর্থক বাগবিতণ্ডার কিম্বা বৃথাকল্পনার কোন সম্বন্ধ নাই। এই সমস্ত তর্কযুক্তি ও কল্পনা মুক্তিলাভ করিবার বলবতী ইচ্ছা জন্মিবার পূর্ব্বে তোমার মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু যদি তোমার ভগবানকে পাইবার প্রবল ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে নিরক্ষর মূর্খ হইয়াও তুমি অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে পার ও তাঁহাকে লাভ করিতে পার। তাহা হইলে এমন কি অত্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও জ্ঞানলাভের আশায় তোমার চরণপ্রান্তে উপনীত হইবেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি কদাচিৎ লিখিতে কিম্বা পড়িতে পারিতেন। তথাপি বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের জীবনের সন্দেহ ভঞ্জন মানসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। কি উপায়ে তিনি এই সকল সমস্যার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন? ইহার কারণ ভগবানকে লাভ করিবার অত্যন্ত বলবতী ইচ্ছা তাঁহার ছিল এবং তিনি তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন। মানুষ শুধু পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া কিম্বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই জ্ঞানলাভ করিতে পারে এই ধারণার প্রতিকূলে তাঁহার জীবনই একমাত্র জলন্ত সাক্ষী। জ্ঞান লাভ বিষয়ে এরূপ ধারণা অতি অকিঞ্চিৎকর। জীবনব্যাপী এরূপ চেষ্টার পর তুমি দেখিতে পাও যে, বাস্তবিক পক্ষে কোন বিষয়ে তোমার জ্ঞানলাভ হয় নাই। সক্রেটিস অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, তিনি কিছুই জানেন না।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহাত্মাব্যক্তি শুধু যে নিজেই ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও ভগবল্লাভ করাইয়া দিতে পারেন। বাল্যাবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ একজন ব্যক্তিকে

খুঁজিয়া বেড়াইতেন, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন, নতুবা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস কিরূপে হইবে! যখনই তিনি কোন বড় সাধু কিম্বা পণ্ডিতের বিষয় অবগত হইতেন, তখনই তিনি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "মহাশয়, ঈশ্বর কি আছেন?" সাধু বলিতেন "হাঁ, তিনি আছেন।" স্বামীজির দ্বিতীয় প্রশ্ন হইত "তাঁহাকে কি আপনি দেখিয়াছেন?" তাঁহারা যখন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না, তখন তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিতেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, এমন কেহই নাই, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন। এবং ইহার ফলে তিনি এই ধারণায় উপনীত হইলেন যে, ঈশ্বর বলিয়া জিনিসটা কল্পনারই বস্তু, বাস্তব জীবনে লাভ করিবার নহে। তারপর একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর অবতার পুরুষের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন?" রামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন 'হাঁ, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।' "মহাশয় আমায় কি তাঁহাকে দেখাইতে পারেন?" স্বামীজির এই প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন যে, তিনি তাহাও পারেন। এই কথার পর তবে স্বামীজি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার অগ্রে নহে। এবং এই নিমিত্তই তিনি তাঁহার সমস্ত পুস্তকে বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্ম উপলব্ধি সাপেক্ষ, উহা জীবনে লাভ করিবারই বস্তু, কল্পনার বস্তু নহে।

তোমাদিগের সকলকেই ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য তোমাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ পুরাতন অভ্যাস সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহারা তোমার শরীর দেবতার পূজার ফলে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তারপর মন ও ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য বিস্তার। ভগবান্ ঈশার ন্যায় এই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে না পারিলে (অর্থাৎ বশীভূত করিতে না পারিলে) তোমার উন্নতির সম্ভাবনা নাই— এই দেহাত্মবোধ হইতে নিজকে উচ্চাবস্থায় লইয়া যাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় এবং সকলকেই এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে ভগবান্‌কেই সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইতে হইবে। যদি তুমি সৌন্দর্য্যের প্রেমিক হও, তাহাহইলে ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাতে এত সৌন্দর্য্যের

বিকাশ দেখিতে পাইবে? যদি তুমি বক্তৃতার পক্ষপাতী হও, তাহা হইলে সমগ্র বেদ যাঁহার মুখনিঃসৃত, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার অন্বেষণ করিবে? যদি তুমি শক্তিকে ভালবাস, তাহা হইলে ভগবান অপেক্ষা কোন ব্যক্তি অধিকতর ক্ষমতাশালী? সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য্য অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী, কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী। অতএব যদি তুমি অক্ষয় সৌন্দর্য্য, অনন্তজীবন, সমগ্র ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাও, তবে একমাত্র ভগবানকেই অনুসরণ কর। কিন্তু ভগবান লাভে অর্থ কিম্বা অনুমতি পত্রের আবশ্যক করে না। তাঁহার নিকট যাইতে হইলে পায়ের আবশ্যক করে না; তাঁহাকে দেখিতে হইলে চক্ষু অনাবশ্যকীয়, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে কর্ণেন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই। তিনি তোমার অন্তরেই বিদ্যমান এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে তোমাকে এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়কে নিরোধ করিতে হইবে। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে চক্ষুকে বহির্জগতের সৌন্দর্য্য হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে; তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে কর্ণকে শব্দ হইতে নিরুদ্ধ রাখিতে হইবে। ভগবৎ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইলে বাহ্য-জগতের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অতএব মুক্তির এই পথ অবলম্বন কর, অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে লাভ কর। এই উপায় অবলম্বন করিলেই তুমি প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারিবে। কিন্তু এই সাধনা অত্যন্ত বলবতী ইচ্ছা সাপেক্ষ। একবার যদি তোমরা তাঁহার সহিত তোমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পার—যদি তোমরা বুঝিতে পার যে তিনিই তোমাদের পিতা, তিনিই তোমাদের মাতা, তিনিই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও জীবনের সঙ্গী, তাহা হইলে তোমরা অনন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবে, কারণ তিনি তোমাদের যত্ন লইতে ও দুঃখ মোচন করিতে, এমন কি তোমাদের আজ্ঞাধীন ভৃত্য পর্য্যন্ত সাজিতে রাজী আছেন। অতএব যদি তোমরা উন্মাদ না হও, তাহা হইলে তাঁহাতেই তোমাদের মনোপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হও, কারণ একমাত্র তাঁহা হইতেই তোমরা শুদ্ধ আনন্দ ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে।

ব্রহ্মচারী শক্রঘ্ন।

সমর্পণ।*

সুখ দুখ মম, হে চিরবন্ধু,
সঁপিনু তোমায় প্রীতি-উপহারে।
কিছুই চাহি না—কামনা নাহি কিছু
শুধু হিয়া মাঝে রাখিব সাদরে।

হৃদয়ে আর নাহি রাখিব কোন আশা,
দিব হে সঁপিয়া এ দীন-ভালবাসা,
অগাধ অসীম অনন্ত সৌম্য
ভেসে যাব তব চিন্তা-সাগরে।

তুমি থাকিবে মোর ব্যাপিয়া সারা বুক,
—কি সে মধুরিমা, কি সে মহাসুখ!
তোমার হইয়া তোমারে লইয়া
আমারে সঁপে' দিব, বন্ধু, তোমারে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

বাঁশরী ও তুমি।

যে বংশী ধ্বনি মেঘনিস্বন অপেক্ষাও মহান, যাহার নিশীথ নিনাদ বীচি-বিক্ষোভিতা যমুনাকে প্রশান্ত করিয়া কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত, যে বংশীশব্দে বৃন্দারণ্যের প্রতি বন প্রতিধ্বনিত হইত, যাহার আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমতী রাধা কুলকলঙ্কিনী হইয়াছিলেন, যাহার মধুর শব্দে ধেনুগণ মুখের শষ্প মুখে করিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে ছুটিত, যে রব শুনিতে বৃন্দাবনের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পতিকক্ষ হইতে সতী, মাতৃবক্ষ হইতে স্তন্যপানরত শিশু আত্মহারা হইয়া কোন্ দিক দিয়া যাইবে স্থির করিতে পারিত না, যাহার মধুর নিনাদ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর করধৃত কমণ্ডলু হস্তভ্রষ্ট করিত, যে বংশীরব শুনিবার জন্য সাংখ্য, বেদান্ত চীৎকার করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত, যে বংশীরব শ্রবণে দেবাদিদেব মহাদেব তাণ্ডব-নৃত্যে জগৎ কম্পিত করিয়াছিলেন,—আজ সেই বংশী কোথায়? তাহার মধুর প্রাণোন্মাদী

---

* রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল তেওড়া।

সেই রবই বা কোথায়? আর সেই ব্রজবাসীর প্রেমধন, গোপীকাজীবন, রাধিকারমণ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? প্রভু! তুমি কোথায়! তোমার মুখামৃতপান-নিরত বংশী কোথায়! বলিয়া দাও প্রভু। দাস তোমার শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীমুখনির্গত বংশীরব শ্রবণের জন্য একান্ত উৎসুক চিত্ত! কি বলিলে প্রভু! বলিবে না! ভাল! তুমি না বল—একবার তোমার সৃষ্ট বস্তুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি! তাহারা এ হতভাগ্যের মর্ম্মন্তুদ প্রশ্নের উত্তর দেয় কি না! হে অনন্ত আকাশ, উজ্জল নক্ষত্রমণ্ডল, সর্ব্বতোগতি বায়ু; হে প্রকাশময় সূর্য্যদেব! হে নবপ্রণয়ী হৃদয়ানন্দদায়ক চন্দ্রদেব! তোমরা কি আমায় বলিতে পার—তোমাদের সেই স্রষ্টা কোথায়! তাহার সেই সর্ব্বস্ব ধন—না! না! গোপিকাদের প্রাণমন-চোর বংশী কোথায়! কি বলিলে! তোমারাও এ হতভাগ্যকে উত্তর দিবে না! তা দিবে কেন! তোমরাও যে তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী।

অয়ি মাধবী-লতে! তুমি বলিতে পার আমার প্রভু কোথায়? একি তুমি কাঁদিতেছ কেন? অহো! বুঝিয়াছি তুমিও তাঁহারই বিরহানলে তাপিতা! অয়ি বিদ্যুদ্বরণী, প্রেমময়ি! শ্রীমতী রাধে! শুনিয়াছি তুমিই তা'র একমাত্র হৃদয়ানন্দদায়িনী ছিলে। তুমি কি দয়া করিয়া এ হতভাগ্যের প্রশ্নের উত্তর দিবে? না! না! তোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমার ভ্রান্তি মাত্র। কারণ তুমি আমা অপেক্ষাও দুঃখী! যে কালার জন্য তুমি কুল, মান, সুখ, ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছিলে ও তোমার দেখাদেখি ব্রীড়াধনত-মুখী গোপবধূরাও স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, উদাসনয়নে, আপনা ভুলিয়া তন্নিষ্ঠচিত্ত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল—সেই কালা তাহাদের না বলিয়া—তোমাকে না বলিয়া—তাহার রাধানামে সাধাবাঁশী লইয়া পলাইয়াছে! হে ব্রজবালকগণ! তোমরা কি এই হতভাগ্যের প্রশ্নের উত্তর দিবে? যদি ইচ্ছা কর—তাহা হইলে আমার বিশ্বাস তোমরাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ! কারণ তোমরা তাঁহার খেলার সাথী, সেই ক্রীড়াময়ের ব্রজক্রীড়ার প্রধান সহায়! সেই ছলনাময়ের প্রধান অনুচর! বুঝিয়াছি! তোমরাও জাননা যে—আমার সেই পরমারাধ্যধন কোন পথে পলাইয়াছে! তোমরা যদি জান তাহা হইলে এরূপ ছল ছল নেত্রে, বিষাদমাখামুখে, শূন্যহৃদয়ে কাহার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছ! কই! যতদিন শ্যাম ছিল, শ্যামের প্রাণমাতান বংশী ছিল, ও বংশীর মনোচর ধ্বনি বর্ত্তমান ছিল, তখন তো তোমাদের এরূপ বিষাদ কালিমাময় মুখ

দেখি নাই! এরূপ উদাস বিহ্বল নয়ন দেখি নাই। তখন কি দেখিতাম! তখন দেখিতাম—তোমাদের হাস্য-প্রফুল্লবদন, প্রীতি-বিস্ফারিত কপটতাশূন্য চক্ষু, রাধাশ্যামের প্রেমমদিরা পানোন্মত্ত হৃদয়। না। না। মনে পড়িয়াছে। তোমরা যে ছলনাময়ের অনুচর। সুতরাং তোমরাও কপটী। তবে কেন তোমরা আমায় তাঁহার পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। কি বলিতেছ? তোমরা প্রকৃতই আমার প্রভু কোন্ পথে গিয়াছেন জাননা। তোমরাও আমারই মতন মর্ম্মভেদী যাতনায় উৎপীড়িত! ভাল। তবে আর—তোমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আমার লাভ কি?

অয়ি কলকলনাদিনি। পূর্ণাকল্লোলিনি। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস-রসিকে যমুনে! তুমি কি জান—আমার সেই কাঙ্গালের ঠাকুর—তোমার ঐ ধীর সমীর তটে বসিয়া—যে বাঁশী বাজাইয়া ব্রজবাসী ও ব্রজাঙ্গনার প্রাণ মন চুরী করিয়াছিল, যে বাঁশরীর শব্দে একদিন তুমি উজান বহিয়াছিলে—সেই বাঁশরী লইয়া আজ কোন পথে পলাইয়াছে। যমুনা—সত্য সত্যই তুমি জাননা বলিয়া আমার মনে হইতেছে! আমার আজ তোমাকে দেখিয়া তুমি সে যমুনা নহ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, কারণ যে যমুনা একদিন আমার প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে উল্লসিতা হইয়া স্ফীতা হইয়া উঠিয়াছিল, আজ কিনা সেই যমুনা তাঁহার বিরহেও পূর্ণ বেগবতী, হাস্যময়ী, মধুরনিনাদী। তুমি কখনই সে যমুনা নহ! যমুনা যে—সে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। তবে তুমি কে? তুমি কি কোন মায়াময়ী—আজ সময় বুঝিয়া নিজ অবস্থাগত এ অধমকে পরিহাস করিবার নিমিত্ত যমুনারূপে বিরাজমানা! যদি তাহাই হয় তাহাহইলে তুমিও মায়াময়ি! আমার ন্যায় কাহারও বিরহে বিরহিণী। না না! তা নয়? কৃষ্ণসখি, কৃষ্ণ বিরহে আমি অন্ধপ্রায়। তাই তোমাকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই! ভ্রান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শ্যামসখি! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমিই সেই যমুনা! তোমার ও নিনাদ মধুর নিনাদ নয়—উহা হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! তোমার ও বেগ প্রকৃত পূর্ণা স্রোতস্বতীর বেগ নয়—উহা তাঁহারই বিরহ কাতর হৃদয়ে—তাঁহারই পথের অনুসন্ধানের জন্য শূন্যপ্রাণে ত্বরিত গতি! তোমার ও হাস্য স্বভাবের হাস্য নহে—উহা বিরহোন্মত্তার অস্থানহাস্য। প্রভু! একি করিলে? কৈ কাহারও নিকটে তো তোমার অনুসন্ধান পাইলাম না! কৈ! কেহ তো আমায় তুমি কোন পথে গিয়াছ বলিতে পারিল না। আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব! জিজ্ঞাসা করিবার মতন আর তো কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না দয়াময়! বলিয়া দাও দয়াল! কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তোমার রাঙ্গা

চরণযুগলের ও তোমার রাধানামে সাধাবাঁশীর দর্শন পাইব? ছলনাময়! আর কত ছল দেখাইবে প্রভু! ঐ যে কি দেখা যাইতেছে না! তোমার শ্রীচরণরজের উপর উহা কি দেখা যাইতেছে? ও যে তোমারই পদাঙ্ক! হে নাথ! যাহার ঈষৎ সম্পর্কে পাষাণময়ী অহল্যা মানুষীতনু প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেবগণ যে চরণের ধ্যানে সদা নিরত, আজ এ হতভাগ্য দাস তোমার শ্রীচরণরজের উপর যখন সেই মুনিজনবাঞ্ছিত শ্রীপদাঙ্কের দর্শন পাইয়াছে, তখন আশা হয় যে—এবার তোমারও সন্ধান পাইবে।

হে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-শোভিত, ব্রজকুলবধুপ্রাণ পদাঙ্ক! আমায় দয়া করে বলে দাও—আমার প্রাণনাথ তাঁহার সাধের বাঁশী লইয়া কোনপথে গিয়াছেন! পদাঙ্ক! চুপ করিয়া রহিলে যে? যদিও তুমি মুনিজনবাঞ্ছিত ধন, তথাপি—এ হতভাগ্যের উত্তর দানে বাধা! যদি বল "আমি তোমার উত্তর দিব না" তাহা হইলে তোমার মহিমা হ্রাস হইবে; লোকে আর তোমায় তাঁহার পদাঙ্ক বলিবে না। কেন বলিবে না—তাহা বুঝিয়াছ কি! আমার অনুমান হইতেছে—গর্ব্বভরে তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই! তবে বলি শোন! তুমি যাহার পদাঙ্ক বলিয়া আজ এত আরাধ্য—তোমার সেই আরাধ্য-দেবতা সর্ব্বদা মধুমাখা কণ্ঠে বলিতেন "ডাকার মত ডাকলে পরে, গোলোক ছেড়ে তাহার হই।" তবে কি তোমায় আমার ডাকার মত ডাকা হয় নাই! তাইতে কি তুমি আমায় উত্তর দিতেছ না! বল পদাঙ্ক! আমায় বলে দাও! কি বলে ডাকলে তুমি আমার বাক্যের উত্তর দিবে। তুমি আমার মাধবের পদাঙ্ক। তুমি প্রভু—আমি দাস। তোমায় আমায় সেব্য সেবক সম্বন্ধ। দাসের অপরাধ ক্ষমা কর পদাঙ্ক! তোমায় অনুনয় করে বল্‌ছি—হয় আমাকে আমার প্রাণনাথের পথের সন্ধান বলে দাও—নচেৎ আমায় ডাকার মত ডাকতে শিখাও! একি হলো প্রভু! সহসা আমার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ হইতে যেন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উদাত্ত-স্বরে বলিতেছেন—হে সংসার-তাপদগ্ধ ভ্রান্ত জীব! আমি স্থাণু; আমি অচল, আমি সর্ব্বগত। তোমার ভ্রান্তি দূর কর! দেখ, এই আমি তোমার চিরপরিচিত পুরাণপুরুষ। আমি কোথাও যাই নাই; আমি বৃন্দাবনের গোপবধূদিগের অহেতুকী ভক্তিতে চিরবদ্ধ। আমি বৃন্দারণ্যে পূর্ব্বের ন্যায়—এখনও আছি। এখনও নিত্যলীলা করি—অথচ আমি প্রতি বস্তুতে অবস্থিত। প্রাণময়! প্রণবরূপ গরুড়বাহন! চিনিয়াছি তোমায়। প্রভু, তোমার ও জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি সম্বরণ কর? একদিন তোমার প্রাণসখা ধনঞ্জয় ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া হৃষ্ট, ভীত ও ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়াছিল—

"তদেব মে দর্শয় দেবরূপং।
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

তুমিই না বলিয়াছিলে যে "আমায় এই রূপ বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই আমার এই রূপ জ্ঞাত, দৃষ্ট ও অধিগত হইয়া থাকে।" প্রভু। আমি ভ্রান্ত জীব! আমার সে অনন্যভক্তি কোথায় নাথ—যে তোমার ঐ তেজোময় মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হইব? দয়াল! যদি এ অধমকে কৃপা করিয়াছ—তবে ওহে ভক্তপ্রাণধন! আমায় তোমার পীতধড়া-শোভিত, বংশীবাদননিরত, লীলাময় মূর্ত্তি দেখাও। জীবন ধন্য হউক, প্রাণ স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ হউক। ভক্তবৎসল। এই যে তোমার সেই মধুর মূর্ত্তি! জীবন, তুই আজ ধন্য! নয়ন, আজ তুই সার্থক! হে নবজলধরকান্তি, গোপবধূ-দুকুলচোর, হে সংসারমহীরূহবীজ! তোমায় কোটি কোটি নমস্কার!

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।

শুভ-যাত্রা।

দেবদূত—

"এস এস ভক্তরাজ, আসিয়াছে দিব্যরথ,
আসিয়াছি মোরা,
প্রভু রামকৃষ্ণ আজি শ্রীগোলোকধামে বসি
প্রেমেতে বিভোরা!"

শশী—

"কহ কহ দেবদূত কোথায় আছেন প্রভু
কার সনে বসি,
আমি কি গেলেই সেথা তাঁহার দর্শন পাবো
ওহে স্বর্গবাসী!"

দেবদূত—

"যথায় শ্রীযোগানন্দ বিবেক-আনন্দ, রাম,
স্বামী নিরঞ্জন,
সেথা আপনার তরে প্রভুর আজ্ঞায় দেব
রচিত আসন!"

শশী—

"বল বল দেবদূত রামকৃষ্ণ পূজা-কার্য্য
পাব কি সেথায়—
জনমে জনমে মুঁই লইয়াছি এই ব্রত
ছাড়িব না তায়।"

দেবদূত—

"কি বলিব ভক্তবর আনন্দ সংবাদ বড়
যত ভক্তগণ,
সাজায়ে প্রভুরে সবে করিছে প্রতীক্ষা তব;
পূজার কারণ!"

শশী—

"তবে গো সাজাও রথ বিলম্বে নাহিক কাজ—
ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম,
যা'ব আজি নিত্যধামে সেবিতে রাজীবপদ—
অতি প্রাণারাম!"

দেবদূত—

"মোদের বিলম্ব নাই সকলি প্রস্তুত দেব
এলে রথ'পরে,
চলিবে আপনি রথ খুঁজিয়া আপন পথ
এস ত্বরা করে।"

শশী—

"দাঁড়াও হে দেবদূত, মাতাঠাকুরাণী-পদ
করিতে দর্শন,—
আশা বড় আছে মনে; কিন্তু তিনি না আসিলে
ছাড়িব ভুবন।"

দেবদূত—

"ওই শোন ভক্তরাজ জয়রামবাটী হ'তে
আসে ভক্তগণ,
বলিছে "তাঁহার আসা হইলনা, হইবে না";
দেরী কি কারণ?"

শশী—

"তবে বুঝি প্রভু আজ্ঞা শুনিতে পাইয়া তিনি
(মম) বিলম্বের ভয়ে—
মর্ত্ত্যে শেষ দেখা মোরে নাহিক দিলেন দেখি
শিরে পদ দিয়ে।"

দেবদূত—

"শরীর আসেনি তাঁর আসিয়াছে প্রাণখানি
বায়ুতে মিশিয়া,
হের হের দিব্য-চক্ষে সত্বর সারিয়া কর্ম্ম,
এসহে চলিয়া।"

শশী—

"শুনে হে শরৎ ভাই, হে মাষ্টার মহাশয়—
হে সেবকবৃন্দ—
রাখাল রাজারে মোর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বল
'আনন্দ' "আনন্দ"
দুইটী একটী মোর নিবেদন আছে ভাই
অনুগ্রহ করি,
শুনিও সকলে আজি— এই মোর শেষ কথা
হাতে পায়ে ধরি।
সকলে রাখিও মনে— প্রভু রামকৃষ্ণ রায়
বিবাদ ভঞ্জনে,
বিলাইয়া বিশ্বপ্রেম সাধিলেন লোকহিত
থাকে যেন মনে।
যেই ক্ষমা-ধর্ম্ম প্রভু দেখাইলা তোমা সবে
আপনি আচরি,
জাগুক্ সকল প্রাণে রামকৃষ্ণ-মিশনের
কার্য্য হাতে করি।
যে কিছু ক্রটির রেখা ভকতে দিবেক দেখা
রামকৃষ্ণ সংঘে,
ক্ষমা আচরিয়া সবে মিটাইয়া দিও সব
মাইশোরে, বঙ্গে।
"সংহতি কার্য্যসাধিকা" ভুলিওনা ভুলিওনা
রেখ সদা মনে,
প্রেমসূত্রে গাঁথি সবে করে লও আপনার
প্রেমে পশু মানে।
জানিও এ প্রভু আজ্ঞা অন্যথা করিলে পরে
অবাধ্যতা দোষে,

হইবে সকলে তুষ্ট সকলি হইবে নষ্ট
এই ফল শেষে।
যদি বিশ্ব-প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সবে
লেগে যাও কাযে,
বিশ্বাস আমার প্রাণে, পূজিত হইবে সবে
মানব সমাজে।
আসি তবে লও, লও শেষ নমস্কার মম
হে ভকতগণ,
করহ আশীষ মোরে যেন চিরদিন তরে
পূজি সে চরণ।"

এতেক কহিয়া শশী চলে দিব্যরথে,
চতুর্দ্দিগে চারি দেবদূত চলে সাথে।
সকলেই আজ্ঞামাত্র করে কত কাজ,
দেখি শুনি অবাক্ হইলা ভক্তরাজ।
যতই নিকটে যায়, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি—
শুনিয়া প্রফুল্ল বড় ভক্ত শিরোমণি।
আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য পড়ে নেত্রপথে,
ভক্তগণ আসে রামকৃষ্ণ-লোক হতে!
লইতে শ্রীশশী মহারাজে সসম্মানে,
পাঠায়েছে রামকৃষ্ণ দেব দেবীগণে।
সকলের সঙ্গে শশী চলে রঙ্গে ভঙ্গে,
সকলে উন্মত্ত আজি সে প্রেম তরঙ্গে!
যবে গিয়া রামকৃষ্ণ শ্রীচরণতলে,
বসে রামকৃষ্ণানন্দ আনন্দ বিহ্বলে,
মর্ত্ত্যের সকল কথা শুনিবার তরে,
কৌতূহলে পুছে প্রভু, হেথ, ভক্তবরে।

প্রভু—

"কহ শশী কি সংবাদ, কেমন আসিলি দেখি
কহ সমাচার,
যে বিশ্বজনীন প্রেমে ভাসাইনু চরাচরে
আছে কি আঁধার?"

শশী—

"প্রভু! যেই প্রেমসুধা, বিতরিলে ধরাধামে
ভারত হইতে,
ইংরাজ মার্কিণ আদি আপন আধার লয়ে—
আসিল লইতে।

কিন্তু হায়! হিন্দুস্থানে দ্বেষ-বহ্নি-ধূম-রেখা
দিয়াছে দর্শন,
আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়া সতর্ক করি
এসেছি এখন।"

প্রভু—

"ভারতের ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন তাই জানি
ভারত সন্তান,
পেয়ে ধন নিজ ঘরে বড় অবহেলা করে
ধন্য হিন্দুস্থান।
এ হেন সুযোগ কিন্তু যদি পায়ে দেয় ঠেলে
অনুতাপানলে,—
জ্বলিবেক নিরন্তর কি করিতে পারি আমি—
কর্ম্ম দোষ বলে।"

* * *

প্রভুরে প্রণাম করি আসিবার পরে,
নরেন্দ্র শ্রীরাম আদি আলিঙ্গন করে।
খগেন * সতীশ । আদি শ্রীসেবকবৃন্দে,
ঢুলায় চামর ভক্তে অতীব আনন্দে।
এইবার ভক্ত যত মিলিয়া সকলে,
করে সংকীর্ত্তন "জয় রামকৃষ্ণ" বলে।
ধন্য শুভযাত্রা! ধন্য শশী মহারাজ!
ধন্য প্রভু রামকৃষ্ণ! ধন্য সবে আজ!
জয় রামকৃষ্ণ জয়, জয় রামচন্দ্র,
জয় জয় শ্রীযোগীন, জয় শ্রীনরেন্দ্র।
আর কি বলিব প্রভু এই নিবেদন,—
দাও শুদ্ধাভক্তি সবে, বিবাদভঞ্জন!
রামকৃষ্ণ নামে সবে ভুলিয়া বিবাদ,
সদাই মাতুক প্রেমে, এই মোর সাধ।
হের রামকৃষ্ণ-ভক্ত আছ যে যেখানে,
মধ্যে রামকৃষ্ণ, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণে।
এঁকে লও হৃদিপটে সেই ছবিখানি,
তবে পাবে অন্তে রামকৃষ্ণ গুণমণি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

---

* স্বামী বিমলানন্দ।

। স্বামী স্বরূপানন্দ।

বিরহ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ।

—:০:—

[পৌষের সংখ্যায় আমরা এই পত্রখানি প্রকাশ করিব, এরূপ ইচ্ছা গত অগ্রহায়ণের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। উপযুক্ত সময়ে ইহা আমাদের হস্তগত না হওয়াতে এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত জনৈক ভক্ত কর্ম্মোপলক্ষে হঠাৎ বিদেশে গমন করেন। তথায় তিনি দে॰ ন্দ্রনাথের অভাবে ও গুরু ভ্রাতাগণের অদর্শনে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে-ছিলেন। এ কষ্টের একমাত্র কারণ এই যে, ৬।৭ বৎসর যাবৎ একত্র কাটাইয়া, হঠাৎ বিদেশে অবস্থান হেতু দেবেন্দ্রনাথের স্নেহাভাব-বোধ ও তাঁহার সঙ্গসুখে বঞ্চিত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই আশ্রিত প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথকে তাহার দর্শন মানস করিয়া পত্র দিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ৵ পূজার পর দেহ রাখিবেন জানিতেন, তাই ৵ পূজার সময় শেষ দেখা দেখিবার জন্য আশ্রিতকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আশ্রিতের ভাগ্যে যে দেবেন্দ্র-নাথের দর্শন আর ঘটিবেনা, তাহা দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন, তাই লিখিয়াছিলেন "দেখা হইবার হয় অবশ্যই হইবে"। আশ্রিত ২।৪ মাসেক অদর্শনে কষ্ট পাইতেছে কিন্তু শীঘ্রই যে চির অদর্শন ঘটিবে তাহা দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অদর্শন জনিত বিরহে ধৈর্য্যাবলম্বন জন্যই এই পত্র লিখিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব "অনুরাগী" ভক্ত বলিতেন, আর শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী "সখি" বলিয়া ডাকিতেন। সমাঙ্গো-পাঙ্গ রামকৃষ্ণ স্তোত্রে তাই দেবেন্দ্রনাথকে বলা হইয়াছে—

"সখীতি" খ্যাতি যস্তেহ গোপী প্রেমোন্মদাপ্লুতঃ
দ্বিজন্মায় নমস্তুভ্যং দেবেন্দ্রায় দিবৌকসে।

বাস্তবিক দেবেন্দ্রনাথ উপরোক্ত বিশেষণের যে কতদূর উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আর যাহাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পত্রখানিতেই সে পরিচয় পাইবেন। এই পত্র পাঠে দেবেন্দ্রনাথ যে যথার্থ অনুরাগী ও প্রেমিক ছিলেন তাহার কি যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না? বাস্তবিক দ্রব্য আস্বাদ না করিলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা কি সম্ভবপর হয়? আশ্রিত ব্যক্তি অনেক সময়ে এই পত্র খানি পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের বিয়োগ ব্যথা নীরবে সহ্য করেন, এবং শান্তি পান। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই যে তাঁহার বিয়োগে সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছেন ইহাই আশ্রিত মহা সৌভাগ্য মনে করেন। দেবেন্দ্রগতপ্রাণ তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণও যেন দেবেন্দ্রনাথের এই পত্র পাঠে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। গুরুদেবের সান্ত্বনা বাক্যই গুরুদেবের অদর্শন জনিত কষ্ট লাঘব করিতে একমাত্র সক্ষম। এই পত্র লিখিবার একমাস চারিদিন পরেই দেবেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করেন। সং—উদ্বোধমঞ্জরী]

——

(পত্র।)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা।

ইটালী রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়।
২০ নং দেবলেন, কলিকাতা
৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১১।

* * * * * !

তোমার পত্রে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় প্রাপ্তে বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমা হইতে দূরে আছ বলিয়া ক্ষোভ করিও না। প্রেমের তিনটী অবস্থা; প্রথমে পূর্ব্বরাগ, পরে মিলন, তৎপরে বিরহ। এই অবস্থাত্রয় ভোগ না হইলে প্রেমের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না। বিরহ প্রেমকে পরিপাক করে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া যেমন রস রক্তরূপে দেহের অস্থি মজ্জায় কাজ করে, সেইরূপ বিরহ অবস্থায় আমাদের আস্বাদিত প্রেম পরিপাক হইয়া আমাদের প্রাণের পুষ্টিসাধন করে। ইতর ভাষায় বলে "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না," একথা খুব ঠিক। মিলন অবস্থায় আমরা আনন্দে মত্ত হইয়া থাকি। যাহার মিলনে এত আনন্দ—সে বস্তুটী কি, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় না। বিরহ অবস্থায় যখন সে আনন্দের উচ্ছ্বাস আর তেমন হয় না, তখনই সেই আনন্দপ্রদ বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি জানিবার নিমিত্ত হৃদয় অগ্রসর প্রাপ্ত হয়। ইহা অতি মধুর। বিদ্যমান সুখ-সম্ভোগ অপেক্ষা বিগত সুখ সম্ভোগের স্মৃতি অতীব আনন্দপ্রদ। "এই স্থানে, আমার প্রিয়তম আমার চাপল্য হেতু একদিন তিরস্কার করিয়াছিলেন,"———"একদা আমি আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে ভয়কুণ্ঠিত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলাম, প্রিয়তম আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়া কত স্নেহসূচক বাক্যদ্বারা আমার সেই ভাব দূরীকৃত করিয়াছিলেন,"———এই সকল স্মৃতি সুখদায়ক নহে কি? প্রেমীর পক্ষে এই স্মৃতি চিরারাধ্য।

প্রভু যখন অন্তর্ধান হইলেন, এই স্মৃতি সঞ্জীবনী সুধাই তাঁহার আশ্রিতদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

তোমরা নিকটে থাকিলেও আমার, দূরে থাকিলেও আমার। দূর ও নিকট——মায়িক শব্দ।

৮/ পূজার সময় তোমরা ছুটী পাইবে নাকি? যদি পাও এবং সুবিধা হয় একবার আসিতে পার, কিন্তু অনেক খরচান্ত বলিয়া দুই পাঁচ দিবসের নিমিত্ত আসায় বিশেষ ফল নাই। যাহা হউক ব্যস্ত হইও না—ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি দেখা হইবার হয়, অবশ্যই হইবে। আমার দেহ কখনও একটু ভাল, কখনও একটু মন্দ—এইরূপে কাটিতেছে। চিকিৎসাদি ছাড়িয়া দিয়াছি—যেহেতু তাহাতে কোন ফল হয় না। সম্প্রতি মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছি, তাহাতে বরঞ্চ একটু সুবিধা বোধ করিতেছি; তবে অভ্যাস না থাকায় মধ্যে একটু সর্দ্দিভাব হইয়া কয়েকদিন কষ্ট পাইয়াছিলাম, এক্ষণে ভাল আছি জানিবে। এখানকার ও ভবানীপুরস্থ এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তেরা কুশলে আছেন। বিজয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে তোমার বাটীর মঙ্গল জানিবে। ইতি—

চিরহিতার্থী—দেবেন্দ্র।

—০—

প্রার্থনায় বিশ্বাস।

কোন এক দেশে কিছুদিন অনাবৃষ্টি হওয়াতে, সেই দেশের নদ, নদী, সরোবর ও পুষ্করিণী সকল শুকাইতে লাগিল। সূর্য্যের উত্তাপে চারা গাছ এবং তৃণ সকল ঝলশাইয়া যাইতে লাগিল। মাঠ সকল এরূপ শুষ্ক ও কঠিন হইল যে, তাহার উপর লাঙ্গল্ চালান দুঃসাধ্য। বৃষ্টির নিমিত্ত দেশের লোক সকল, চাতকের ন্যায় হাহাকার করিতে লাগিল। দিনের পর দিন একে একে অতিবাহিত হইল, তথাপি কিছুতেই বৃষ্টি না হওয়ায়, সূর্য্যের উত্তাপ দিন দিন প্রখর হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে অন্নকষ্ট হইল, দিনান্তে অনেকেরই অন্ন জুটিল না, অগত্যা লতা, পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মহামারি উপস্থিত হইল; দেশের লোকেরা অন্নকষ্টে ও রোগ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেশটী যেন শ্মশান ভূমি হইয়া উঠিল। সেই দেশের রাজা দুর্ভিক্ষ ও মহামারি নিবারণের নিমিত্ত রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা সংস্থাপন করিয়া, ঔষধ ও অন্ন দানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে বড় বড় পথ, খাল ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিসে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দূর হয়, সেই নিমিত্ত তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুতেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দূর হইল না।

রাজা অবশেষে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, মনুষ্যের শক্তিতে এ দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতে পারেনা। আমি বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ, কিন্তু আমার চেষ্টায় কিছুই হইতেছেনা; এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, বৃষ্টি না হইলে দেশের কিছুতেই শান্তি নাই। কিন্তু দেব আরাধনা ব্যতীত বৃষ্টি হইবার আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, ভগবান নিশ্চয়ই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অতএব আমি আপনাদের সকলকে ও পুরোহিত-দিগকে বলিতেছি, আগামী কল্য আপনারা সকলে মিলিয়া ভগবানের নিকট বৃষ্টির নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। যদি ইহাতেও বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে আমরা এ দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব।

পরদিন অপরাহ্নে দলে দলে লোক সকল প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ময়দানে সমবেত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঠ লোকে লোকারণ্য হইল; এই সময় সেই সভাস্থলে একটী বালক একটী বৃহৎ ছত্র মস্তকে দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, তথাপি তাহাকে ছাতি মাথায় দিতে দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। বালক যখন শুনিয়াছিল, বৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইবে, তখন সে ভাবিয়াছিল, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। পাছে ভিজিতে হয়, সেই নিমিত্ত সে ছাতি লইয়া গিয়াছিল।

গ্রামের লোক সকল ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, একে একে সকলের প্রার্থনা শেষ হইলে, বালকও প্রার্থনা করিল।

প্রার্থনা শ্রবণকারী ঈশ্বর সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সেই মুহূর্ত্তেই বৃষ্টি দান করিলেন। বালক ব্যতীত আর সকলেই ভিজিয়া প্লাবিত হইল। যাহারা বালককে ছত্র আনিতে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল, তাহারা সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিল, তুমিই আমাদের মধ্যে বিশ্বাসী; তোমারই বিশ্বাস বলে অদ্য বৃষ্টি হইয়াছে। হে ঈশ্বর! এই বালকের ন্যায় আমাদিগকেও প্রার্থনায় বিশ্বাসী করুন; এই বলিয়া সকলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

—o—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

শ্রাবণ, সন ১৩১১ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

বৈষ্ণব কবি।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—এই দুই মহাত্মার অপূর্ব্ব পদাবলীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, প্রধানতঃ এই দুই জনকেই আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ লেখনী চালনা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং শ্রোতা বা পাঠক কাহারও ভাল লাগিবে—কি না লাগিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। যেরূপে হোক্, মিষ্ট কোমল করুণ সুরে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া, তাঁহারা ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। অধিকাংশ কবিই যুগলমন্ত্রের উপাসনায়—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। হয় ত তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ শাক্ত বা শক্তির উপাসক ছিলেন; কেহ বা রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; কিন্তু উত্তরজীবনে প্রায় সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-গান কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। এ শ্রেণীর কবিদিগের প্রায় সকলেই, অল্পাধিক পরিমাণে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নিকট ঋণী। ঐ দুই মহাত্মার পুণ্য-প্রভাব,—ভাবের অমৃতলহরী, তাঁহাদের প্রায় সকলের কবিতাতেই পরিস্ফুট হয়। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, যদুনন্দনদাস, প্রেমদাস, প্রেমানন্দদাস, উদ্ধবদাস, রায়শেখর, পরমানন্দ সেন প্রভৃতি বহু পদকর্ত্তা—বিবিধ প্রকারে—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অমৃতময়ী কথার

প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে আমরা তাঁহাদের দুই একটি কবিতার আলোচনা করিয়া, বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ দেখাইব।

গানই তখন সাধকের সম্বল ছিল। ভক্ত, ভাবুক ও কবি—প্রধানতঃ এই সঙ্গীত দ্বারাই আত্মার পুষ্টিসাধন করিতেন। কালে সেই গীতাবলীই সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়াছে।

সঙ্গীতের অসামান্য প্রভাব সকল সময়েই পরিদৃষ্ট হয়। মনে যে দুঃখ ও শোক, হর্ষ বা বিষাদ উদিত হয়, অল্পের মধ্যে, গানে যেমন তাহার প্রতিবিম্ব বিম্বিত হইয়া উঠে, আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না। এই-জন্য প্রায় সকল দেশের সকল ভাষার আদিম অবস্থায় সঙ্গীতের বহুল প্রচলন ছিল। সে গীতি যত অস্পষ্ট, ম্লান বা নিস্তেজ হউক না কেন, তাহাতে আন্তরিকতার অভাব থাকিত না। তারপর সেই গান হইতে কবিতার উদ্ভব হয়। পরে সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে, ভাষার ক্রমবিকাশ ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গদ্য-সাহিত্য তখন মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়।

এক হিসাবে, বৈষ্ণব-সাহিত্যই বাঙ্গলার আদিম সাহিত্য ছিল। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তারাই বঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টা, পুষ্টিকর্ত্তা ও আচার্য্য ছিলেন। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য—সংখ্যায় ও শাখায় এত অধিক যে, তাহার সম্যক আলোচনা দূরের কথা,—এক জীবনে তাহা পড়িয়া উঠাই অসম্ভব। মুখে যিনি যত লম্বা লম্বা কথা কউন, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, অন্ততঃ দশ পনর জন অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী ও শক্তিশালী সাহিত্য-সেবীকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। একাদ্বারা তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। সেই জন্য বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই;—হইবে, সে আশাও নাই।

বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আত্মার উদ্বোধন স্বরূপ যে করুণ-কোমল মঙ্গল গীতিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া ভগবানের নাম গান করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন এবং যাহার ফলে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্র আজ উর্ব্বরা ও শস্যশ্যামলা হইয়া বিদেশীরও স্পৃহনীয় হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এখন দুই এক কথা বলিব।

প্রথমতঃ জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসের রচিত "মাথুর" ও "মুরলী-শিক্ষা"

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি সকল ভাবেরই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ভাব-ভক্তিময় পদমালা এক একটি মণি বিশেষ॥ প্রেমিক জ্ঞানদাসের একটি মাত্র পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কেন গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার তটে, সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোরে॥
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর-চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥
ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরচনা ভাতি,
তার মাঝে পূর্ণিমিক চাঁন্দ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ,
কামিনী জনের মন-ফাঁদ॥
লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়,
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা,
ভুবন-মোহন রূপ ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
শ্রীজ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়,
সে কি সত্যি বোলইতে পারে॥"

জ্ঞানদাসের পর গোবিন্দদাস। এই গোবিন্দদাস যে কত জন আছেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু আমরা এখানে একজন মাত্র গোবিন্দদাসের একটি মাত্র গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-কবির প্রভাব কিরূপ ছিল! ইনি যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের সমসাময়িক সাধক বৈষ্ণব-কবি। ইঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ সাধনসঙ্গীতটি এই,—

"ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে।
মনুষ্য-দুর্লভদেহ, সৎসঙ্গে সেবহ, হরিপদ নিতরে॥

শীত আতপ, বাত বরিখন, এ দিন যামিনী জাগিরে।
বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগিরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, শরণ বন্দন, পাদসেবন দাসী রে।
পূজন সখীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥"

তৃতীয়, **বলরামদাস।** ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একজন পরম ভক্ত। ভগবানের অবতারত্বে ইনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহার সেই গভীর বিশ্বাস কি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিত মনোহারিণী বর্ণনায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে;—

"বিহরে আজু রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জ কেশর মুঞ্জ উজাব কনক-রুচির-কাঁতিয়া।
কোটি কামরূপ ধাম, ভুবনমোহন লাবণী ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥
অসীম পূর্ণিমা-শরত চন্দ, কিরণ মদন বদন-ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুধম, মঞ্জু বসন-পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতহু অমিয়া রাশি,
সুধই সীধুনিকরে নিঝরে, বচন ঐছন ভাতিয়া॥
মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতিপুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া।
আবেশে অবশ অলস ধন্দ, চলত চলত খলত মন্দ,
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উগত লুঠত ভ্রমত, ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহু প্রেম-অমিয়া পিব,
তহি বলরাম বঞ্চিত একলে, সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥"

চতুর্থ,—**যদুনন্দনদাস।** ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি পদ্যানুবাদ গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। সে অনুবাদের কয়েক ছত্র নমুনা দেখুন;—

"ওহে কৃষ্ণ! তোমা না দেখিয়া।
এ রাত্রি দিবস মাঝে, যতক্ষণ বৃক্ষ আছে,
কৈছে আমি গোঁয়াব কাটিয়া॥

কোটি কল্প তুল্য মনে, হৈল মোর এতক্ষণে,
তোমা বিনু নারোঁ গোঁয়াইতে।
হা হা তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণ,
তুমি বল গোঙাই কেমতে॥"

পঞ্চম,—**জগদানন্দ।** ভাগ্যবান জগদানন্দ স্বপ্নযোগে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন,—'দেব-স্বপ্ন মিথ্যা নহে, সত্য।' কথিত আছে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবও, ৺গয়াধামে যাইবার পথে, স্বপ্নযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। ফলতঃ, স্বপ্নে এরূপ দেবদেবী দর্শন বহু পুণ্যফলে হয়। পুণ্যবান্ জগদানন্দ ভক্তগণের প্রণম্য, সন্দেহ নাই। সেই পুণ্যবান্ কবি ভক্তবৎসল ভগবানের যে সকল চারু-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে একখানি ছবি আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম ;—

"সজনি গো! কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য সুধাধার, অঙ্গ ছটা আটা তার,
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মনোমৃগী সেই কালে, পড়িল রূপের জালে,
শুধু দেহ-পিঞ্জর রহিল॥
গর্ব্বকালে মত্ত-হাতী, বাঁধা ছিল দিবা রাতি,
ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি, চারিদিগে যায় ছুটি,
পলাইয়ে গেল কোন দেশে॥
লজ্জাশীল হেমহার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার,
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীধর বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাতে,
সমভূমি করিল আমায়॥
কালিয় ত্রিভঙ্গবাণে, কুলমান হৈল খানে;
ঘুচিল উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ শেষে আছে বাকি, তাহা বুঝি যায় দেখি;
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥" (ক্রমশঃ)

সেবক—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

আর ঘুমে কেন?

—০*০—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

"আত্মদর্শনে যত্নশীল মুমুক্ষু! উঠ, বিষয় ত্যাগ কর। তত্ত্বজ্ঞ গুরু লাভ করিয়া আত্মাকে জান। সেই জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হও। অজ্ঞান নিদ্রা ত্যাগ কর। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারা যেমন দুরাক্রম্য, সেইরূপ উক্তজ্ঞানের পথসমূহকে জ্ঞানীগণ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া থাকেন।"

উপরোক্ত চৈতন্যময়ী মহাবাণী কত অনন্তকাল জীবের কর্ণে প্রবেশ করছে, কত যুগ যুগান্তর হৃদয় কন্দরে স্থান পাচ্ছে, এ মন্ত্রে আমাদের মন প্রাণ জেগেও জাগছে না কেন? এই জ্ঞানগর্ভ বেদ-গান শ্রবণে কত প্রাণ অমৃতের অধিকারী হয়ে মহাপ্রাণ হয়েছেন,—যেন প্রাণমন আকুলকারী মুরলীতান শ্রবণে সকল ভুলে অমর নিত্য বৃন্দাবনে বাস করছেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ আমরা শুনেও শুনিনা—জেগেও জাগিনা। আমাদের হৃদয়ে ভগবান কি এমন কিছুই দেন নি, যে এই অমিয় অমৃতগান হৃদয়ে লেগে এই অসার সংসার ভুলাইয়ে দেয়, আর চিরতরে মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে সেই অভয় চরণে শরণ লই, অভাব দূরে যায়, জ্বালা জুড়ায়, তাপ শান্তি হয়, শোক তাপ চিরজন্মের মত ভুলে গিয়ে শ্রীহরির চরণ সেবার অধিকারী হই? কবেরে অবোধ মন! তুমি জাগিবে, কবে মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে—কবে আঁধারে পড়ে এ ধূলামাথা ঘুচে যাবে? ধিক্ জন্ম আমাদের, যে একদিনের তরে কমলাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নাম গানে নয়নে অশ্রু আসিল না। বৈষ্ণবভক্ত আমাদের দুর্দ্দশা দেখে কত দুঃখে বলেছেন:—

"কৃষ্ণ বলিতে যার নয়নে ঝরেনাক বারি।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মানব জনম তাহারি॥"

অবোধ মন! জাগো! আর ঘুমে অচেতন থেকনা, ঐ দেখ চৈতন্যময়, মোহশয্যার অদূরে বিবেক দিনমণি প্রস্ফুটিত করে নিদ্রা ভাঙ্গাতে দাঁড়াইয়ে রয়েছেন, আর বলছেন—"জীব! উঠ, আর ঘুমায়োনা। অজপা ফুরালো, গণা দিন ক্রমে কমে আসতে লাগলো—এই দিনমণির নবীন কিরণে মূঢ় মনকে স্নাত করে লও, অভয় কোল প্রস্তুত—চিরদিনের ঘুম ভাঙ্গায়ে জ্ঞানরাজ্যের অধিকারী করবে—আর মোহনিদ্রায় অভিভূত হয়ে ডাক শুনে "যাই" "যাই" বলে কাতরতা প্রকাশ করতে হবে না।" এ প্রাণময়ী বাণী যে প্রতিদিনই যেন অধম অলস মন শুনছে, আবার ভুলে যাচ্ছে। নিত্য প্রাতে, জগতের আলোক

দিনমণি উদয়কালে, প্রাণের হরি দয়াল আমার কি কাণে কাণে বলে যান না :—

"প্রভাত হ'ল যেরে
আর মোহ নিদ্রা ঘোরে কেন বল ॥
শোভে, হরি চরণারুণ, মেলনা (আর কেন মেলনা)।
(ও ভোলা মন মেলনা) নয়ন শতদল ॥
এ জীবন শিশির বিন্দু কতকাল আর থাকবে বল,
সুমেরি আশা নিলে, শুকাইলে কিবা ফল;
(ভোলা মন মনরে) হেসে জীবন্মুক্ত এবার হ'না!
জীবন শিশির কণা, হরিচরণ (ও ভোলা মন)
হরি চরণারুণে ধরবি চল ॥
মন তুমি দেখবে ভাল, রাগে রাঙ্গা জীবন জল,
হাসিবে প্রেমের হাসি জ্বলিবে সুবিমল;
(ভোলা মনরে) কণকমণির চিন্তা দূরে দেনা,
জীবন মণি করে নেনা, কাষ্ঠ সোণা,—
(জাননা মন কাষ্ঠ সোনা) (ও ভোলা মন কাষ্ঠ সোনা)
করেছে ঐ পদতল ॥"

এই মধুর ডাক দিশানিশি আমরা শুনছি—প্রাণের মাঝে প্রবেশ করছে, কিন্তু মন যে নিদ্রাভিভূত সেই নিদ্রাভিভূত। প্রাতে বিহগ গান করে কত সত্য প্রকাশ করে—বলে "আঁধার গেল আলোকখনি দিনমণি উদয় হচ্ছেন—অন্ধকার একেবারে নিঃশেষিত হবে—"হরিবোল" "হরিবোল" বলে শয্যা ত্যাগ কর, আলস্য ছাড়ো, নবকিরণে জীবন উত্তেজিত কর, প্রভুত বললাভে সমস্ত দিনের জীবন যাপনের পাথের সঞ্চয় কর।" আবার সন্ধ্যা হতে না হতে আঁধার আগমন, পুনরায় বিহগ গান গাহিতে গাহিতে নশ্বরতার পরিচয় দিচ্ছে, নিত্য নিত্য বলছে "আঁধার এলো, প্রস্তুত হও, সারা দিনটা ধূলা খেলা করে কাটাইয়ে দিলে, পাথেয় কি সঞ্চয় করলে?"—কিন্তু মন সেই মোহানল সাগরে নিমগ্ন, যে মোহ নিদ্রায় অভিভূত সেই নিদ্রায় অভিভূত। সমগ্র দিন ধরে কত না জাগিবার উত্তেজনা জানাইরে দিচ্ছেন তা বলতে পারিনা। প্রভু দয়াল দিবানিশি কত রকমে পরিচয় দিচ্ছেন তা বলতে পারি না—বিটপী লতায়, জলদের গায়, শশিতারকায় তপনে নিজের দয়াল নামটী যেন লিখে রেখেছেন।

আমরা দেখবোনা শুনবোনা সাধের ঘুমঘোরে একেবারে ডুবে থাকবো। কেবল নয়নে বসন বেঁধে নীরবে বসে কাঁদ্‌তে থাক্‌বো এই বলে "আমি দেখি নাই, কিছু বুঝি নাই, কিছু (মোরে) দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।" এত ঘুমঘোরের মাঝেও ভগবান জাগাতে প্রস্তুত। এমন দয়া তাঁর মানবসন্তানে—যে এই ভীষণ কালনিদ্রায়ও এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, যাতে আমরা জেগে উঠি। সেটী হচ্ছে এই মোহনিদ্রার মাঝে স্বপ্ন। এই স্বপ্নে বিবেক যেন এক একবার উঁকি ঝুঁকি মারে, বলে দেয়—"এই আমি" "এই আমি।" এই স্বপ্নে প্রকৃতই জাগরণের ভাব দেখা দেয়। এই মোহ নিদ্রায় অবশ হয়ে থাকি, কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষণেকের তরে যে তাঁর কথা মনে পড়ে, ক্ষণেকের তরে যে অনুতাপ আসে, ক্ষণেকের তরে যে বোধ আসে "আর কতদিন এখানে থাকবো—দিন তো ফুরায়ে এলো" একটী হ'ল স্বপ্ন। একান্ত ঘুমঘোর মাঝে এই মধুর স্বপ্ন যাহা প্রকৃত জাগরণ তিনি দয়া করে আমাদের দেন—তাই তাঁর দিকে দিনান্তেও একবার ফিরিবার অবসর পাই। এই স্বপ্ন যত বেশী হয় ততই আমাদের মঙ্গল, ঘুমের কাল কমে আসে, স্বপ্ন বাড়লে এই স্বপ্ন অবশেষে "সমাধিতে" পরিণত করে। যত বেশী আমাদের মন সমস্তদিন ধরে তাঁর দিকে তাকাইয়ে থাকবে ততই ঘুম কাটবে—মোহালস টুটবে, তাঁর মুখপানে তাকাতে অবসর হবে। দয়াল হরি দয়া করে কত শিখাচ্ছেন, কেবলই "আয়" "আয়" করে পারে দাঁড়াইয়ে বলছেন "আয়" পাপী আয়"—আমরা মোহ নিদ্রালস নয়নে পথের ধুলায় অন্ধ হয়ে বলি আমাদের পারের খেয়া বন্ধ। এই যে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক শুন্‌তে পাই এ ডাক যদি একবার প্রাণে বসে যায়, আর হতাশ প্রাণে বলতে হয়না—"তোমায় বুঝলাম না, তোমার সকলি আশ্চর্য্য, তুমি অতি দুলভ।" বাসনার বশে অবশ হয়ে ক্লিষ্ট প্রাণে তাঁকে অতি দূরে মনে করি—ও মোহ বাড়াই। তিনি সদাই যে নিকটে। তিনি কত বড় আর কত ছোট—কে বল্‌তে পারে? তিনি "অনোরনীয়ান মহতো মহীয়ান"। সামান্য বুদ্ধির অগম্য। তাই দয়াময় জীবের কাছে জীব-বুদ্ধিগম্য ভাবদ্বারা তাঁকে বুঝান। কিন্তু আমরা এত ডুবে গেছি, এত মোহ নিদ্রায় অভিভূত যে, সে সরল ভাবটীও ধরতে পারি না। বাসনা আমাদের চক্ষে ছানি ফেলিয়াছে, যেন জন্মান্ধ করে রেখেছে। 'এই যে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক কাণে ও প্রাণে বেজে উঠে, একদিন না একদিন লেগে যাবে, আর

তা কদর্য্য, এথানকার সুন্দর তথন কুৎসিৎ। এখন বাহিরে আনন্দ, তথন ভিতরে—যেখানে সদানন্দ প্রেমানন্দে বিরাজ করেন। তথন বাহিরে আঁধার, ভিতরে জ্যোতিঃ—বিমল জ্যোতিঃ—এথানকার এক সূর্য্য চন্দ্র তথন ভিতরের কত শত সূর্য্যচন্দ্র হয়ে অনন্ত জ্যোতিঃ বিস্ফারিত করছে—তথন বোধ আসবে "যেন সূর্য্যাস্তপতি তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাসনা জড়িত হয়ে পড়ি, সেই বাসনা যে ছাড়তে চাহে না, তাই দয়াময়ের এই মাঝে মাঝের ডাক শুনে বৈরাগ্য সাধনা করতে হবে, বাসনা কাট্‌বে ও দিবানিশি মন প্রাণ তাঁর ধ্যান ধারণায় অনুরক্ত থাকবে। আমরা তাঁর মানব সন্তান, আমরাই তাঁর চরণের অধিকারী ;—বঞ্চিত হব না,—তাঁর অভয়চরণ জীবনে না হয় মরণেও পাবো। আমরা যদি অন্য কোন বাসনা না করে কেবল তাঁরই অভিলাষ করি, নিশ্চয়ই অন্য কামনা সব দূরে যাবে ও জীবন্মুক্তির উপায় হবে। এ মোহনিদ্রা ভেঙ্গে যাবে, পাতক-রজনী পোহাবে, জ্ঞান-দিনমণি উদয় হবে, এ আলোকে আঁধার-পথ আলোকে পূর্ণ হবে, তাঁর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার উপায় হবে। নিয়ত তাঁর ধারণা ও চিন্তা অভ্যাস করতে হবে, শয়নে স্বপনেও ভুললে হবে না ; উর্দ্ধে দৃষ্টি রেখে এথানকার কাজ কামনাশূন্য হয়ে করতে হবে। ভক্ত বলেন—"তুমি অন্য সকল অভিলাষ ত্যাগ কর। লৌকিক কর্ম্ম করিতে হয় করিও, কিন্তু সচ্চিদানন্দ তৃপ্তির জন্য করিও। উপাসনা, আত্মসংস্থযোগ, ভক্তিযোগ, সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন কর। ধ্যানযোগ গীতা'র সাধনা। যেমন ভক্তিযোগ আত্মসংস্থ হইবার জন্য, সেইরূপ সাংখ্যযোগ ধ্যান জন্য। ধ্যানযোগে সমাধি অবস্থায় একান্ত থাকিতে না পার, সাংখ্যযোগে নিম্নভূমিকায় আইস। সাংখ্যযোগ বিচার দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বোধ কর। সাংখ্যযোগেও যখন "প্রকৃতেভিন্নমাত্মানম্" বিচার না আসিবে তথন ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। এই ভক্তিযোগ কেবল আত্মসংস্থ যোগ দৃঢ় করিবার জন্য। মানস পূজা ভক্তিযোগের শেষ কথা। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তার বিশ্বরূপ চিন্তা কর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণীর মায়ামানুষ মূর্ত্তি ধ্যান কর, অর্দ্ধ নারীশ্বরের কথা গান কর. গুণ স্মরণ কর, রূপ ধ্যান কর, ভগবানের যে রূপ তোমার প্রাণে লাগিয়াছে তাহারই ধারণা ধ্যান করিতে থাক : যদি দেখিতে পাও অন্যরূপেও তোমার প্রীতি, তুমি সেই ক্ষেত্রে পরম ভাব লক্ষ্য করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লও। প্রিয় সম্ভাষণে যাহা যাহা আবশ্যক—সুন্দর পুষ্পশয্যা, সুন্দর

রত্নকল্পিত আসন, স্নানার্থে জল, পরিধান জন্য দিব্যাম্বর, পূজার জন্য চন্দন, মৃগমদ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ভোজন, নৃত্য, গীত—এই সমস্ত মনে মনে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে অপেক্ষা কর, আর অনুভব কর যে "তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারিনা"—এই ভাবনা করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়, কখন বা ভাবনা কর,—"যখন তুমি আসিবে তখন আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? কিরূপ ভাবে তোমার সেবা করিব? কখন বা অভিমান করিব—"এত দেরী করিয়া আসিলেন কেন?" "তুমি ভিন্ন আমার যে কেহ নাই।" এই সমস্ত অভ্যাস করিতে হইবে। এই ভক্তিযোগও যখন না পাব, তখন আত্মসংস্থ হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা প্রাণবায়ু লইয়া চক্রে চক্রে মনোযোগের সহিত ভ্রমণ করিতে থাক, শেষে আর উঠিতে নামিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন মন আজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া জ্যোতিঃ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবে, মন আর কিছুই চিন্তা করিবেনা। "মনোনিবৃত্তি" হইবে, "পরম শান্তি" তুমি প্রাপ্ত হইবে, আবার আত্মসংস্থ হইয়া যাইবে। গীতা বলিতেছেন "শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থ মনকৃত্বা কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥" যোগের বহিরঙ্গ সাধন দ্বারাও মন যদি কখন কখন বিষয়ে ভ্রমণ করে "যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং," তখনই ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাকে আবার আত্মসংস্থ কর, তোমার সমাধি লাগিবে।

অতি সুন্দর ভাষায়—অগ্রসর হবার সুন্দর উপদেশ। এ উপদেশ সাধ্যানুসারে স্ব স্ব প্রকৃতিমত পালন ও অভ্যাস না করিলে এতদিনের এ জমাট্ ঘুম ভাঙ্গিবে না। নেশা ছাড়িবেনা। এই নিদ্রা ভাঙ্গলে আত্মজ্ঞান আসবে। চৈতন্য লাভ হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হব। সকলের উপর যে একজন "আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়" আছেন—তা বুঝতে চেষ্টা করবো, ও তাঁকেই প্রাণের-কথা মনের-ব্যথা বিরলে জানাবো, আর কারুকে বলবোনা—এই ব্রত নিতে হবে। আশায় বুক বেঁধে তাঁতেই আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভর করতে হবে, কারণ এই মোহঘোরের একমাত্র উদ্ধারকর্তা তিনি। দিবানিশি তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে মানবজন্ম যেন কৃতার্থ করি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র।*

সুগভীব, চিত্তস্থির, ধীব মহাজন।
কেবা তুমি, কি রতন, বুঝে কোন জন!
বিদ্যা বুদ্ধি ভক্তি বলে,
জয়ী তুমি ভূমণ্ডলে,
তব সম নাহি আর—একা অতুলন।
সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত সুজন॥

—০—

"নাট্যগুরু" "নাট্যরথী" "নাট্যাচার্য্য" খ্যাতি,
ইহাতেও নহে ব্যক্ত তোমার সুখ্যাতি॥
চরিত্র চিত্রণ তব,
সবগুলি অভিনব,
শতেক নাটক তব রচিত নূতন।
ধন্য তুমি হে ধীমান ভারতভূষণ॥

—০—

তব অভিনীত দৃশ্য দেখেছে যে জন।
সেই সে পেয়েছে এক নবীন জীবন॥
চির আঁকা হৃদে তার,
নহে কভু ভুলিবার,
শয়নে স্বপনে স্মরে মূরতি-মোহন।
অভিনয়ে হয় সত্য স্বরূপ দর্শন॥

—০—

ধর্ম্মের বিপুল জ্ঞান, অটুট বিশ্বাস।
মূর্ত্তিমান ভাবে দেখি তোমাতে প্রকাশ॥
গুরুপদে নিষ্ঠা রতি,
শ্রীইষ্ট—গুরু মূরতি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গুরু-শ্রেষ্ঠ নয়।
আজীবন দেছ এই সত্য পরিচয়॥

* স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সম্মান উদ্দেশ্যে পটলডাঙ্গা ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক্ এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক বিজ্ঞপ্তি।

ভুলিবনা কভু তোমা, কে ভুলিতে পারে!
মাহাত্ম্য—গৌরব-তাজ, শোভে তব শিরে॥
তদুপরি স্বর্ণ-লেখা,
রয়েছে উজ্জ্বল আঁকা,
গুরু-ইষ্ট মধুমিষ্ট "রামকৃষ্ণ" নাম।
গিরিশ! গিরিশ তুমি, লওহে প্রণাম॥

—:•:—

নামামৃত।

কোথায় তুমি মরা মন? নব বর্ষার ঝিমি ঝিমি ধারায় বসুধা সিক্ত, শুষ্ক তৃণ সকল গজাইয়া উঠিল, প্রত্যেক নর নারীর তাপক্লিষ্ট মরা মন আজ 'জয় ব্রহ্ম' নামে গজাইয়া উঠ। নামামৃতে অমর হও। শোকে দুঃখে মরিবে কেন?

"সুখ" নামটি শুনিয়াছি, নামটী শ্রুতিমধুর, প্রাণ নৃত্যকারী আকাঙ্খার জিনিস বটে, কিন্তু ঐ সুখের ধাম কোথা? রসনার দ্বারা নামামৃত পথে যাইতে যাইতে, অন্তরের মাঝে এক আনন্দ-মন্দির হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত, তথায় সেই সুখময়কে দর্শন হয়।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কুটস্থে মিলন, সুখময়কে পাওয়া যায়, যে সুখের কথা রটিত আছে উহা সাধনে লাভ করিতে হয়। যথায়ে—

"জেনেও নাহিক জ্ঞান, শুনেও নাহিক শুন,
মেনেও নাহিক মান, হায়রে এ ব্যাধি কেমন?"

সুখ সেই অনন্ত অক্ষয় নিত্য-নব সেই অন্তরতম আসল ধনে, আর সকলই যে নকল, সুখের আচ্ছাদন মাত্র। এ আবরণ না ঘুচিলে রমণীয় পরমাত্মাকে পাইবার নয়।

সাধন ছাড়াইয়া সিদ্ধি কোথা? মরা মন নামামৃতে জীবিত হও, জগতবাসী সকলে মিলিয়া কোটী কণ্ঠে কীর্ত্তন কর, গগণ মেদিনী পূর্ণ করিয়া দয়াল নাম গান কর, তাপহারী হৃদয়ে উদয় হবেন। কলিযুগে নাম সাধনাই বিশেষ বিধি। অল্পআয়ু দুর্ব্বলদের জন্য গৌর-গুণনিধি

"হরি নাম" এনেছেন। গোলোক থেকে ভূলোকে নামামৃত এসেছে। সেই পুরাকালের কঠোর বিধি ব্যবস্থার—কঠোর তপস্যার ধন নামে পাবে।

"মন মজায়ে, প্রাণ ফাটায়ে, বল, বল, হরি বল।
ওরে বল্‌রে হরি বল্‌
বলার মত বল্‌লে পরে চোকে আসে জল।
কঠোর সাধন পার্‌বিনা সব বল্‌রে হরি বল,
না বল্‌তেও পারিস যদি শুন্‌লে আছে ফল।"

এমন সুযোগযুগে জীবন যাত্রায় অহর্নিশি শ্রীগুরুমুখ নিঃসৃত নামামৃতে ডুবে থাকো। গুণমণি শ্রীরামকৃষ্ণ আমার, বোলে গেলেন কি? "ওরে তোরা না পারিস ত আমায় ভার দে"। ওরে এমন দয়াল কোথায় পাবি? প্রেমার্ণব শ্রীচৈতন্যদেব ঘরে ঘরে নাম বিলাইয়া গিয়াছেন।

আহা কি দয়া! রক্তে বক্ষ ভাসিতেছে, নিত্যানন্দ দু হাত তুলে নাম বিলাইতেছেন। মুখে কি মধুর বোল—

"মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিবনা।"

মহাপাপী জগাই মাধাই তরে গেল। তাই বলি, সাধু মহাত্মার সহিত বিবাদেও ফল আছে, দুর্জ্জনের সহিত বন্ধুত্বও ঘৃণ্য।

নামামৃতে শুষ্ক হৃদয় সরস হবে, ভব ব্যাধির উপশম হবে।

"কাজ কি তোমার কঠোর সাধন,
নামামৃতে হও নিমগন।"

এই কলিযুগের প্রেমার্ণবদিগের দয়ায় কত পাপী তাপী তরে গেল। কোন কষ্ট নাই, কীর্ত্তন দেখিলেই মন মোহিত হয়, নাম সাধনে অনন্ত আরাম, তবুও নর নারী বৃথা কথায় মত্ত থাকে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের মত কঠোর তপস্যা নাই, এক কীর্ত্তনে ও শ্রবণেই সে ধন লাভ। নূতন যুগের নূতন বিধি।—

"নূতন যুগের নূতন বঁধুর
আগাগোড়া শুধুই মধুর
(ও সেই) পুরাকালের অম্ল মধুর একটু ঝাঁঝাল।"

শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, নাম বিলাইয়া নাচিয়া গিয়াছেন। পাপী, তাপী তরাইয়াছেন। নামামৃত লাভ করিয়া প্রত্যেক নর নারী ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত কর।

"হরিনাম কল্পতরু প্রায়
হরি নামের গুণে, ভক্ত জনে, যা চায় তাই পায়।"

মন মজায়ে প্রাণ ফাটায়ে বলার মত বলিতে হইবে।

এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া করিলাম কি? করিতেছি কি? হরি হে, তোমার নামে রসনা মেতে থাকুক। হরিকথা ব্যতীত যাবতীয় কথাই মিথ্যাকথা। হা মিথ্যাবাদী নর নারী, হরি ছাড়া কথা ভুলিতে চেষ্টা কর। মনরে যে কথায় হরিনাম গন্ধ নাই, সে কথা কহিও না। এই অনিত্য সংসারে কতশত নর নারী ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে, বুঝিতেছে ও মুখে বলিয়াও থাকে—অনিত্য সংসার। তবুও মত্ত কেন? এ সম্বন্ধে একটী সঙ্গীত মনে পড়ে।—

"সংসার অনিত্য ইহা মুখে বল প্রতিক্ষণ,
কিন্তু একটী তৃণ লাগি কর তুমি প্রাণপণ।"

সংসার অনিত্য, অস্থায়ী, মুখে বলিয়া থাকি বটে—কিন্তু একটা কুটার জন্য মরি। ইহাই মায়াচ্ছন্ন মূঢ় জীবের মত্ততা। সংসারের মোহিনী শক্তির ঠিক চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ।

"মরিলে গৃহ মার্জ্জার, রোদন কর অপার
কিন্তু বল বারম্বার—কাকস্য পরিবেদন।"

একটী বিড়াল মরিলে কাঁদিয়া ভাসাও, কিন্তু মুখে বলিতেছ ও জান, কে কার, কিছুই কিছুনা। বদ্ধজীবের কি ভীষণ অবস্থা। হাত পা বেঁধে পুড়ে মরা।

"লোক শিক্ষা দিতে হও জ্ঞানী
কিন্তু না বোঝ আপনি।"

অন্যে বোঝাইতে তৎপর, কিন্তু নিজে বুঝিতে অক্ষম। কিরূপ কঠিন সমস্যায় জীবন প্রবাহিত।

মনরে, শেষের কথাই খাঁটী কথা। তোমার দম্ভ গেলনা। তোমার মুক্তি কোথা? শত থাবড়ায় কেউটে বশ। মনরে, তোমায় কেবল থাবড়া। যেদিকে ছুটিবে—অমনি থাবড়া।

মনের চিকিৎসক এক "সৎগুরু" সাধু মহাত্মাগণ। সাধু ও ভক্তের পদারবৃন্দের ধূলি খাইয়া খাইয়া যদি তোমার মনের দম্ভ-ঘুচিয়া কিছু শক্তি হয়।

মন একটী কেউটে সদৃশ, সাধুর পদের ধূলাপড়া দিয়া, শত থাবড়ায়, তবে যদি কেউটে বশ হয়। তারপর নাম দাও, চির সুন্দর—চির নূতন—চির প্রাণসখার অন্বেষণেই প্রমত্ত হউক। মনের আকুলি ব্যাকুলি নিবারণ করিতে শ্রীভগবান। মধু না পেলে মনমক্ষিকা চুপ করিবে না। নাছোড়বন্দা ভিখারী, না নিয়ে যায় না,—ঐকান্তিকতা চাই।

নরনারী, একবার ভাব—দিন যায়, যেতে হবে। ভাবার মত ভাব, ডাকার মত ডাক, মজার মত মজ। স্থিরচিত্তে ভাবিতে বসিলে বেশ বোঝা যায়, এই যে সাংসারিক বিপদ বিড়ম্বনা—এগুলি শ্রীভগবানের প্রকৃত আহ্বান। দুর্দ্দিনে অতি পাষণ্ডকেও "হা ভগবান" বলিয়া কাঁদিতে দেখা যায়। তুমি স্নেহপুত্তলী পুত্র লইয়া মত্ত, শ্রীভগবানকে উপাসনায় পুত্রের শুভাশুভ কামনা পূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে। হায় মন! সেই কৃষ্ণধন অপেক্ষা কি এই নশ্বর দেহধারী পুত্র তোমার প্রিয়? তোমার প্রিয় পুত্র যে মরিবে? তখন বুক চাপড়ে—মুখ চাপড়ে—ধরায় পড়িয়া কাঁদিবে। তাই বলি, সে অসার কান্না ভাগ্যে যদি হয়,—পরে। হইতে না হইতে এখন শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগী হইয়া কাঁদ।

কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচে মত্ত হইও না, পুত্র হতে হয়ত কাঁদিয়া মরিবে। সেই বিমল হেম অদ্বিতীয় ব্রহ্মসুন্দর, অতুলন গুণসিন্ধু অনন্ত সুন্দরের অনন্ত নাম, অনন্ত ভাব। যে নামে হউক প্রাণ ভরিয়া ডাক।

সংসারের প্রত্যেক নর তোমার পুত্র, নারী তোমার সঙ্গিনী, সেই অতুল্য প্রেমময় অদ্বিতীয় পুরুষপ্রধান নারায়ণই তোমার পতি। মন, এইরূপ সংসারী হও। হায় বনবাসিনী! পতির সহিত কত দিনে মিলিবে? কি গুণে তাঁকে তুষ্ট করিবে? শেষে কি ত্যাজ্যা হইবে? আবার এ সংসার বনবাসে জ্বলিতে আসিবে? হিংস্র মানব-জন্তু বিশিষ্ট এই বিপদসঙ্কুল প্রবাসে?

নামামৃতে জীবিতা ও শক্তিবিশিষ্টা হইয়া যদি ভালবাসিয়া থাক, তবে গুণসিন্ধু পতি পদে স্থান দিবেন, আশা করিতে পার।

যদিও নিজ কর্ম্মফলে এ সংসারে আসিয়াছ, তবুও দয়াল রাজার কি বিধি ব্যবস্থা দেখ—তোমরা জন্য গঙ্গাভরা জল, দশদিশি ভরা বায়ু, ক্ষেত্র ভরা শস্য, আকাশ ভরা নীলিমা, দিনভরা সূর্য্যালোক, নিশিভরা নিঝুমতা, চক্ষুভরা শ্রীগুরুমূর্ত্তি—সাধুমূর্ত্তি—দেবদেবীর মূর্ত্তি, আর বুকভরা গুপ্তভাবে পরমাত্মা সেই পুরুষোত্তম, খুঁজিতে জানিলেই পাইবে। তোমার বৃথা ধন জন তোমার কাল সর্প হউক, ভয় পাইয়া পালাও। ফুলের মালা দেখিও না, গলায় পরিও না!—

কাল সর্পের মূর্ত্তি বলিয়া দেখ। বিশ্বই তোমার সংসার দেখ, বিশ্ববাসী অমৃত সন্তানের কল্যাণ কামনা কর, অমৃত সঙ্গিনীর স্থায়ী সুখ প্রার্থনা কর, আর এই বনবাসে যে কদিন থাক, সেই রাজরাজেশ্বরের পায়ে পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ডাক। এই মধুরতর বরষা রজনীতে বিমল কৌমুদী প্লাবিত নিঝুম সংসারের কোণ্ হইতে সেই আনন্দধামের অধীশ্বর হৃদয়েশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাক—

"বঁধুহে, প্রিয় হে, তুমিহে, সকল হিয়ায় বিধুসার,
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের সুধু, সকলি তোমার।"

প্রাণসখা! তুমি কি শুনতে পেলে? কি কণ্ঠে তোমায় ডাকতে হয়, আমায় শিখায়ে দাও, তোমার সন্তান—তোমার দাস-দাসীদের শিখায়ে দাও। তোমার পবিত্র নামে পাপ তাপ ভবব্যাধি বিদূরিত হউক।

মন! নিঝুমে ভাব নাম, শয়নে স্মর নাম, গমনে বল নাম, কীর্ত্তনে গাহ নাম, রোদনে ডাক নাম, নামের মালা গাঁথ।

"নিবে গেলে জীবন আলো শেষের সেদিন এলে পরে,
তুমি নাম-মালাতে জড়িয়ে নেবে, সেই নটবর শ্যামসুন্দরে।
দেখ্‌বে তখন, ভব-নাবিক দাঁড়িয়ে আছেন পারের তরে।"

চাতক পক্ষী—ডেকে মেঘের জল আনে, আবার ভেকও ডেকে জল আনে। চাতক প্রেমিক নিষ্ঠাবান, সেই জলই খাইয়া জীবন ধারণ করে। ভেক ডাকিতে জানে, জলও আনে, বসুধা সিক্ত হয়, জলাশয় পূর্ণ হয়, শস্য উৎপন্ন হয়, তার নিজের কাজ না সাধিতে পারিলেও ডাকে সুফল ফলে। সাধুর নিকট, ভক্তের নিকট, ভগবানের আদর। অধম ডেকে আনিতে চেষ্টা করিলে শেষে সুফল ফলিবে। ভেক জন্তু, সে জ্ঞানী হইতে অক্ষম। মানব ভেক—হরিকে ডাকিলে, সেকি আর ভেক থাকিবে। তখন জীবত্ব ঘুচাইয়া শিবত্বলাভ করিতে পারিবে। সে শক্তি শ্রীভগবান দিয়াছেন। কোটী কণ্ঠে নরনারী কীর্ত্তন কর।

"আশ্রিত আনন্দধাম,
প্রেমময় প্রাণ আরাম,
বল জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল আলয়।"

ভক্তকিঙ্করী—"বনবুলবুল" রচয়িত্রী।

সাধক রসিকলাল।

—০-*-০—

আজ বেশীদিনের কথা নয়, প্রায় ছয় বৎসর হইল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তঃপাতী রায়গ্রাম নামক গ্রামের ক্ষুদ্র-বক্ষে একজন ভক্তি-প্রাণ সাধকের তিরোভাব ঘটিয়াছে। জগতের কেহ তাঁহার জন্য বিন্দুমাত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করে নাই সত্য, কিম্বা কেহ তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষার্থে যত্নবান হয় নাই সত্য; কিন্তু তিনি যে অদৃশ্য স্মৃতি-চিহ্ন বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রশান্ত মহাসাগরের শত তরঙ্গ বিক্ষেপে বিধৌত হইবে না, অথবা কালের তীব্র কশাঘাতে ম্রিয়মান হইবে না। স্বর্ণ যেমন উত্তপ্ত অনলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার স্মৃতির উপর দিয়া যতই কালের তীব্রানল প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে, ততই তাহা নবীন হইতে নবীনতর হইবে।

সাধক রায় রসিকলাল চক্রবর্ত্তী গুণাকর কেবল একজন মহাকবি ছিলেন না, অথবা কেবল একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন না; পরন্তু একজন ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন। লৌকিক যশাকাঙ্ক্ষায় তিনি এ অনন্য সাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই, কিম্বা আপনার স্মৃতি-চিহ্ন অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি এবম্বিধ ত্যাগ স্বীকার করেন নাই; পরন্তু সারাজীবন ব্রত, উপবাসাবলম্বনপূর্ব্বক তিনি যে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-মকরন্দ পান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ প্রতিনয়ত স্বদেশবাসীকে দেখাইবার জন্য।

সন ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসের একদিন পুণ্য মুহূর্ত্তে রায়গ্রামের চক্রবর্ত্তী বংশে রায় রসিকলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখনও কেহ বিন্দুমাত্র অনুমান করিতে পারে নাই যে, এই বালক একদিন কৃষ্ণ-প্রেম বিলাইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেম-প্লাবিত করিবে, এবং ইহার সঙ্গীত সুধা পান করিয়া বঙ্গবাসী ভাবে মাতোয়ারা হইবে। যেমন সাধারণ গ্রাম্য বালকের হইয়া থাকে, তেমনি ভাবে রসিকলালের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় আরব্ধ ও সমাপ্ত হয়। তৎপর তিনি অভিভাবকগণের আদেশে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই কাব্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন সময় হইতে তাঁহার চিত্ত-বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন, এ

সংসারে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলানুযায়ী ফল ভোগ করিবে এবং পূর্ব্বজন্মের অন্ত মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া যে, যে বিষয় চিন্তা করে, সে পরজন্মে আসিয়া সেই অভিপ্রেত বিষয় প্রাপ্ত হয়। সাধক রসিকলাল সম্ভবতঃ পূর্ব্বজন্মে এই ভাবিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন,—আমি পরজন্মে কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতে পারি। তাই এতদিনে তাঁহার চিত্ত-বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কাব্যগ্রন্থ ত্যাগ করিয়া ভাগবত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং এই ভাগবত অধ্যয়ন হইতেই তাঁহার চিত্তস্থিত কৃষ্ণ-প্রেম ক্রমশঃ বিকশিত হইতে লাগিল।

হৃদয়ে ভাবের প্রাবল্য আসিলে কে কতক্ষণ নীরব হইয়া থাকিতে পারে? ভাবের প্রকৃত বিকাশ হইল—ভগবৎ-সঙ্গীতে। তাই দেখিতে পাই সাধক মাত্রেই সঙ্গীতামোদী। ভগবান বিষ্ণুও তাইতে বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

ভাগবত অধ্যয়ন করিতে করিতে সাধক রসিকলালের হৃদয়ে যেই ভাবের স্রোত প্রবল হইল, অমনি তিনি গান ধরিলেন, তাঁহার সেই প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাসের সে মনোপ্রাণহারীণী সঙ্গীত লহরী যিনিই শ্রবণ করিলেন, তিনিই বুঝিলেন—রসিক হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের সমাবেশ হইয়াছে। বাহ্যিকবেশ ভূষার সহিত অন্তরের প্রবৃত্তির বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যাহার অন্তরের যেরূপ প্রবৃত্তি তাহার বাহ্যিক বেশভূষায়ও তাহা পরিস্ফুট। রসিকলাল আজ কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা—তাঁহার কৃষ্ণ ধ্যান—কৃষ্ণ জ্ঞান—কৃষ্ণই জীবনের ধ্রুবতারা। তাই তিনি গৈরিক-বসন পরিধান করিলেন—গলে মালা ধারণ করিলেন—হস্তে কৃষ্ণ-নাম জপ করিবার জন্য মালা লইলেন,—রসিকলাল আজ কৃষ্ণ-প্রেমের কাঙ্গাল সাজিলেন।

পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন তাঁহার এবম্বিধ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু রসিকের প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেম তাঁহাদের বিস্ময়ের ও বিষাদের মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিল, তাঁহারা বুঝিলেন, বর্ষার প্রবল প্লাবন রোধ করিবার চেষ্টা বৃথা।

রসাল বৃক্ষে রসালই উৎপন্ন হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্র ভিন্ন উষর ভূমিতে কখনও সুফলপ্রদ শস্য উৎপন্ন হয় না। রসিকলাল রাতদিন "কোথা কৃষ্ণ, জীবন কৃষ্ণ, একবার দেখা দে না ভাই"—এই গানে মাতোয়ারা থাকেন ভুলিয়া,

তাঁহার জননী হর্ষ-গদগদ চিত্তে বলিলেন, মানুষে যেমন মেষগুলিকে মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আমিও তেমনি আমার "র'স্‌কে খ্যাপাকে" কৃষ্ণ নামে উৎসর্গ করিয়া দিলাম।

এই ভাবে কৃষ্ণনাম নিশিদিন জপ করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর কাটাইবার পর রসিকলাল দেখিলেন, এমন মহামন্ত্র কেবল আপনাআপনি ভোগ করা বিধেয় নহে। এক ভ্রাতা যদি ভাগ্যবশে একটী সুস্বাদু ফল পায়, তাহা যেমন তাহার পক্ষে অন্য ভ্রাতৃগণকে না দিয়া একাকীই আত্মসাৎ করা কর্ত্তব্য নহে; তেমনি বহুসাধনা ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে তিনি যে "কৃষ্ণ নাম-মহামন্ত্র ফল" পাইয়াছেন, তাহা দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে না বিলাইয়া নিজে নিজে উপভোগ করা কখন কর্ত্তব্য নহে। যেমনি এই চিন্তা, তেমনি কার্য্য। গ্রামের কয়েকজন বালক সংগ্রহ করিয়া একটী "বালক-সঙ্গীত সম্প্রদায়" লইয়া তিনি বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গোষ্ঠ-লীলা গাহিয়া বেড়ান। ছোট ছোট বালকগুলি যখন ধড়া, চূড়া পরিয়া, হস্তে বাঁশী লইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া একতানে গাহিত—

আয় ভাই কানাই, আয় গোঠে যাই,
গগনে উঠিল ভানু।

তখন বোধ হইত যেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাখাল বালকগণের সহিত গলাগলি হইয়া গোষ্ঠে চলিয়াছেন, আর গাভীগণ উর্দ্ধপুচ্ছে "হাম্বা হাম্বা" রবে তাঁহার বংশীধ্বনির অনুসরণ করিতেছে।

এই ভাবে বহু দিন কাটিয়া গেল। সাধক রসিকলাল বঙ্গের দ্বারে দ্বারে দীন-বেশে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে বালক সঙ্গীতকে বৃহৎ যাত্রাদলে পরিণত করেন। তিনি নিজেই যাত্রার পালা রচনা করিতেন, সে সমস্ত পালার অভিনয়ের মধ্যে একটু নূতনত্ব ও বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার কালকেতু বা মায়ের ছেলের অভিনয় শুনিতে শুনিতে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়; তাঁহার প্রভাস মিলন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পূত-প্রেমের আদর্শস্থল। প্রভাসতীর্থে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধায় মিলন হয়, তখনকার যে চিত্র কবি রসিকলাল সুনিপুণ তুলিকা হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। রসিকলাল সুনিপুণ চিত্রকর—তুলিকা তাঁহার হৃদয়ের ভাব,—রং তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁহার "সীতার পাতাল প্রবেশ" শোকোচ্ছ্বাসের প্রবল উৎস এবং "কংসবধ" * বীরত্বের চরম আদর্শ। একই

হস্তে এমন করুণ, বীর, হাস্য, প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভাব প্রদর্শন করিতে কবিবর রসিকলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রসিকলাল কি তবে শুধু কবি বা সাধকই ছিলেন? না—তাহা নহে। তিনি সংসারবাসী হইয়াও নিষ্কাম অনাসক্ত ত্যাগী ছিলেন। বাল্যকালে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল আপন জীবনকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য। তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণীরূপেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনব্যাপী সঙ্গীতদল পরিচালনের ফলে তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই অর্থে তিনি অকাতরে দীন দুঃখীর সেবা করিতেন, বিপদগ্রস্তকে বিবিধ ভাবে সাহায্য করিতেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতেন। শেষ জীবনে তিনি আপন গ্রামে বিস্তৃত স্থলব্যাপী কয়েকটী মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সাধু, অতিথি সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যত কিছু সম্পত্তি তাহা ঐরূপ কার্য্যেই নিয়োজিত। অহো! কি অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি, কি আদর্শ ভগবৎ-প্রেম!

সন ১৩১৩ সালে ভক্ত রসিকলাল এ মর-জগত ত্যাগ করেন। যতদিন বাঙ্গলায় কবির আদর থাকিবে—সাধকের সম্মান থাকিবে—ভক্তের মহিমা ও গৌরব থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্মৃতি কোনমতেই বঙ্গবাসীর হৃদয়-পট হইতে মুছিয়া যাইবে না।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

যতিপঞ্চকং।

বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তো
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
বিশোকমন্তঃকরণে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১

বেদান্ত বাক্যেতে সদা সানন্দ ভ্রমন, ভিক্ষান্ন মাত্রেতে হয় সন্তোষ সাধন,
শোকশূন্য হৃদয়েতে সুখে অবস্থান, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান। ১

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২

তরুমূল যাহাদের কেবল আশ্রয়, আহারের পাত্ররূপ শুধু বাহুদ্বয়,
ঐশ্বর্য্য অতীব তুচ্ছ কন্থার সমান, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান! ২

দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ
নান্তং নমধ্যং নবহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩

দেহাদি আসক্তি ভাব ছাড়ি একেবারে, আত্মায় পরম-আত্মা যাহারা নেহারে,
অনুক্ষণ স্থির-চিত্তে করে যারা ধ্যান, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান! ৩

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪

আত্মানন্দ ভাবে যাঁরা সদা তুষ্টিমান, ইন্দ্রিয়ের শান্তি হেতু যারা শান্তিবান,
নিশিদিন ব্রহ্মসুখে রমিত পরাণ, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান! ৪

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫

পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র মুখে উচ্চারণ, পশুপতি-দেবে হৃদে সদা আরাধন,
ভিক্ষাশী হইয়া দেশে দেশে ভ্রম্যমান, এ হেন কৌপীনধারী বটে ভাগ্যবান! ৫

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং যতিপঞ্চকং সমাপ্তং।

সমালোচনা।

ব্রহ্মবিদ্যা। আমরা এই মাসিক পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল মহোদয়গণ এই পত্রিকার সম্পাদক। তদ্ভিন্ন চিন্তাশীল ভাবুক মহাত্মাগণ ইহার লেখকরূপে বিরাজমান। পত্রিকার আকার ও বিষয় সহ তুলনা করিলে ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা অতি সামান্য মাত্র। আমরা প্রতি ধর্ম্মাত্মার গৃহে এরূপ পত্রিকার সমাদর বাঞ্ছনীয় মনে করি। ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞান। শিল্প কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা-খানি ডাক্তার শ্রীঅমৃতলাল সরকার, এফ, সি, এস, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিধাতার সৃষ্টিরহস্য এবং জাগতিক দ্রব্যাদির আবশ্যকতা ও তাহার সহিত সর্ব্বজীবের কিরূপ মধুর সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে হইলে, এ পত্রিকা পাঠ করা কর্ত্তব্য। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ৫১ নং শাঁখারিটোলা কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

ব্যবসা ও বাণিজ্য। ৩৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। স্বাধীন জীবিকা যাহারা ভালবাসেন, তাহাদের এ পত্রিকা বিশেষভাবে পাঠ করা উচিত। ব্যবসা বাণিজ্যের নানা জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত দেখিলাম। বার্ষিক মূল্য ৩।৵৹ আনা।

জন্মভূমি। ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। এই পত্রিকাখানি বিবিধ মনোহর ধর্ম্ম, নীতি এবং সামাজিক প্রবন্ধে পূর্ণ। এবং সুললিত হিতোপদেশাত্মক গল্পও মধ্যে মধ্যে ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

তিলি বান্ধব। তিলি জাতির উন্নতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পত্রিকাখানি নানা সামাজিক সৎকথা লইয়া প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এই পত্রিকা খানির অস্তিত্ব এবং তিলি জাতির মধ্যে ইহার বিশেষ ভাবে প্রচার একান্ত মনে কামনা করি। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। অফিস—কদম তলা, হাওড়া।

শান্তি-পথ। এই পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র কুণ্ডু—একজন সঙ্গতিপন্ন যুবক। একদিন ইনি উচ্ছৃঙ্খল,—অব্যবস্থিত—অশান্তচিত্ত ছিলেন। কিন্তু অহৈতুক করুণাময় ভগবানের করুণা-প্রভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যে দারুণ দুঃখময় ঘটনা সংঘটিত হওয়ায়, লেখকের পূর্ব্বজীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া

ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। এই ধর্ম্মজীবনে, ধর্ম্ম ও শান্তি পিপাসু লেখক স্বয়ং, সেই শান্তিময় ভগবানের শান্তি-স্নিগ্ধ—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপ্রদ চারু-চরণাম্বুজ লাভ করিবার জন্য যে উপায় বা পথ অবলম্বন করিয়াছেন, "শান্তি-পথ" নামক গ্রন্থখানিতে সেই উপায় বা পথের আভাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিলেও পুস্তকখানিতে "জীব ও জগৎ", "সাধন সোপান", "শঙ্করাচার্য্যের মণিমালা" প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, সেই সমস্ত সৎ বিষয় আলোচনা করা প্রত্যেক মানবের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই গ্রন্থখানি লিখিতে যে অনেক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় করিতে হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সৎগ্রন্থ পাঠ, সচ্চিন্তা ও মনে প্রাণে সৎ বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা যাঁহার জীবন ব্রত, তিনি যে ধন্য ও প্রশংসার্হ, এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। আমরা শান্তি-পথ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি এবং যাঁহারা শান্তিপথে বিতরণ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে ইহা শান্তি-পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে, বলিয়া মনে হয়। পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ॥• আট আনা মাত্র। কুমারখালী, নদীয়া, গ্রন্থকারের নিকট পুস্তক পাওয়া যায়।

সংবাদ।

গত ১০ই আষাঢ়, ২৪শে জুন, সোমবার, পটলডাঙ্গা ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক্ এসোসিয়েসন্ কর্ত্তৃক, বঙ্গীয় নাট্য-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সম্মান উদ্দেশ্যে কোহিনুর থিয়েটারে তদীয় মহানাটক "ভ্রান্তি"র অভিনয় হইয়াছিল। সভ্যগণ সকলেই ভদ্রসন্তান, তাঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রত্যেক ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উদয়নারায়ণ, রঙ্গলাল, সরফরাজ খাঁ, নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের অভিনয়াংশ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। সহরের অনেক গণ্যমান্য মহোদয়গণ এ অভিনয় দর্শনে আহূত হইয়াছিলেন, সভ্যগণ সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। 'গিরিশচন্দ্র' নামক একটী সুন্দর কবিতা সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল, আমরা এই সংখ্যার যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি।

বিগত ৩২শে আষাঢ় ও ৮ই শ্রাবণ তারিখে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইটালী শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব অতি আনন্দের

সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গতবর্ষের রথপর্ব্ব উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ যে সংগীতটী রচনা করিয়াছিলেন, সে সংগীতটী অতীব মধুর ও প্রাণস্পর্শী। বালকগণ রাখালবেশে সেই মধুর সঙ্গীত গাহিয়া যখন নাচিতে থাকে, তখন ভক্তের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়, নয়নে প্রেমধারা ঝরিতে থাকে—আর ভাব বিভোর হইয়া গদগদ কণ্ঠে গাহিতে থাকে—

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
(আমার) তাই বাসনা, হৃদয়বল্লভ, এস হৃদয় রথে॥
ওহে বাঞ্ছা-কল্পতরু!—বড় সাধ হয়েছে—
হৃদয়-রথে দেখতে তোমায়—বড় সাধ হয়েছে"—

আবার সেই গান শুনিতে শুনিতে পাপী তাপী ও পতিত জনের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়—তাহারও প্রাণে পরকালের ভরসা জাগে—সেও জলভরা চোখে গাহিতে থাকে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
গীতায় তোমার আশাবাণী শুনেছে অধম॥
তাই ভরসা আছে—আমি হইনা কেন যেমন তেমন—
তোমার কৃপাকণা, পাবই পাবো—এই ভরসা আছে,
তুমি পতিতপাবন, অধম তারণ—তাই ভরসা আছে।"

ইটালীর এ রথপর্ব্বে যাহারা যোগদান করিয়াছেন, তাহারা এ পুণ্যযোগ দর্শনে ধন্য হইয়াছেন। আমরাও ভক্ত পদধূলি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ।

—০—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

আগামী ১৯শে ভাদ্র, ইংরাজী ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি-মন্দির, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে সপ্তবিংশ বার্ষিক **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব** হইবে।

এতদুপলক্ষে ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ১৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার অবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইবে এবং ১৯শে ভাদ্র বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন সিমুলিয়া ১১ নং মধুরায়ের গলি, সেবক রামচন্দ্রের শ্রীআঙ্গিনা হইতে দলে দলে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় যোগোদ্যানে যাইবে ও ঐ দিবস তথায় মহোৎসব হইবে।

তত্ত্বমঞ্জরীর গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের এই উৎসবে সবান্ধবে যোগদান আমাদের বিনীত ও একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ভাদ্র, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫২ পৃষ্ঠার পর)

৫৬৩। ঠিক পথ জানেনা, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তি ও ব্যাকুলতার জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন জগন্নাথ দেখতে বেরিয়ে ছিল, পুরীর পথ সে জানতো না, দক্ষিণে না গিয়ে পশ্চিমে গিয়ে পড়েছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করতো। ক্রমে জিজ্ঞাসা করতে করতে পুরীতে গিয়া পড়লো আর জগন্নাথকে দর্শন কল্লে। না জানলেও টান থাকলে কেউ না কেউ বলে দেয়।

৫৬৪। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিল। তাঁকে দর্শন করে তার মনে হোলো যে, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার! সন্ন্যাসীর হাতে দণ্ড ছিল, তাই দিয়ে সে দেখতে লাগলো যে, দণ্ড জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কিনা! একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটী নিয়ে গেল, তখন দণ্ডটী কিছুতে ঠেকলনা, যেন সেখানে কোনও মূর্ত্তিই নাই—পরে যখন ওধার থেকে আবার এধারে আনতে গেল, তখন দণ্ডটী ঠাকুরের গায়ে ঠেকলো। সাধু বুঝলে যে, যিনিই সাকার, আবার তিনিই নিরাকার।

৫৬৫। যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাকবেই থাকবে। ততক্ষণ আমি ভাল কাজ করছি—আমি মন্দ কাজ করছি—এ ভেদ

বুদ্ধি থাকবেই থাকবে। এ ভেদবুদ্ধি তাঁরই মায়ায় হয়,—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য এই সব বন্দোবস্ত।

৫৬৬। বিদ্যামায়ার আশ্রয় নিয়ে. সৎপথ ধরলে, ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যে তাঁকে লাভ করে, সে সকল মায়া পার হয়ে যায়।

৫৬৭। তিনি একমাত্র কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা—এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত।

৫৬৮। ঈশ্বরের কাছে কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, তবু তাঁকে দেখতে ভালবাসি—এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি।

৫৬৯। অহল্যা বলেছিলেন—হে রাম! যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে,—আমি আর কিছু চাইনা।

৫৭০। রামচন্দ্র একদিন নারদকে বর দিতে চাইলেন। নারদ বল্লেন, ঠাকুর! আমাকে যদি বর দেবে তবে এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় কখনও মুগ্ধ না হই। আমি আর কিছুই চাইনা—কেবল চাই—তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।

৫৭১। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না।

৫৭২। পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হয়ে যে কর্ম্ম করা যায়, তাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল। এরূপ কর্ম্ম করতে করতে শেষে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হয়। কিন্তু এরূপে কাজ করতে সকলে পারেনা, বড় কঠিন।

৫৭৩। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান।

৫৭৪। পায়ে যখন একটা কাঁটা বেঁধে, তখন সেই কাঁটাটী তোলবার জন্য আর একটী কাঁটা আনতে হয়। কাঁটা তোলা হলে তখন দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার। তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুটীই ফেলে দিতে হয়। ভগবান্‌ জ্ঞান অজ্ঞানের পার।

৫৭৫। বশিষ্ট ঋষি, পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন। লক্ষ্মণ আশ্চর্য্য হয়ে রামকে বল্লেন, ভাই, একি! রাম বল্লেন—ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার

অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। কেবল মাত্র ব্রহ্ম,—জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।

৫৭৬। ব্রহ্মদর্শন হবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। ভগবতী যখন গিরি-রাজের ঘরে জন্মালেন, তখন মা তাঁকে নানারূপে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করলেন। গিরিরাজ শেষে বল্লেন—মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এবার যেন সেইরূপ দেখতে পাই। তখন ভগবতী বল্লেন বাবা, যদি ব্রহ্মদর্শন করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

৫৭৭। ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী দাও। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দেবেন কি না দেবেন, তা তিনি বুঝবেন।

৫৭৮। অনেক লোকে বলে যে 'ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ।'—কেননা, তিনি একজনকে সুখে রেখেচেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেচেন। মানুষের নিজের ভিতরেও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরেও তেমনি দেখে।

৫৭৯। পঞ্চভূতে যে দেহ নির্ম্মাণ—সেটা স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের সম্ভোগ ও আনন্দ লাভ হয়, সেটী কারণ শরীর। তন্ত্রে তাকে 'ভাগবতী তনু'—বলে। এই সকলের অতীত অবস্থা মহাকারণ। তুরীয়—মুখে বলা যায় না।

৫৮০। যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবে—তখন তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি লাভ হয়—এই প্রার্থনা করবে।

৫৮১। তর্ক বিচার এ সব নিয়ে কি হবে! তাঁতে একবারে ডুবে যাও। হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লে, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র,—ও সব কিছুই জানিনা, কেবলমাত্র আমি এক রামের চিন্তা করি—রামকেই জানি।

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু।

গুরুর কথা স্মরণ করিতে গেলে ছিটাফোঁটাকাটা সশিষ্য গাঁঠরি স্কন্ধে ভৃত্যসহ উপস্থিত গুরুর কথাই মনে হয়। গুরু পট্টবাস পরিধৃত, নামাবলিতে অঙ্গাচ্ছাদিত, কপালে ত্রিপণ্ড্র, গলে তুলসী কিম্বা রুদ্রাক্ষমালা। গুরু শিষ্যালয়ে আসিলে আহারের পারিপাট্য, কথার ছটা—ভাবের বিশেষ তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ইহাই দেখা যায়। গুরু গৃহে আসিলে শিষ্য সশঙ্কিত—দায়গ্রস্ত—বিপন্ন। গৃহে আনন্দ থাকে না, ভয়ে নিতান্ত আর্ত্ত। কখন কি ত্রুটী হয়, কি ঘোট হয়, সেই ভয়েই গৃহীশিষ্য ভীত। গুরু বিরক্ত হইলেই গৃহস্থের সর্ব্বনাশ—পরিবারবর্গের ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা। তাই গৃহস্থ সর্ব্বদাই সতর্কিত। গুরু বিদায় হইলেই গৃহস্থ আশ্বস্ত। গুরু আসিয়াই নিজ গৃহের অসঙ্কুলানের লম্বা ফর্দ্দ দিয়া বসিলেন। গুরু পত্নীর অসুখবার্ত্তা, চিকিৎসায় বিষম খরচা—গুরু আবাসের ভগ্নাবস্থা—সংসারের অকুলান। সেই ইতিহাসেই গৃহস্থ জর্জ্জরিত। রীতিমত বিদায় না করিলে গুরু যে এবার নাছোড়বন্দা—তাহারই সূচনা হইতেছে। গুরুদেব পদধৌত করিয়া বিশ্রাম করিলেন, শিষ্য আপ্যায়িত। তারপর শিষ্যের কুশল সংবাদ প্রশ্ন। পরে তাহার সাংসারিক আয় ও স্বচ্ছন্দতা বিষয়ের প্রশ্নোত্তরে গুরুর শান্তি কিম্বা দুর্ভাবনা; পাছে বিদায়ের ব্যাপারটা সংক্ষেপ হয়। গুরুদেব স্নানান্তর তুলসী পুষ্প ও বিল্বপত্রের সাহায্যে পূজা শেষ করিয়া জল-যোগ সমাপ্তিপূর্ব্বক রন্ধনের যোগাড়ে বিব্রত। গুরুদেব আহারান্তে বিশ্রাম লাভ করিলেন, গৃহী প্রসাদ লাভে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া গুরু সেবায় নিযুক্ত হইল। বিশ্রামান্তর গুরুদেব বিদায়ের জন্য ব্যস্ত, অনেক শিষ্যালয়ে যাইতে হইবে। গুরুগৃহে কোন আমন্ত্রকার্য্য, তদুপলক্ষে শিষ্যগৃহে আগমন। সময় নাই—অবসর নাই, দিন সংক্ষেপ, সমস্ত সত্বর যোগাড় করিতে হইবে। শিষ্য বিপন্ন, হাওলাত বরাত করিয়া যাহা যোগাড় করিয়াছে, গুরুদেবের পদপ্রান্তে দিয়া সপরিবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণত। আশানুরূপ প্রণামী লাভে বঞ্চিত হইয়া গুরুদেব বিমর্ষ, মুখে হাসি নাই, ভার ভার। সামাজিকতা রক্ষার ছলে কাষ্ট-হাসি হাসিয়া শিষ্যবৃন্দকে মৌখিক আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক শ্রীহরি স্মরণে যাত্রার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, তখনও লাভের চেষ্টা। অমুকের পুত্রবধূ মন্ত্রগ্রহণে উপযুক্ত, তাহার মন্ত্র আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমায় দিব, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে। এইরূপে গুরুদেব নূতন লাভের পন্থা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

শিষ্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—এবারের মত দায় এড়াইল। আমাদের দেশে ঐরূপ গুরু ও শিষ্যের ভাগই অধিক। অতএব গুরুসহায়ে ভগবান লাভ যে কত নিকট, তাহা আর অধিক বুঝাইতে হইবে না। ঐরূপ গুরুর দল, শিষ্য ও শিষ্যাগণের কর্ণমূলে ফুঁক দিয়াই তাহাদিগকে ভগবানের রাজ্যের খপর দিয়া দেন। সে রাজ্যের খপর দিয়া গুরু ক্ষান্ত—এবং সংবাদ পাইয়া শিষ্যও শান্ত। এই ক্ষমা ও শান্তি দুয়ের মধ্যে গুরু শিষ্যের উভয়ের সংবাদ শেষ করিলাম। এক্ষণে প্রশ্ন হইল, তবে গুরু কে? শাস্ত্রে বলিয়াছে—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

এই চরাচর বিশ্বভুবন মণ্ডল যিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই জগৎব্যাপী ভগবানের পদপ্রদর্শনকারী গুরুকে নমস্কার।

আবার শাস্ত্রে বলেন—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যে মহাপুরুষ জ্ঞানাঞ্জনরূপ শলাকাদ্বারা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুপদবাচ্য মহাপুরুষের চরণে প্রণাম।

পুনরপি বিষদভাবে শাস্ত্রে বলেন—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুই মানবের ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণুস্বরূপ, গুরুই সাক্ষাৎ মহেশ্বর, এবং গুরুই পরমব্রহ্ম, অতএব সেই জগদ্‌গুরুর চরণে নমস্কার।

আবার সাধারণ কথায় বলে—

গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যেই জন করে।
কুম্ভিপাক নরকেতে সদা বাস করে॥

অতএব জগতীতলে এরূপ গুরু কে? কাহার সিদ্ধ মন্ত্রবাক্যে জগৎ প্রসবিতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তির জ্ঞান, জ্ঞানবোধ্য হয়।

যিনি ভবার্ণবের কর্ণধার, তিনিই একমাত্র গুরুপদ বাচ্য। যিনি প্রেমের তরঙ্গ উঠাইয়া জগৎবাসী জীবকে প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গায়িত করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যিনি জীবনের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতাকুলিত জীবকে নিরাশ্রয়ে আশ্রয় দেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যিনি প্রলয়রূপ ঘোরান্ধকারে পথভ্রান্ত পথিককে

স্বর্গীয় আলোক প্রদর্শন করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যখন আত্মীয়স্বজনের প্রেমালিঙ্গন হ'তে বিচ্যুত হইয়া মানব ভীষণ শ্মশানের ঘোরান্ধকারে একাকী নীত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে ও পিশাচের ত… নৃত্যে আকুলিত হয়, তখন যিনি ভববন্ধন মোচন করিয়া দিয়া শ্মশানবাসিনীর স্নেহময় কোলে শয়ন করাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য। যখন জীব রোগে, শোকে, পুত্রকলত্রাদি বিয়োগজনিত দারুণ মনস্তাপে বিধ্বস্ত, যখন সংসার তাহার চক্ষে মরুবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন যিনি অমৃতময়ী আশ্বাস বাক্যে নীরস ও ক্ষীণ হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যখন জীব ধনজনে, আত্মীয় স্বজনে বিচ্যুত হইয়া ঘোর নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হয়, যখন জগতে সান্ত্বনা দিবার কেহই থাকে না, যখন প্রাণ স্বতঃই অনুদ্দিষ্ট কাহার সাহায্য লইতে উন্মুখ হয়, সেই নৈরাশ্য সাগরে যিনি জীবকে আশ্বাসবাণী দিয়া ভবার্ণবে কূল দেখাইয়া দেন, তিনিই একমাত্র গুরুপদবাচ্য। যখন জীব ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করে না, তখন যে মহান হইতে মহান পুরুষ স্বর্গীয় জ্যোতি দ্বারা জীবকে সত্যপথ প্রদর্শন করেন, তিনিই যথার্থ গুরুপদবাচ্য। তাই শাস্ত্রে গভীরতত্ত্ব আন্দোলন করিয়া কহে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ঠাকুরের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, ঠাকুর আমাদের এ দেহধারণে কখনও কাহারো কর্ণে ফুঁক দিয়া কোন মন্ত্র বলিয়া দেন নাই। তিনি কস্মিনকালে কাহাকেও বৃথা আশ্বাস বাণী দেন নাই। যে ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আশ্বাসবাক্য ধ্রুব ও সত্য, যে আধারে যেটী উপযোগী সেই আধারে সেইরূপ উপদেশ দানে তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন, ঢোঁড়া সাপে ধরিলে ব্যাং যেমন ডাকিতে থাকে, কিন্তু জাত সাপে ধরিলে, তাহার আর ডাকিবার শক্তি থাকে না। সেইমত ঠাকুর আমাদের জাত সাপ, যিনি তাঁহার উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহাকে জাত সাপে ধরিয়াছে, তাঁহার আর ডাকিবার শক্তি থাকিত না। কাঁচপোকাধৃত আরসুলার ন্যায় জড়বৎ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ঠাকুর নিজের মত বলিয়া কাহাকেও কোনও উপদেশ দিতেন না। উপদেশ দানের

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেন, মা যেরূপ বলেন তাহাই বলিতেছি। অতএব দেখা যায়, ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত ভাবের কথিত গুরুশ্রেণী ভুক্ত ছিলেন না।

তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্ত যখন মন্ত্রগ্রহণের জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হন, তখন ঠাকুর তাঁহাকে নিজে মন্ত্র দেন নাই। রামচন্দ্রের একাগ্রতা ও অহেতুকী ভক্তিবশতঃ তিনি স্বপ্নে সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ঠাকুর সেই বীজমন্ত্রে তাঁহার আশ্বাস ও উপদেশবাণীরূপ বারি সেচনে তাহাকে সতেজ ও বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র যখন ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ঠাকুর তাঁহাকে সাধন-ভজনে অপারক দেখিয়া মন্ত্রদান না করিয়া বকলমা লইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীমুখে বলিতেন, তিনটী কথায়—আমার গায়ে খোঁচা বোধ হয়, অর্থাৎ গুরু, পিতা ও কর্ত্তা। দেহধারী জীব, জীবের গুরু, পিতা ও কর্ত্তা হইতে পারে না। তাই তিনি গুরুর নাম শুনিলে শিহরিতেন। অতএব ঠাকুর আমাদের যে মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন না, তাহা নিশ্চিত।

তবে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে ধর্ম্মগ্লানি নিবারণ জন্য দেহধারণপূর্ব্বক যেমন মহাপুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন,—ইনি সেই শ্রেণীর গুরু ছিলেন।

যুগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ইহাদিগের দেহধারণ। যখন ধরণী নিঃক্ষত্রীয়—ক্ষাত্র-তেজ অপনীত, রাক্ষসকুল দুর্দ্দান্ত, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি বিঘ্নপ্রাপ্ত, তাই রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ভারতে সনাতন ঋষিধর্ম্ম অপ্রতিহত রাখিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সত্যব্রত রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য স্বীয় প্রাপ্য রাজত্ব কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করেন। প্রজারঞ্জনের জন্য সতীর আদর্শ প্রিয়তমা সীতাকে অনায়াসে বনবাসে প্রেরণ করেন এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দেবদ্বেষী রাবণকে সম্মুখসমরে নিহত করিয়া নষ্টপ্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যান। অত্যাচারে—হীনবলের উৎপীড়নে ধরণী বিধ্বস্ত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রবল সমরানল প্রজ্জলিত করিয়া দিয়া পাপিষ্ঠ নাশের দ্বারা ভূভার হরণ করেন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের গোঁড়ামিতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় তখন শঙ্কর স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন।

আবার যখন ম্লেচ্ছাধিকারে ভারত বিপন্ন, হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, নীচ ভাবাপন্ন তান্ত্রিক সাধকের বীভৎস আচরণে মানবহৃদয়ের ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত প্রায়, ভক্তি

শ্রদ্ধা ও প্রেম অপহৃত, তখন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে নদীয়া টলমল করাইয়া প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আবার যখন ইংরাজাধিকারে যথেচ্ছাচার ভারতে প্রবাহিত, জনে জনে ভাবের অভাব, খ্রীষ্টান ও নীরস ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপুল স্রোতে হিন্দুভাব বিতাড়িত, মন ও মুখের ঐক্যতা তিরোহিত, অর্থের পূজা, ধনের গরিমা, ধনাগমে নরনারী সতত উন্মুখ, যখন ভারতবাসী প্রাণ হারাইয়াছে, ভাব হারাইয়াছে, ভক্তি হারাইয়াছে, প্রেম জলাঞ্জলি দিয়াছে, তখন অহেতুকী ভক্তিসম্পন্ন নিরক্ষর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী প্রেমাবতার দীন পূজারী ব্রাহ্মণের বেশে আমাদের রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সকল দিক রক্ষা করিলেন। তাই বলি, ঠাকুর আমাদের মন্ত্রদাতা গুরু নহেন, শিব যে ভাবের গুরু, রাম যে ভাবের গুরু, চৈতন্য যে ভাবের গুরু, খ্রীষ্ট যে ভাবের গুরু, সেই সমস্ত ভাবের সমষ্টি হইয়া দীনহীন রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া মানবের হৃদয়ের জটিল সন্দেহজাল দিব্যালোকে চিরদিনের তরে বিদুরিত করিয়া দিবার জন্য জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই বলি, ঠাকুর আমাদের মন্ত্রদাতা গুরু নহেন, তিনি জগদ্‌গুরু তাঁহার চরণে প্রণাম।

ঠাকুরের চালচলন, কার্য্যকরণ, সকলই ভাবময় ও বিচিত্র লীলাময়। তাঁহাকে একবার দেখিয়া, কি দুই একবার কথা কহিয়া, তাঁহাকে বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভাবের বৈচিত্র্যে তাঁহার স্বরূপত্ব সহজে বুঝিয়া উঠা মানবের পক্ষে সুকঠিন। তাই তাঁহার সহবাসে বাল্যকালাবধি থাকিয়া হৃদয় কি প্রতাপ হাজরা তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজীবন সেবারত নিজাত্মীয় হৃদয়ও নিজ কর্ম্মফলে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের সহিত বিচ্ছেদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে যিশুচরিত্রের সহিত ঠাকুরের চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। যিশু খ্রীষ্টের ন্যায় ঠাকুর ভগবানের কথা আন্দোলন করিবার সময় নিজাত্মীয়গণকে ভুলিয়া যাইতেন ও পরকে আপন করিয়া লইতেন। দেব রামকৃষ্ণ যেন পুঞ্জীকৃত ভাবসমষ্টি বই আর কিছুই নয়। ভাব লইয়াই রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলাও ভাবময়। লীলাময়ের লীলায় ধনৈশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত মথুর দীনহীন পূজারি ব্রাহ্মণের পদানত; ইংরাজী বিদ্যায় পরিশোভিত ও পরিমার্জ্জিত রুচি নিরাকারবাদ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নেতা বাগ্মীপ্রবর কেশবচন্দ্র নিরক্ষর দীন ব্রাহ্মণের উপাসনা লইয়িতে বিমুগ্ধ। উচ্চ বিজ্ঞানবিশারদ সুমার্জ্জিত-রুচি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের সাদা সহজ উপদেশে চির বিক্রিত ও তাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া

আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। কেশব নিরাকারবাদী হইয়া তাঁহার উপদেশে সাকার ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মময়ীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে তর্কচ্ছলে ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলেন যে, যাঁহাকে এতদিন পিতা বলিয়া ডাকিয়াছ, আজ তাঁকে ব্রহ্মময়ী মা বলিয়া সম্বোধন কর—কতই না আনন্দ পাইবে? সেই মুহূর্ত্ত সিদ্ধবাক্যে কতই ফল ফলিল। সেই মহাপুরুষের ব্রহ্মময়ী নামরূপ সিদ্ধ মন্ত্র কেশবের নীরস হৃদয়ে সহসা বীজবৎ অঙ্কুরিত হইল। কেশব যাঁহাকে এতদিন পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং যাহাতে তিনি হৃদয়ে এতদিন মধুর প্রীতি অনুভব করেন নাই, আজ মহাপুরুষের সিদ্ধবাক্যে ব্রহ্মময়ী বলিয়া ডাকিবামাত্র কি এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমানন্দরসে আপ্লুত হইলেন এবং ঠাকুরও ছলে তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মময়ীরূপ শক্তিবীজ রোপিত করিলেন। যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধারণ ব্রাহ্মদলের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, নিরাকারবাদ যাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে সাকারবাদ কুসংস্কার সম্পন্ন ও ভ্রমমূলাত্মক বলিয়া যাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস, সেই বিজয়কৃষ্ণ শেষে দিগ্বিজয় হইয়া উঠিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নূতন ছাঁচে ফেলিয়া নূতনতর করিয়া গড়িলেন। তাই বলি, ঠাকুর আমাদের জগদ্‌গুরু। যে ভাব মানুষে নিতান্ত অসম্ভব, যাহা কাঠোর যোগেও সাধিত হয় না, ঠাকুরের নিকট তাহা সহজ ও সাধারণ ছিল, অথচ ঠাকুর কখন বিভূতি দেখাইতেন না, "বলিতেন মা আমি অষ্টসিদ্ধি চাহিনা, অর্থ চাহিনা, দেশমান্য চাহিনা, আমায় ভক্তি দাও।" ভক্তিসর্ব্বস্ব ঠাকুর জীবগণকে অহেতুকি ভক্তি পন্থাই দেখাইয়া গিয়া তাঁহার জগদ্‌গুরুভাব হৃদয়ে হৃদয়ে পোষিত করিয়াছেন। অতএব এই নবযুগের জগদ্‌গুরুর পদে প্রণাম।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়।

—•:•:•—

রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য।

(প্রাণভরা উৎসাহ।)

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" গীতা।

"Arise! Awake! and stop not till the Goal is reached".

Swami Vivekananda.

এবার এ একটী নূতন-লীলা। কেবল উৎসাহ, কেবল উৎসাহ! নৈরাশ্যের নাম গন্ধও নাই। সমস্ত ব্যক্তিকে, সমস্ত জাতিকে, সমস্ত মানবকে এবার কেবল উৎসাহ বাণী। যে উৎসাহ বলে জড়কে চেতন করিতে পারা যায়, আলস্যপরায়ণকে কর্ম্মের স্রোতে ভাসাইতে পারা যায়, দুর্ব্বলের প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হইয়া থাকে, আজ সেই উৎসাহ-বাণী জগৎবাসীর দ্বারে দ্বারে উচ্চারিত হইতেছে। অন্যান্য দেশের পক্ষে যাহাই হোক্ না কেন, ভারতের পক্ষে—অধঃপতনোন্মুখ ভারতের পক্ষে—ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আবার এ উৎসাহ কেবল কথায় পর্য্যবসিত নহে, কার্য্যে। কে কাহাকে উৎসাহ দেয়? দ্বেষ-হিংসাপূর্ণ এই মরজগতে উৎসাহ দানের কথা দূরে থাক, কোন ভ্রম দেখিলে অপরে তিলকে তাল করিবার চেষ্টা করে; ভ্রান্তের ভ্রান্তি দূর করিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে আবার গভীরতর ভ্রান্তি-আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পায়। অন্যান্য দেশের কথা যাই হোক্, অন্ততঃ ভারতের পক্ষে কথাটা বড় ভুল নহে। যে পরের কষ্ট দেখিতে পারে না, অপরকে বিপদে পড়িতে দেখিলে নিজেকে বিপন্ন মনে করে, কিম্বা অপরের দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়, সে-ই কেবল উৎসাহদানে কৃপণ নহে। লোকহিতকারী, পরদুঃখসহিষ্ণু, পরদুঃখকাতর ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জাতি-ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে কিরূপ সকলকে উৎসাহিত করিতেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

একদিন তাঁহার কতিপয় ভক্ত, কর্ত্তাভজাদলের লোক তাঁহার নিকটে আসে বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন—কেন, সে মত কি ভগবানের কাছে পৌঁছিবার একটী পথ নহে? ঘরের মধ্যে অন্যান্য রাস্তা দিয়া যেমন প্রবেশ করা যায়, পায়খানার রাস্তা দিয়াও তেমনি প্রবেশ করা যায়। ঐ না হয় পায়খানার রাস্তার মত। কিন্তু গম্যস্থলে পহুঁছিয়া দেয় তো? তবে সে মতকে ঘৃণা করিবার কি দরকার?

তিনি যদি এই কথাটী না বলিতেন, তবে কর্ত্তাভজাদল নিশ্চয়ই নিরুৎসাহিত হইতেন। কিন্তু তিনি যে কাহাকেও নিরুৎসাহিত করিবেন না—তিনি যে সকলের অভয়দাতা। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য নরেন্দ্রনাথ প্রভুর এই গুণটীতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "সে মুখ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ) হইতে কখনও অভিশাপ গালাগালি বাহির হয় নাই। আমি যতদিন সে মহাপুরুষের চরণতলে ভাগ্যবশতঃ স্থান পাইয়াছিলাম, তাঁহার সেই সার্ব্বজনীন প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।"

যাঁহাদের প্রাণে রোক্ নাই, এমন ভক্তদিগকে উদ্দেশ করিয়া প্রভু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "সেকি-রে? তিনি কি পাতানো মা? তিনি যে নিজের মা। তাঁর কাছে রোক্ করবি—তবে তো?" এই কথাটুকু বলিয়া তিনি ভক্তদের নিকট ভগবানকে নিকট হইতে নিকটতর করিয়া দিতেন এবং মানবে ও ভগবানে যে বাস্তবিক অচ্ছেদ্য গাঢ়তম সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দিতেন। যে কোন জিনিস আমরা লাভ করিতে ইচ্ছা করিনা কেন, তাহাকে আপনার বোধ করা চাই। দূরে দূরে থাকিলে তাহা কাছে আসিবে কিরূপে? কবি বলিয়াছেন "যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।" সুতরাং ভগবানকে আপনার না ভাবিলে, আপনার মত লাভ করিব কেমন করিয়া? সেই জন্য সময়ে সময়ে "মা আমি কি আটাশে ছেলে, ভয় করিনি মা চোখ রাঙালে" ইত্যাদি রামপ্রসাদী গানগুলি গাইয়া কেমন করিয়া রোক্ করিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিতেন। এই রোক্, যত ভক্তের কথা স্মরণ করি, রামপ্রসাদের যেরূপ দেখিতে পাই, অন্যের সেরূপ পাইনা। আপনার বোধ না হইলে লোকে কখনো অভিমান ভরে অন্যকে গালি দিতে সাহস করে না। রামপ্রসাদের ভগবানের প্রতি আপনার ভাব তাঁহার সেই অভিমানপূর্ণ গালাগালিতেই প্রকাশ। কখনও মার সঙ্গে মোকদ্দমা করিতেছেন,—করিয়া ডিক্রী লইতেছেন, কখনও বহুতর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সংসারে ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন বলিয়া মার নিকট সাবাশি চাহিতেন, কখনও বা মাকে খাইবার জন্যও প্রস্তুত! এমন ছেলেমানসী রোক্ না থাকিলে রামপ্রসাদ মাতৃদর্শনে ধন্য হইতেন কি? আমাদের প্রভুও সেইরূপ অনেক রোক্ করিতেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। যেদিন পঞ্চবটী মূলে বসিয়াছেন—মনে ইন্দ্রিয়জয়ী বলিয়া অভিমান আসিতেছিল, সেই দিন মাকে বলিয়াছেন "মা, আর যদি এমন হয়, গলায় ছুরী দিবো!"

তাঁহার এ শিশু-সুলভ রোক্ মা শুনিতে পাইলেন এবং ছেলের ভয়ে আর সেরূপ বিকার উপস্থিত হইতে দেন নাই! আমাদের জ্বালা-যন্ত্রণার মূলে বর্ত্তমান সেই সর্ব্বনাশিনী মায়া! এই মায়াতে আমরা সংসারের নশ্বর বস্তু সকলকে আপনার জ্ঞান করিয়া ভগবানকে—যিনি আপনার হইতে আপনার তাঁহাকে—পর মনে করি। তাই এত দুঃখ, এত দুর্দ্দশা। আপনার হইল পর, পর হইল আপনার! তিনি না বুঝাইয়া দিলে সাধ্য কার—যে মায়ার আবরণ খুলিয়া সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ করবে?

যাঁহারা "হচ্ছে হবে" রীতির পৃষ্ঠপোষক, যাঁহারা বসিয়া শুইয়া ভগবানকে লাভ করিতে চান, এবং যাঁহারা ধীরে-সুস্থে ধর্ম্মাচরণের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "হরিসে লাগি রহরে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই—অর্থাৎ হরির শরণ লইয়া থাক, হ'তে হ'তে হয়ে যাবে" ও কথাটা আমার ভাল লাগে না। হ'তে হ'তে হয়ে যাওয়া আবার কি? হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলোক লইয়া গেলে অন্ধকার কি একটু একটু করে চলে যায়?—না একেবারে চলে যায়? এই কথাটা শুনিয়া স্বামীজির একটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলিতেন "যদি তুমি এই জন্মে মুক্তি না পাও, তবে যে এর পরজন্মে পাবে, তাব প্রমাণ কি?*" যদি কোন ছেলে মনে করে যে, দেখি পড়্তে পড়্তে যতটা হয়, তবে সে কখনও ভাল করিয়া পাস করিতে পারে না। যে মনে করে, দেখি কেমন এই বছরের মধ্যে আমার প্রথম শ্রেণীতে পাস না হয়, সে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতেও পাস করিতে পারে। যাহাই করা যাক না কেন, একটা মনের জোর চাই, তেজ চাই, তাই ঠাকুর বলিতেন, "মেধাটে ভক্তি ভাল নয়। কোমর বাঁধো। উঠে পড়ে লাগো। আঠার মাসে এক বৎসর কল্লে কি হয়? ঢিমে তেতালা হলে চল্‌বে না। চিড়ের মত ভেত্ ভেত্ কল্লে কি হবে? তীব্র বৈরাগ্য চাই।" নিজেও তাহা কার্য্যে দেখাইতেন। দিন গিয়ে সন্ধ্যা হ'লেই অস্থির। সমস্ত দিনটা চলে গেল, তবুও দীনদয়াময়ী মা তাঁহাকে দেখা দিলেন না কেন? কত এ'র নাম ও'র নাম বলিয়া কান্না! মা তুই প্রহ্লাদকে দেখা দিলি, ধ্রুবকে দেখা দিলি, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবিনা কেন, বল মা?

---

* If you cannot attain salvation in this life, there is no proof that you can attain it in the life to come."

মাতৃগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ এইরূপে যে কতই আবদার করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তিনি পাপবাদের প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইতেন। বলিতেন, "যে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' বলে, সে পাপীই হয়ে যায়। পাপ আবার কি? 'আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ?' এইরূপ জোর চাই। খ্রীষ্টানদের সেই পাপবাদটা ভাল নয়।" আমরাও তাই ভাবি, যদি ভগবানের নাম করিয়া, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, ধ্যানধারণাদি করিয়া 'আমি পাপী' এ ধারণা না যায়, তবে আর নামে বিশ্বাস কোথায়? আবার আর একটা কথা। জ্বরে পীড়িত ব্যক্তি ডিঃগুপ্তের ঔষধ খাইবার পরও যদি বলিতে থাকে 'আমি জ্বর-রোগী, আমি জ্বর-রোগী,' তবে ডিঃ গুপ্তের উপকারিতা কোথায়? তাহার ডিঃ গুপ্তের উপর বিশ্বাসই বা কোথায়? রোগী যদি মনে করে যে, সে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতেছে, তবে ঔষধেরও গুণ মানিতে হয় এবং তাহার সে ঔষধে আস্থা আছে বলিয়া জানা যায় এবং বিশেষতঃ যে অপচার করিয়া তাহার রোগ হইয়াছিল, সে আর সে অপচার করিতে সাহস করেনা। আপনাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখে। সেইরূপ নাম করিয়া যদি কেহ উপকার পান, তবে কি চিরকাল তাঁর 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' বলা সাজে? তাহাতে প্রথমে বোঝা যায় তাঁহার নামে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পাপকর্ম্ম হইতে সাবধান হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে চিরপাপী জানিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজনীয় বোধ করেন না। আবার দেখা যায়, মনটাকে উঁচুতে রাখিলে অর্থাৎ উচ্চ ভাবে ভাবান্বিত করিলে সে নীচুতে আসিতে চায় না, বা নীচ প্রবৃত্তিকে আশ্রয় দেয় না। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে আপনাকে তাঁর পুত্র বলিয়া মনে করে, তাহার মন যত উচ্চতে থাকে; যে আপনাকে 'মহাপাপী' বলিয়া মনে করে, তাহার মন তত উচ্চতে থাকিতে পারে না। সুতরাং এই 'আমি পাপী' ভাবকে পরিহার করিয়া 'আমি তাঁর পুত্র' (Son of that Immortal Bliss) ইহাই মনে করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি কোন পাপ চিন্তা মনে আসে, অমনি মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয় "মন! তুই কা'র ছেলে হয়ে কি ভাঁবছিস? ছিঃ সেরূপ চিন্তা কি তোকে সাজে? তুই মহামায়ীর ছেলে—সেইমত ভাবিবি, কাজ করবি। এইরূপ বিভূত ভাবমাত্রায় যে কত লোকের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পণ্ডিতগণ সেইজন্য বলিয়াছেন, "যাদৃশী ভাবনা

যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” ঠাকুর একটী গান গাহিতেন—“আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি, আখেরে এদীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।” কত জোর। নামে কি বিশ্বাস! আবার বলিতেছেন—যে আমি যদি “হত্যা করি ভ্রূণ, নাশি গো ব্রাহ্মণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী, এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।” নামের উপর কি জ্বলন্ত বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাস থাকিলে প্রহ্লাদের মত আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যান্তেও তাঁর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পাপের ছায়াও কখন মনের উপরে পড়ে না। বাস্তবিক যিনি এরূপ জ্বলন্ত-বিশ্বাসাগ্নি হৃদয়মধ্যে জ্বালিতে পারিয়াছেন, কেবল তাহারই অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। সুধু মুখে বলা নয়—নিজে যিনি প্রাণে প্রাণে নামের এরূপ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, আমরা তাহাকে জীবন্মুক্ত না বলিয়া কি বলিব? এ বিশ্বাস সহজে হয় না। বহু সাধনার পরে তবে এরূপ বিশ্বাস পাওয়া যায়। এ বিশ্বাসে মহাপাপী জগাই মাধাই মহাসাধুতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন।

সরল চরিত্রবান যুবক যখন বীর্য্যরক্ষার জন্য বারম্বার প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভগ্নমন ও নিরুৎসাহিত প্রাণ হইয়া পড়ে, তখন আর কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না, আর কূলকিনারা পায় না। তাই অকূলে কূলদাতা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, “সে (বীর্য্য) আষাঢ় মাসের বন্যার মত বাঁধ ভেঙ্গে যাবেই। তাকে মলমূত্র ত্যাগের মত মনে করবি। এক বাটীতে একটা গুড়ের নাগরীর নীচে একটা ফুটো ছিল, তা যত সব অসারগুলো বেরিয়ে গিয়ে সারগুল পড়ে থাকলো। যে গুলা মলমূত্রের মত আপন ইচ্ছায় চলে যায়, সে গুলো তেমনি অসার।” এই কথাটুকু শুনিয়া কত যুবক যে আশ্বাস পাইয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত। তিনি যেমন একদিকে সে কথাটী বলিতেন, আবার অন্যদিকে বলিতেন, চেষ্টা করিয়া যেন কেহ বীর্য্যপাত না করে। আর বলিতেন, যদি কারও একাদিক্রমে বারবৎসর রেতঃপাত না হয়, তবে তার মধ্যে একটা মেধা নাড়ি জন্মাইয়া যায় এবং তাহার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুতরূপে কার্য্য করে। এই প্রসঙ্গে স্বামিজীর একটা কথা মনে পড়ে। তিনি একদিন তাঁহার জনৈক শিষ্যকে প্রায় বারখণ্ড এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার (Encyclopaedia) পরীক্ষা লইতে বলিলেন। শিষ্য যাহাই জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজী তাহাই উত্তর করিতে লাগিলেন। শিষ্য এ অসাধারণ মেধাশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন,

"ওরে, যদি কেহ বার বৎসর বীর্য্যধারণ করিতে পারে, সেও এমনি একটা হইতে পারে।" এই একটা উদাহরণ নহে, তাঁহার জীবনে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমেরিকার কোন এক প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার হইতে প্রতিদিন একখানি করিয়া বড বড় বই আনিয়া সেই সেই দিন ফিরাইয়া দিতেন, তখন সেই পুস্তকাগাররক্ষক কটাক্ষ করিয়া বলিল "আপনি কি বই পড়েন, না স্বধু দেখিতে লয়েন?" স্বামিজী তদুত্তরে বলিলেন, "আপনি পরীক্ষা করিতে পারেন।" পুস্তকাগার-রক্ষক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষা করিলেন এবং পরীক্ষিতের স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হইলেন। স্বামিজী তখন বলিতেছেন, "আপনারা পংক্তি পংক্তি করিয়া পড়েন, কিন্তু আমরা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা করিয়া পড়ি।"* শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী পাঠক তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তির কথা অবগত আছেন। রামায়ণ কণ্ঠস্থ, যাত্রা মুখস্থ, যাহা একবার শুনিলেন, তাই মুখস্থ! এ শক্তির মূল কেবল বীর্য্যধারণে। যাই হোক, যে বীর্য্য পূর্ণযৌবন সময়ে স্বতঃ বহির্গত হয়, সেজন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চেষ্টা করিয়া, কিম্বা অসাবধানে থাকিয়া, তাহা বাহির করা যারপরনাই গর্হিত কার্য্য।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্মার্জ্জনে ক্ষমতা দেখিয়া সংসারী পাছে আপনাকে অশক্ত ভাবিয়া, অক্ষম ভাবিয়া, উৎসাহ শূন্য হইয়া পড়ে, তাই প্রভু সংসারীদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন "কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা ভাল। যদি পেটের দায়ে দশ দ্বারেই ঘুরিতে হয়, তার চেয়ে এক দ্বার কি ভাল নয়? সহধর্ম্মিনীর সহবাসে দোষ নাই। দুই একটী ছেলে মেয়ে হ'লেই স্বামী-স্ত্রীতে ভাই-ভগিনীর মত বাস করা উচিত। নির্লিপ্ত ভাবে থাকবে। সংসারে ছেলে মেয়ে সকলের সেবা করবে, আর জানবে যে আমি তাঁরই (ভগবানেরই) সেবা কচ্ছি। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা কল্লেই হবে। যারা সংসারে থেকে ভগবানের প্রতি মন দিতে পারে, তারাই ধন্য—তারাই প্রকৃত বীর-ভক্ত।" আমরা এইরূপে দর্পহারী ভগবানকে মহর্ষি নারদের ভক্তি-দর্প চূর্ণ করিতে শুনিয়াছি। সংসারী কৃষক সকালে বিকেলে প্রতিদিন মোটে দুইবার ভগবানের নাম করে, আর ভগবান তাকে বড়ই ভালবাসেন—নারদের বড় অসহ্য হইল। মনে মনে ভাবিলেন "আমরা দিবারাত্র তাঁর নাম করি, কই আমাদের উপরতো সে ভালবাসা নাই?" যাই দর্প হওয়া, অমনি দর্পহারী

* "You read by lines, but we read by pages"

হরি, নারদের হস্তে তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া তাঁহাকে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। নারদও প্রভু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৈলপাত্র হস্তে লইয়া বাহির হইলেন। এদিকে প্রভু আদেশ দিয়াছেন, যাহাতে তৈল একবিন্দু ভূপতিত না হয়, সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। নারদ সারাদিন তৈলপাত্র লইয়া ঘুরিলেন। মন পড়িয়া আছে তৈলপাত্রের উপর, যাহাতে এক-বিন্দু তৈল পাত্রচ্যুত না হয়। যিনি সমস্ত দিন ভগবৎ নামে যাপন করিতেন, আজ কিন্তু তিনি সে নামটী একবারও মনে আনিতে পারেন নাই!! সেই অবস্থায় হরির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ণ তৈলপাত্র হরির নিকট রাখিবামাত্র তিনি সস্মিত বদনে প্রশ্ন করিলেন, "নারদ! আজ কয়বার আমায় মনে করিয়াছ?" নারদ অপ্রতিভ হইলেন। মুখ হইতে আর কথা সরিল না। তখন দর্পহারী তাঁর দর্প চূর্ণ করিয়া বলিতেছেন, "নারদ! তুমি সামান্য একটা তৈলপাত্রের ভার লইয়া আমায় ভুলিয়া গেলে। আর সে বেচারা কৃষক এত বড় সংসারের ভার লইয়া আমায় দিন দুইবার করিয়া মনে করে। তবে এখন বল সে আমার ভালবাসার পাত্র কিনা?" নারদ নীরব। ভগবান যুগে যুগে এই দুর্ব্বলের প্রাণে, দুর্ব্বল সংসারীর প্রাণে, বল সঞ্চার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। দুর্ব্বলের জন্যই যখন তাঁদের ভবে আসা, তখন তাহাদিগকে উৎসাহ না দিয়া আর কাহাকে উৎসাহ দিবেন?

তিনি নিরতিশয় দুর্ব্বল মানবকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন "যদি জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা কিছুই কত্তে পার্ব্বিনা, তবে আমায় বকল্‌মা দে। যদি ভাল লোকের উপর কেউ ভার দেয়, সেকি তাকে প্রতারণা করে? কখনই না। তাঁর উপর (ভগবানের উপর) ভার দে।" এই বকল্‌মা পূজ্যপাদ গিরিশ-চন্দ্রের জীবনে সম্যক্ প্রতিফলিত। ধ্যান গেল, ধারণা গেল, জপ গেল, তপ গেল; সামান্য একটী করিয়া প্রতিদিন ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতে গিরিশ আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহাও করিতে কুণ্ঠিত! ঠাকুর তখন বরাভয় প্রদায়িনী মা রূপে বলিতেছেন "তবে তোর কিছুই করিতে হইবে না, তুই আমার উপর ভার দিয়ে দে।" গিরিশচন্দ্র বলেন,—"এখন বুঝিতেছি, বক্‌লমার দম্ কত। এক মুহূর্ত্তও তাঁকে ভুলিয়া থাকিবার যো নাই। আবার কালে কত কি হবে!*" আপনি যদি আপনার সর্ব্বস্বের

* পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে বকলমার যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমরা তাহা প্রত্যেক নরনারীকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিতে চাহেন, তাহাকে আম্‌মোক্তারী দিতে চাহেন, মনে করুন—আপনার কতটা তার প্রতি বিশ্বাস প্রয়োজন। আর যার উপরে এত বড় মূল্যবান জীবনটার ভার দিবেন, তাঁর প্রতি কতই না গাঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন? গিরিশের সেই "পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস" ছিল বলিয়া ভগবান তাঁহার নিকট হইতে বকল্‌মা লইয়াছিলেন।

এইবার পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন—তাঁহার উৎসাহ বাণীতে আপামর কে না উৎসাহিত হইয়াছেন? যখন দেখিয়াছেন যে, উৎসাহ-বারি সেচন করিলেও ক্ষেত্র অপ্রস্তত বা অযোগ্য, সেখানে নিজে ভার লইবার জন্য প্রস্তুত। প্রভু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতে এ ভাবের সম্যক্ পরিস্ফুট ভাবুক মাত্রেই ধরিতে পারিবেন। যখন দেখিয়াছেন, একজন আর একজনকে নিরুৎসাহিত করিতে উদ্যত, যখন শুনিয়াছেন, একজন আর একজনকে কটাক্ষ করিয়া বলিতেছে "তুমি এমন অন্যায় করিয়াছ, তোমার কিছুই হইবে না, তুমি অধঃপাতে যাইবে ইত্যাদি", তখনই সে উৎসাহশূন্য কথা সকল তাঁহার অসহ্য বোধ হইয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণেই বলিয়াছেন, "তার ভাল-মন্দ মা বুঝবেন। তোমরা তা'র ভাল-মন্দ বিচার করবার কে?" ধন্য প্রভু! ধন্য প্রভুর পদানুসারী!

প্রভুর এই সকলকে উৎসাহদান করিবার ভাব তাঁর সকল ভক্তবৃন্দে—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দে সুপ্রতিভাত। তিনি আমেরিকার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভারতে উৎসাহাগ্নি জ্বালিবার প্রয়াস পাইতেন। নীচ জাতিকে কেহ অপমান করিতেছে দেখিলে তিনি বলিতেন যে, সেই জন্যই—অপব্যবহার পাইয়াই—তাহারা খ্রীষ্টান হইয়া যায়। আর বলিতেন যে, নগণ্য যষ্টিমাত্র হস্ত আইরিস্ (Irish) যখন মার্কিন রাজপথে নতমস্তকে হাঁটিতে হাঁটিতে শুনিতে পায়, "পেট্ (Pat), আমরা যেমন মানুষ, তুমিও তেমনি মানুষ। আজ তুমি পথের ভিখারী, কাল মার্কিন দেশের (America) সভাপতি (President) হইতে পার। অমন ভীত ত্রস্ত হইয়া চলিতেছ কেন?" তখন পেট্ নতশিরকে উন্নত করে এবং বোঝে যে মানুষের যে যে দাবী আছে, তাহারও তাই আছে। সেইদিন হইতে সে নবালোকে আলোকিত হয় এবং নব বল পাইয়া ক্রমশঃ উন্নতিপথে চলিতে থাকে।" এমন কি ভারতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত কয়েদীদিগকে দেখিয়া আমেরিকার সংশোধনাগারের (Reformatory) কথা বলিতেন। আমরা যাহাকে জেল বলি, উহারা

তাহাকে সংশোধনাগার বলে। আমাদের কয়েদী মনুষত্ব হইতে বিদায় লইয়া বসে, কিন্তু তাহাদের কয়েদী আপনার দুষ্কৃতের জন্য অনুতাপ করিয়া মনুষ্যত্বে ফিরিয়া আইসে। পুনশ্চ যাহারা জীবনে পাপাচরণ করিয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখেন এবং নিঃচেষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন, "গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বা দেওয়ালে চুরী করে না, কিন্তু তারা চিরদিন সেই গোরু বা দেওয়াল থাকে। আর এই মানুষ চুরী করে, মিথ্যা কথা কয়, এবং এই মানুষই পরম-পদ লাভ করিয়া ধন্য হয়!" অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞ কৃষকাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "যদি ইহারা কখনও বেদান্তের মহান্ সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিত, তবে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত।*" এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়? পাঠক! তাঁহার বক্তৃতাবলীর প্রতি ছত্রে প্রদীপ্ত উৎসাহবহ্নি দেখিয়া চোখ ঝলসিয়া পড়িবে!

ঠাকুরের উৎসাহের কথা কতই বলিব? তিনি মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "এগিয়ে যাও," "এগিয়ে যাও।" চন্দনের কানন, রূপোর খনি, সোনার খনি, শেষে হীরের খনি পাইবে। এগিয়ে যাও। থামিও না। যতদিন জীবিত থাক, থামিও না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই মর্ম্মে বলিয়াছেন— "Discontentment is the germ of greatness" অর্থাৎ অসন্তোষ মহত্ত্বের অঙ্কুর। মানব যখন কিছুতে সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তে তাহার অধঃপতন আরম্ভ হয়। পাঠক মনে রাখিবেন, আমরা লোভে অসন্তোষের কথা বলিতেছি না, লাভে—জ্ঞান লাভে অসন্তোষের উপকারিতার কথা বলিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিবারের প্রত্যেক লোকের এই উৎসাহাগ্নি অন্যের প্রাণে জ্বালিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। স্বামিজী বলিতেন, যে ধর্ম্মে বিধবার অশ্রু মুছিতে পারে না, বুভুক্ষুকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারে না, উলঙ্গকে এক-খানি বস্ত্র পরিতে দেয় না—আমি সে ধর্ম্ম চাইনা। আমরাও তাহার সঙ্গে যোগ করি, যে ধর্ম্মে দুর্ব্বলকে বল দেয় না, নিরুৎসাহিতকে উৎসাহ দেয় না, অধর্ম্মাবর্ত্তে পতিতকে তুলিতে পারে না, আমরা সে ধর্ম্মের উপর অল্পই শ্রদ্ধাবান। এবং যিনি রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়াও অপরকে—অপর দুর্ব্বলকে— উৎসাহ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারেন, আমরা তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পথের পথিক বলিয়া বলিতে পারি না। সেবক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

---

* "If these men can once be awakened with the lofty ideas of Vedanta, they can work wonders in the world".

যোগোদ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য স্বর্গীয় মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে পরমহংসদেবের শ্রীচরণ প্রথমবার দর্শন করেন। সেই হইতেই তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুজনের মধ্যে এই কথা ব্যক্ত করিতে থাকেন। যাঁহারা ভাগ্যবলে রামচন্দ্রের কথা ধারণা করিযাছিলেন এবং পরমহংসদেবের পদধূলি পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মিলিয়া প্রত্যহ রামচন্দ্রের বাটীতে "রামকৃষ্ণ নাম" গান করিয়া খোল করতালের বাদ্যযোগে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত এইরূপ কীর্ত্তন হইত। ভাবে প্রেমে বিহ্বল হইয়া কেহ কাঁদিতেন, কেহ হাসিতেন, কেহ নাচিতেন, কেহ হুঙ্কার করিতেন, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

নিত্য এইরূপ কীর্ত্তনে পল্লীবাসী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যখন ভক্তগণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন একদিন তাঁহারা খোল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও অকৃতকার্য্য হন। অতঃপর একদিন রামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্রের বাটীতে পদার্পণ করিলে, পল্লীস্থ জনৈক বিশিষ্টব্যক্তি তাঁহার নিকটে এই সংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য আদেশ করিতে বলেন। তাহাতে পরমহংসদেব রামবাবুকে ডাকিয়া বলেন যে, "অমনভাবে না করিয়া, একটু আস্তে আস্তে করিও।"

আস্তে আস্তে কি সংকীর্ত্তন হয়? সুতরাং ভক্তগণ বড়ই মনস্তাপে পড়িলেন, এবং রামবাবুপ্রমুখ সকলে একদিন রামকৃষ্ণদেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা কীর্ত্তন উদ্দেশ্যে একটী নির্জ্জন স্থান চেষ্টা করি। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, বেশ, বেশ, এমন একটী স্থান কর, যেখানে একশটা খুন হলেও লোকে জানতে না পায়।" সেই আদেশ লইয়া কলিকাতা মাণিকতলা মেন রোডের পূর্ব্বাংশের সন্নিকট কাঁকুড়গাছিতে একটী উদ্যান (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) ক্রয় করা হয়। যে উদ্দেশ্যে উদ্যানটী ক্রীত হইল, তথায় তাহার কোন ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাতে মালী রাখিয়া রামবাবু শাক-সবজী উৎপন্নের ব্যবস্থা করিলেন।

কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ গো, তোমরা যে সাধন ভজনের যায়গা করেছ, তাহা আমাকে একদিন দেখালে না?" এই কথা শুনিয়া তৎপরের শনিবারে প্রভু তথায় আসিবেন, রামচন্দ্র এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। যখন তাঁহার আসিতে ২।১ দিন বিলম্ব আছে, তখন হঠাৎ রামচন্দ্রের মনে হইল যে, তিনি আসিলে আমরা কি দেখাইব? কপি, কড়াইশুঁটী, শাক-সবজী এই সবত উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই স্থান, তাহার ত কিছুই করা হয় নাই! সুতরাং শুক্রবারের অপরাহ্ণে তাঁহারা ৩।৪ জনে বাগানে গিয়া একটি স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলেন, এবং তাহার ৪।৫ হস্ত ব্যবধানে ঐরূপ তুলসী বৃক্ষের সারি রোপণ করিয়া চতুঃপার্শ্বে বেড়া নিম্মার্ণ পূর্ব্বক মধ্যের ভূমি গোময় দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপন করিলেন, যাহা দেখিলেই সাধন স্থান বলিয়া প্রভুর মনে উপলব্ধি হইবে।

শনিবারে রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর হইতে কতিপয় সেবক সমভিব্যাহারে একখানি গাড়ী করিয়া প্রায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় এই বাগানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "আহা! বাগানটি ত বেশ, ঠিক এই রকম একটি বাগানে যেন আমি আছি, এইরূপ একদিন কি যেন একটা দেখেছিলাম।" উদ্যানের পশ্চিম-পথে চলিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে অবতরণ পূর্ব্বক হাতে মুখে জল দিয়া বলিলেন, "আহা, পুকুরের কি সুন্দর জল" অতঃপর এই পুষ্করিণীর দক্ষিণাংশে যে গৃহ আছে, তথায় প্রবেশ করিয়া মধ্যস্থলের আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আহা ঘরটি যেন ঠাকুর ঘর!" কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ভক্তগণ সংগৃহীত খেজুর, বেদানা, মিষ্টান্নাদি কিঞ্চিৎ মুখে দিলেন এবং উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইলেন। পুষ্করিণীর পূর্ব্বাংশে সেই তুলসী কানন। প্রভু সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র মনে মনে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনি অন্তর্যামী, সকলই জানিতেছেন, আমাদের পদে পদে পদস্খলন, আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। বিষয়ের যেরূপ আকর্ষণী শক্তি, এ উদ্যান লওয়া অবধি তাহাই ঘটিয়াছে, আপনিই স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া চমক্ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক প্রভো! সাধন ভজন সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, আর ভক্তগণ সমক্ষে আমাদিগকে অপ্রতিভ করিবেন না।" দয়াময় ঠাকুর কৃপা করিয়া কোনও কথাই তুলিলেন না, তিনি নির্দ্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থলের সেই তুলসী বৃক্ষের সম্মুখে মস্তকা

বনত করিয়া প্রণাম করিলেন। উদ্যানের পূর্ব্ব উত্তরাংশের কোণে যাইয়া বলিলেন, "এইখানে একটি পঞ্চবটী করিও।" পরে উদ্যানের উত্তরাংশের পথে নিস্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন। উদ্যানের উত্তর গায়ে যে মাড়োয়ারীদিগের বাগানটি আছে, তথায় সতীর মন্দির সম্মুখে একটী সাধু উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আকার ইঙ্গিতে ঠারে ঠোরে কত কথা কহিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াই অবাক্। সেই দিন হইতে রামবাবু ক্রীত উদ্যানের নাম "যোগোদ্যান" এবং পুষ্করিণীর নাম "রামকৃষ্ণ কুণ্ড" রাখা হইয়াছে, এবং তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ অনুযায়ী পরে পঞ্চবটীও নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ভক্তগণ এই পঞ্চবটীতে বসিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকেন।

১৮৮৬ খৃঃ, ৩১শে শ্রাবণ, শ্রীরামকৃষ্ণ নরলীলা অবসান করেন। হিন্দু প্রথানুসারে তাঁহার পুণ্যদেহ চিতানলে দগ্ধ করা হয়। সেই দেহাবশেষ অস্থিপুঞ্জ একটি তাম্র কলসীতে সংগৃহীত করিয়া ভক্তগণ সপ্তদিবস কাশীপুরের উদ্যানে উহা রক্ষা করিয়া তাঁহার নিত্যপূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করেন। ৮ই ভাদ্র, রবিবার, জন্মাষ্টমীর দিন ঐ অস্থিপূর্ণ তাম্র কলসী প্রভুর সমগ্র শিষ্য ও সেবকমণ্ডলী মিলিয়া ১১নং মধুরায়ের গলি, সেবক রামচন্দ্রের শ্রীঅঙ্গিনা হইতে মস্তকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া যোগোদ্যানস্থ সেই তুলসী কাননের মধ্যবর্ত্তী তুলসী বৃক্ষের স্থল খনন করিয়া তন্মধ্যে সমাহিত করেন। সেইদিন হইতে তথায় নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী তথায় বাস করিয়া তাঁহার সেবা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে স্থলে একদিন ভক্তগণ সঙ্গে তুলসী বৃক্ষমূলে প্রণত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! আজ সেইস্থলে সমগ্র জগতের মস্তক তাঁহারই শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে লুণ্ঠিত হইতেছে! আর এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তিনি যে বলিয়াছিলেন, "যেন এইরূপ একটা বাগানে আমি আছি" ইহাওত ঠিক হইয়াছে—দেখিতেছি। প্রভু এখন এই পুণ্যভূমি যোগোদ্যানে নিত্যলীলারূপে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান।

জন্মাষ্টমীর দিন এই উদ্যানে অতি সমারোহে মহা মহোৎসব হয়। সহস্র সহস্র অগণন মানব "জয় রামকৃষ্ণ" নামে উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, আর সকলে মিলিয়া মহানন্দে প্রভুর প্রসাদ পায়। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! যেন নবোজ্জল প্রভায় শ্রীশ্রীজগন্নাথধাম।

নিম্নলিখিত দিবস কয়টি যোগোদ্যানে পর্ব্বদিন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ;—

ফুলদোল, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, বিজয়া, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, ১লা জানুয়ারী, সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনী দ্বিতীয়া এবং দোলপর্ব্ব প্রভৃতি।

যোগোদ্যান—প্রভুর শান্তি-তপোবন। ত্রিতাপতপ্ত শোকাগ্নি-দগ্ধ শত শত নরনারী নিত্য তথায় আসিয়া তাঁহাদের প্রাণ জুড়াইতেছেন। আবার তত্ত্বপিপাসু ধর্ম্মাত্মাগণ তথায় আসিয়া প্রভুকৃপা লাভ করিয়া—আপন অভীষ্ট দেবতা চিনিয়া—আত্মজ্ঞান লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া, ভব পারাপারের অকূল-কূল-কণ্ডারীকে পাইয়া—আপন জানিয়া, নিশ্চিন্তমনে মহানন্দ উপভোগে উপযোগী হইয়া, জনম-জীবন ধন্য করিতেছেন।

পাঠক পাঠিকা! আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আজও এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করেন নাই—তাঁহারা একবার ইহা দর্শন করিয়া, প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক লুটাইয়া, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা করিয়া লউন। দিন থাকিতে, সময় থাকিতে, অন্তিম কালের পথের সম্বল করিয়া লইয়া ধন্য হউন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাতীর্থে একবার গড়াগড়ি দিয়া—মুখে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া—ইহকাল পরকাল—একাকার করিয়া লউন।

যোগোদ্যান! তোমার পুণ্যভূমির ধূলিকণা হইবার ভাগ্যও কি কখন এ দীন লেখকের ভাগ্যে ঘটিবে!!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে, ১৯শে ভাদ্র, বুধবার, জন্মাষ্টমীর দিন, সপ্তবিংশ বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শত শত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়, সহস্র সহস্র নরনারী উৎসব স্থলে উপস্থিত হইয়া "জয় রামকৃষ্ণ" নামে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের বংশাবতংসগণ উপস্থিত থাকিয়া সেবকগণের প্রাণে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিয়াছেন। প্রায় দশ সহস্র নরনারীকে ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবের কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

পতিতপাবন নামটী শুনে, বড় ভরসা হয়েছে মনে।
(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে)
আমি হইনা কেন যেমন তেমন, স্থান পাব রাঙ্গা চরণে॥
(ঠাকুর তুমিত ভরসা আমার)
ঠাকুর আমার মতন সাধন হীনে, স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে॥
(বড় দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
ওহে দীন দয়াল, আমি পতিত কাঙ্গাল,
(তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে) (শরণ লয়েছি তাই চরণ তলে)
আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ না লবে জগজ্জনে ;
(বল কোথা যাব কাঁর মুখ চাব)
(ঠাকুর, পতিতের আর কেবা আছে)
তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে॥
তোমার নাম ভরসা, দীনের পূরাও আশা,
(শুনি তোমা হ'তে তোমার নামটী বড়)
ওহে অধমতারণ, অনাথশরণ, দয়া কর নিজগুণে॥
(কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
এস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ ব'স হৃদি-পদ্মাসনে॥
(আমার হৃদয় আসন শূন্য আছে)
(আমরা বড় আশে এসেছি হে) (আজ তোমার দেখা পাব ব'লে)
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকমণ্ডলী)

—০:*:০—

(২)

এস এস সবে মিলি চলি আজি যোগোদ্যানে।
(তথা) দয়ালঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু নিজগুণে॥
(ঠাকুর চিরদুর্ল্লভ অমূল্যধন প্রেম বিলায় আজ জনে জনে)
কাঙ্গাল যে যত চায়, প্রেম সেই তত পায়,
(তারে শতধারে ততই বিলায়) (আহা ! এমন দয়াল কে আর কোথায়)
ওকে নিবি তোরা, আয় রে ত্বরা, সেই প্রেম-বিভোরা সন্নিধানে॥
(জয় প্রেমদাতা রামকৃষ্ণ বোলে)

পাপী তাপী সাধু জ্ঞানীর বিচার, নাই তাঁর, সে যে করুণা-পাথার,
তাঁর সবাই নিজ জন, সদানন্দ মন, ভালবাসা ভরা প্রাণে প্রাণে ॥
(সে আপন ভুলে আপন বিলায়)
আবার প্রভুপাশে, শ্রীরাম ভাষে হেসে,
(তোরা আয় চলে আয় অনায়াসে—আমার প্রভুপাশে)
(আমি সবার দায়ে আছি দায়ী—আমার প্রভুপাশে)
তোদের নাই কোন ভয়, বল জয় জয়, রামকৃষ্ণ জয় বদনে।
বল রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল বদনে ॥
বড়বাজার, রসাপটী নাম সঙ্কীর্ত্তন,
শ্রীগোষ্ঠবিহারী পরামাণিক।

(৩)

মানস কুসুম করিয়া চয়ন, এসেছে দীন ভকত-কুল।
শোণিত চন্দনে মিশায়ে আজিকে পূজিতে নাথ পদ রাতুল ॥
ভাব-শ্বাস ধূপ যাইতেছে বোয়ে, নয়ন দৃষ্টি জ্বলে দীপ হোয়ে,
জয় রামকৃষ্ণ মধুনাম লোয়ে, গাহিছে রসনা হোয়ে আকুল ॥
সদা অশ্রু-জল সম্বল যাদের, জাহ্নবী যমুনা কি কাজ তাদের,
ধর ধর নাথ নীর হৃদয়ের, ধোয়াইব আজি চরণ-মূল ॥
বাসনা ভস্মাগ্নি দিই জ্বালাইয়ে, বিবেকের ধুনা তাহে ছড়াইয়ে,
প্রেমের বাতাস ফুঁয়ে ফুঁয়ে দিয়ে, শুদ্ধাভক্তি হোক্ গন্ধ গুগ্‌গুল্ ॥
(আজি) দক্ষিণা দিয়ে নশ্বর দেহ, ভুলে যাও সবে সংসার গেহ,
থেক না থেক না আজি দীন কেহ, মহোৎসবে মুছো মহা মন-ভুল ॥
জয় জয় জয়, জয় রামকৃষ্ণ, জয় হে বিতর চরণ ধূল,
জয় জ্যোতির্ম্ময় নমঃ নারায়ণ, বাঞ্ছিত প্রিয় নাথ অতুল ॥
গড়পার সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীনিরঞ্জনকুমার সরকার।

বিগত ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার, রেঙ্গুনস্থ গুজরাটী ভদ্রমহোদয়গণ ৬১ নং সিকামংটুলি ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত বাবু লছমিনারায়ণ বগলা মহোদয়ের ধর্ম্মশালায় শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের সমাধি দিনের স্মৃতিরক্ষার্থে উক্তস্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০ শত গুজরাটী সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং মান্দ্রাজী রামকৃষ্ণ-সমিতির সভ্যগণ ও রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতির সেবকগণ উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উৎসবস্থলে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলাচরণ, ভজন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী, উপদেশ এবং প্রার্থনা প্রভৃতি গুজরাটী ভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় "সন্ন্যাসীর গীতি" পাঠ, এবং ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ বক্তৃতাদি দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

—•:•:•—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

আশ্বিন, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯৯ পৃষ্ঠার পর)

৫৮২। লীলা অবলম্বন না করলে নিত্য-ভাব উপলব্ধি করবার উপায় নাই। স্থূল; সূক্ষ্ম, কারণ, ও মহাকারণ, ক্রমশঃ এইরূপ বিচার দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ হয়।

৫৮৩। নিত্যে উঠে যে আনন্দবিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়েছে; বিলাতে গিয়ে কুইনকে দেখে এসে, যদি কেউ কুইনের কথা বলে, তার ঠিক ঠিক বলা হয়।

৫৮৪। ঋষিরা রামকে স্তব করবার সময় বলেছিলেন, হে রাম! তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তবে লীলা করবার জন্য মায়া আশ্রয় করেছ ব'লে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে। এই নিত্য ও লীলাভাব যে বুঝতে পারে সেই ঠিক জ্ঞানী।

৫৮৫। আস্তাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তবে সেখানে ছোলাগাছই হয়, তেমনি বিষয়ীদের ঔরসেও ভাল ভাল ভক্ত জন্মগ্রহণ করে থাকে।

৫৮৬। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন।

৫৮৭। বিকারের রোগীর যদি অরুচি হয়, তবে তার আর বাঁচবার আশা

থাকেনা, কিন্তু যার মুখে রুচি আছে, তার বাঁচবার আশা ষোল আনা ; তেমনি যে লোকের ঈশ্বরের নামে রুচি আছে, তার সংসার বিকার কাটবেই কাটবে ; তার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হবেই হবে।

৫৮৮। মন্ত্র অর্থাৎ মন তোর। তোমার মনের উপরে সব নির্ভর করছে।

৫৮৯। যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।

৫৯০। যদি উঁচু হতে চাও তবে আগে নীচু হও। নীচু জমি না হলে চাষ হয় না, ফসল ফলে না।

৫৯১। এই দেহ মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার রাখতে নাই। অন্তরে সর্ব্বক্ষণ জ্ঞান-দীপ জেলে দাও।

৫৯২। যার জ্ঞান চৈতন্য হয়েছে, সে ঈশ্বরীয় কথা বই আর কোনও কথা কয় না, বা তার আর অন্য কোনও কথা বলতে বা শুনতে ভাল লাগেনা।

৫৯৩। যে বনে বাঘ প্রবেশ করে, সে বন থেকে অন্য অন্য জানোয়ার তার ভয়ে পালিয়ে যায়, তেমনি যে অন্তরে ঈশ্বরের অনুরাগ এসেছে, সে হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি সব থাকতে পারে না, পালিয়ে যায়।

৫৯৪। ব্যাঙের মুণ্ডু পুড়িয়ে কাজল করে চোখে দিলে চারিদিকে সাপ দেখা যায়, তেমনি যার ঈশ্বরানুরাগ জন্মেছে, সে সকলদিক হরিময় দেখে।

৫৯৫। আতুঁড় ঘরের ধুলো আর আস্তাকুঁড়ের ভাঙ্গা হাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, বাজীকর তার চোখে ভেল্কী লাগাতে পারে না, সে ঠিক ঠিক সব দেখতে পায়। তেমনি যার জ্ঞান হয়েছে, তার মনে মায়ার ভেল্কী লাগে না, সে কামিনী-কাঞ্চনে মজেনা, সে ঈশ্বর-পাদপদ্মে মন রেখে দেয়।

৫৯৬। কেউ কেউ অনেক কষ্টে জল সেঁচে ক্ষেতে এনে চাষ করে, আবার কারু ক্ষেত বৃষ্টির জলে ভেসে যায়, আর সেঁচে জল আনতে হয় না। প্রথমটী সাধকের ভাব, আর দ্বিতীয়টী কৃপাসিদ্ধের অবস্থা।

৫৯৭। বোজা কোয়ারা যো-সো করে একবার ছাড়িয়ে দিতে পারলে ফর্ ফর্ করে জল বেরুতে থাকে, তেমনি যে সব নিত্যজীব সংসারে এসেছে, তারা একবার হরিপ্রসঙ্গ শুনলে, তাদের ভিতরকার অনুরাগ প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি উথলে উঠে, আর সংসারে মজেনা।

৫৯৮। বদ্ধঘরে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করলে, যেমন সে আলোকে কোনও কাজ করা চলেনা; তেমনি বিষয়ী লোকের সময়ে সময়ে যে ঈশ্বর-জ্ঞান দেখা যায়, সে জ্ঞানে কোনও ফল হয় না।

৫৯৯। একাগ্রতা ভিন্ন কোনও কাজ সফল হয় না। কুঁয়া খুঁড়তে হলে, এক জায়গায় রোক ক'রে খুঁড়তে হয় তবে জল ওঠে। এখানে একটু, সেখানে একটু ক'রে খুঁড়ে বেড়ালে, কুঁয়া খোঁড়াই হয় না।

৬০০। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে সেই রকম ফল পায়।

৬০১। আমরা যে 'আমি' 'আমার' করি, ঠিক ঠিক বিচার করে দেখলে সেই 'আমি' আত্মা বই আর কেউ নয়।

৬০২। কালের হাতে কারু এড়ান নাই। সেই কালের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হও। ঈশ্বরের নামরূপ অস্ত্র গ্রহণ কর।

৬০৩। শোকে মানুষ জর জর হয়ে যায়। রাবণ বধ হলে, লক্ষ্মণ তাঁকে দৌড়ে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, সব হাঁড়গুলি ফোঁপরা হয়ে গেছে। তা দেখে লক্ষ্মণ রামকে বল্লেন যে, তোমার বাণের এমনি মহিমা, যে রাবণের হাঁড়ে হাঁড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। তা শুনে রাম বল্লেন যে, ও সব ছিদ্র আমার বাণে হয়নি, পুত্রশোকে রাবণের শরীর ঐ রকম হয়েছে।

৬০৪। গৃহ, পরিবার, সন্তান, সংসার, সবই দুদিনের জন্য—সবই অনিত্য। তাল গাছে তাল হয়েছে, দু'চারটে খসে পড়লো, তার জন্যে আর দুঃখ ক'রে ফল কি? তাঁর সংসার, তিনিই ভাঙ্গচেন, গড়ছেন, এই জেনে সব মনটা তাঁকে দাও। শোক দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবে।

৬০৫। ভগবান তিনটী কাজ করচেন—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সুতরাং মৃত্যু আছেই। মৃত্যুর হাত থেকে কারো নিস্তার নাই।

৬০৬। মানুষ বিদেশে আসে কাজ করবার জন্যে, রোজগারের জন্যে, তেমনি জীব সংসারে কর্ম্ম করতে—রোজগার করতে এসেছে। সাধন ভজন ক'রে, ঈশ্বর-পাদপদ্ম লাভ ক'রে, স্বধামে চলে যাবে।

৬০৭। স্যাকরারা যখন সোণা গালায়, তখন হাঁপর, পাখা, চোং, এই সব দিয়ে একসঙ্গে বাতাস ক'রে আগুণটা গরগরে করে নেয়, যাতে শিগ্গির সোণাটা গলে। যখন সোনা গালান হয়ে যায়, তখন বলে, নে এইবার তামাক সাজ্। সাধনের সময় এইরূপ সব মনটা এক জায়গায় করে, রোক করে, সাধন করতে হয়। ইষ্টলাভ হলে তখন পরমানন্দ।

৬০৮। ভক্তের আপন ভাবে নিষ্ঠা বড় দরকার। যেমন সতীর পতিতে নিষ্ঠা।

৬০৯। হনুমানের ভারি নিষ্ঠা। সে দ্বারকায় এসে বল্লে আমি রামসীতা

দেখবো। কৃষ্ণ তখন রুক্মিণীকে বল্লেন, তুমি সীতা হয়ে বোসো, আমি রামরূপ ধরচি। তা না হলে হনুমানের হাতে রক্ষা নাই।

৬১০। বিভীষণের ভারি নিষ্ঠা ছিল। রাজসূয়যজ্ঞে নিমন্ত্রণে এলো, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেনা, কেবল হাত জোড় করে তাঁকে সম্মান জানালে। কৃষ্ণ বল্লেন "বিভীষণ, প্রণাম করো।" তখন সে কাতর হয়ে বল্লে, "প্রভু! রামরূপে যে আপনি এ মাথা কিনে নিয়েছেন, এতে তো আর আমার অধিকার নাই।"

৬১১। গোপীদের খুব নিষ্ঠা। গোপীরা দ্বারীর অনেক খোসামোদ করে মথুরার সভায় গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, কৃষ্ণ মাথায় পাগড়ী বেঁধে রাজা হয়ে বসে আছেন। তখন তারা হেঁটমুখ হয়ে, পরস্পর বলতে লাগলে, এ আবার কে? আমাদের সেই ধড়াচূড়া পরা কৃষ্ণ কই!

৬১২। ভগবানকে কে দেখতে চায়! এক মেয়ে মানুষ নিয়েই দুনিয়া পাগল হয়ে রয়েছে।

৬১৩। যে মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, ভগবান সে মনের গোচর হন, কিন্তু যে মনে বিষয় বুদ্ধি আছে, সে মনে তাঁকে বোঝা যায় না।

৬১৪। আমরা যে জিনিসকে যে অবস্থায় দেখছি, তার সেই অবস্থাটাই সত্য ও চিরস্থায়ী, এই যে ধারণা—একেই মায়া বলে।

৬১৫। সাধকের কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব থাকলে, কিছুতেই সিদ্ধাবস্থা লাভের আশা নাই।

৬১৬। কামিনীকাঞ্চন যেন আচার তেঁতুল। আচার তেঁতুলের নাম করলে রোগীর লাল পড়ে, তেমনি সংসারী লোকের কামিনী কাঞ্চনে দারুণ প্রলোভন। এই লোভ ত্যাগ করতে পারলে তবে ঈশ্বরে রতি মতি হয়।

৬১৭। সন্ন্যাসী এমন ঘরে ভিক্ষা করবে যে, যে ঘরে গেলে তাকে আর ঘরে ঘরে ঘুরতে হবেনা। অর্থাৎ সন্ন্যাসী, একমাত্র ভগবানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

৬১৮। যখন পুকুরে সোল মাছের ছানা হয়, তখন সেই ধাড়ি মাছটা ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে ছানাগুলিকে রক্ষা করে; কিন্তু যদি কেউ সেই মাছটাকে ধরে নেয়, তবে ছানাগুলিকে অপরাপর মাছে বা জন্তুতে খেয়ে ফেলে। এই রকম, যে সকল সংসারী জ্ঞানলাভ করেছে, তাদের সংসার ফেলে পালান

উচিত নয়, তা হলে তাদের সন্তানাদিকে কে প্রতিপালন করবে? এ রকম লোকের নির্লিপ্তভাবে সংসার করা উচিত।

৬১৯। সমুদ্রে জাহাজ পড়লে তরঙ্গের গতিতেই তাকে চলতে হয়, তবে যার ভিতরে কম্পাস আছে, তার দিক ভুল হবার ভয় নাই, কারণ কম্পাসের কাঁটা উত্তর দক্ষিণ মুখে চেয়ে আছে। সেই রকম, সংসারে এক তরঙ্গের পর আর এক তরঙ্গ আসছে, কিন্তু যার মন, কম্পাস হরিপাদপদ্মের দিকে চেয়ে আছে, তার ডুবে যাবার, বা বিপথে যাবার ভয় নাই।

৬২০। সংসারে থেকে যারা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখতে পারে, তারাই বীরভক্ত।

৬২১। যারা সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা ভগবানকে ডাকবে, এর আর বাহাদুরী কি? কিন্তু যারা সংসারে থেকে, সকল কাজ ক'রে, ভগবানের দিকে মন রাখতে পারে, তাঁকে স্মরণ করে, তারাই বীর সাধক।

৬২২। সরস্বতীর কৃপায় কালীদাস মহাপণ্ডিত হয়ে গেল, তেমনি ভগবানের দয়া হলে বদ্ধজীবও ঈশ্বরলাভ ক'রে ধন্য হতে পারে।

৬২৩। গরীবের ছেলে বড়-লোকের ঘরে বিয়ে ক'রে বা ঘরজামাই থেকে, একেবারে আমীরের মত হয়ে যায়, তেমনি ভগবানের দয়া হলে সংসারী জীবও মুক্ত হতে পারে।

৬২৪। অভ্যাস করলে একই মন দ্বারা সংসারের কাজও করা যায়, এবং ঈশ্বর সাধনও হয়।

৬২৫। ঘোড়ায় চড়া বড় কঠিন, কিন্তু যারা অভ্যাস করে, তারা অনায়াসে তার উপরে নৃত্য করে থাকে, তাকে নিয়ে কত খেলা করে, যেমন সার্কাসে করে।

৬২৬। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি ব্যবস্থা করতে হয়।

৬২৭। জ্বর হলেই কুইনাইন খাওয়ান যায়না, জ্বর পরিপাক পেলে খাওয়াতে হয়।

৬২৮। ফোঁড়া হইলেই তখনই তাকে কাটা যায় না, পাকলে, মুখ হলে, তখন কাটতে হয়।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

বৈষ্ণব-কবি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭৭ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ—দ্বিতীয় গোবিন্দ দাস। ইনি জাতিতে কর্ম্মকার। কিন্তু ভক্তি-বলে ও ভগবানের কৃপায় আজ ইনি ভক্ত ব্রাহ্মণেরও নমস্য। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' বৈষ্ণবসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ। এই মহাত্মা, ছায়ার ন্যায় মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, প্রেমাশ্রুজলে নিজে দ্রব হইয়া মহাপ্রভুর লীলা-কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহারই অমৃতময় ফল—কড়চা। কড়চার বর্ণনা অতি মধুর, মনোজ্ঞ ভাবময়,—অতিরঞ্জন-দোষ ইহাতে আদৌ নাই। বৈষ্ণব-সমাজ ও বঙ্গসাহিত্য কড়চাকারের নিকট চিরঋণী।

এক হিসাবে, এই সময় হইতে বঙ্গভাষা-প্রতিমার আকার ও গঠন আরম্ভ হইল। পরবর্ত্তী কবি ও লেখকগণ ক্রমে সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিতে ও সাজ-সজ্জা নির্ম্মাণ করিয়া পরাইতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে সে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এ সকলেরই মূলে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদকর্ত্তা-দের মধুর পদাবলী। বঙ্গের সেই আদি কবি—শ্রীজয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পুণ্যপ্রভাব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। যেন তিনটি স্রোতস্বতীর পুণ্যধারা—গঙ্গা যমুনা-সরস্বতী-রূপে একস্থানে সম্মিলিতা। শেষ এই যুক্ত-ত্রিবেণী মুক্ত-ত্রিবেণীতে পরিণত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মবশে, কুলুকুলুতানে সাগরে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা এক মহাযোগ।

এই যোগের মূলে যোগীশ্বর শঙ্কর 'সচ্চিদানন্দরূপ শিবোহং' রবে ভারত মাতাইয়াছিলেন; তাহারই ফলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-গ্রন্থ সকল রক্ষা পাইল; ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হইল, ব্রাহ্মণগণ আবার বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে পূজা করিতে লাগিলেন।

কালবশে আবার তন্ত্রশাস্ত্রের দুর্গতি ঘটিল। কুক্রিয়াসক্ত ভণ্ডদল, মার নামের দোহাই দিয়া, নানারূপ বীভৎস আচারে প্রবৃত্ত হইল। অমনি করুণার অবতার শ্রীভগবানের আসন টলিল। ভক্তবৎসল নবরূপ ধারণ করিয়া হরিবোল হরিবোল রবে আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার জন্য এই সোণার বাঙ্গালার

একটী পল্লীতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ সেই পুণ্যতীর্থ। সেই পুণ্যতীর্থে পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেব স্বগণ অন্তরঙ্গবৃন্দকে লইয়া—ভাবভক্তি-প্রেমের বন্যা ছুটাইলেন। সে বন্যা ক্রমে সমগ্র ভারত প্লাবিত করিল। ঠাকুরের বিভূতি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইল। কেবল জগাই মাধাই রূপ শত শত পতিত পাষণ্ড উদ্ধারেই সেই ঐশ্বরিক বিভূতির পর্য্যাবসান হয় নাই,—বাঙ্গালীর ভাষা-জননী এই শুভক্ষণ হইতেই যেন প্রাণ পাইল। ফলতঃ এই সময় হইতেই মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গগণ দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ বিকাশ হয়। তাঁহারা প্রধানতঃ আপনাদের ইষ্টদেবতার লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে করিতে এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এক হিসাবে ইহাই বাঙ্গালা ভাষার আদ্যকাল। বাঙ্গালা সাহিত্যে ভক্তির প্রবাহ তাই আজও এত অধিক। ভক্তিধর্ম্মের সেই সুমধুর ফল—বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য।

যুগ-অবতার অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গভাষার এই প্রতিপত্তি ও প্রসার। কেন এমন হয়, প্রসঙ্গক্রমে স্থানান্তরে ইহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এক্ষণে এইটুকু বলিয়া রাখি, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে যেমন ভক্তের প্রাণ-চকোর উল্লসিত ও উৎফুল্ল,—বঙ্গভাষা-জননীও তেমনি শচী-মাতার ন্যায় শ্রীভগবানকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিতা ও সর্ব্বজন-সমাদৃতা হইয়া রহিলেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য যে আজ সভ্যজাতিরও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহার মূলে কি?—নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি,—ভক্ত-ভগবান্-ভাগবত-সম্মিলিত—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভক্তি। এই ভক্তি কখন হরিনামে, কখন নাম-গানে, কখন বা মা-নামে এত মাতিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বঙ্গসাহিত্যের এই ক্রমবিকাশ-চিত্রে, যথাস্থানে, আমরা এই ঐশ্বরিক ভক্তিতত্ত্বের কিছু কিছু আলোচনা করিব। ফলতঃ, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল হইতে বঙ্গসাহিত্যে যে কতশত ভক্তিগ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ভক্ত গোবিন্দের কড়চা, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, পদকল্পলতা, ঠাকুর নরোত্তমদাসের অতুলনীয় প্রার্থনা ও পদাবলী—সকল গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়; অতি সংক্ষেপে এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথাও এখানে বলিব। যুগ-অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি ক্ষণজন্মা মহাত্মাও বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক

ও দার্শনিক রঘুনাথ ও স্মার্ত্তকুল-চূড়ামণি স্বনামধন্য রঘুনন্দন ঐ দুই মহাত্মা। ধর্ম্মের সংস্কার, ভাষার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ত সমাজবন্ধনেরও প্রয়োজন চাই? তাই শ্রীচৈতন্য-যুগের এই অদ্ভুত সম্মিলন,—জীবের কোন অভাবই আর রহিল না। এমনই হয়,—ভগবানের কৃপায় এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন যাহা বলিতেছিলাম:—'কড়চায়' ভাগ্যবান্ কবি গোবিন্দদাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলামৃত বর্ণনা—প্রকৃতই একটী উপভোগের জিনিস। নির্জ্জনে ভাবের কাণ লইয়া এই মধুর গীতি শুনিতে সাধ যায়। আজি চারিশত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিককাল হইল, ভাগ্যবান্ চিত্রকর তাঁহার উপাস্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গের সাধন-মূর্ত্তিটি কি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন;—

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥
একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে।
ভিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন।
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥
ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজ-রাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥"

সপ্তম,—প্রেমদাস। ইঁহার আসল নাম—পুরুষোত্তম মিশ্র। গুরুদত্ত নাম—প্রেমদাস। এই প্রেমিক কবিও স্বপ্নযোগে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেন। 'বংশী শিক্ষা,' 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ গ্রন্থ ইঁহার রচিত। ইঁহার একটী পদ:—

"কত কোটি চন্দ্র জিনি, উ জার বদনখানি, মল্ল ছাঁদে পরে নীলধটী।
কর পদ সুধাতুল, জিনি কোকনদ ফুল, বিনোদরূপের পরিপাটী॥" * * *

অষ্টম,—নরহরি। ইঁহার রচিত 'ভক্তি-রত্নাকর' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত 'গোবিন্দ-চিন্তামণি' নরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাস চরিত প্রভৃতি গ্রন্থও ইঁহার আছে। ইঁহার একটী পদ এই,—

"নাচত নটবর গৌরকিশোর। অভিনব ভঙ্গি ভুবন মন ভোর।
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ অনুপাম। হেরইতে মুরছত কত কত কাম॥" * * *

নবম,—নৃসিংহদেব। ইঁহার রাজা উপাধি ছিল। লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রও [illegible] বাগ্দেবীর বন্দনা করিতেন। নৃসিংহদেব রচিত একটি পদ এই,—

"নবনীরদ নীল সুঠাম তনু। শ্রীমুখাকৃত ঝলমল চাঁদ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তলবদ্ধ চূড়া। ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা॥" * * *

দশম—আউলিয়া মনোহরদাস। প্রবাদ, মনোহর দাস সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ইঁনি সখাভাবে ভজনা করিতেন। ইঁহার একটী পদ এই,—

"শ্যামের মুরলী, হৃদয় যুবলী, করিলি সকল নাশ।
মনোহর মিনতি, না শুন অবতি, বাড়িতে করহ আশ॥" * * *

একাদশ,—লালদাস বাবাজী। সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তমাল" গ্রন্থ ইঁহার রচিত। বৈষ্ণব সমাজে 'ভক্তমাল' গ্রন্থ কিরূপ আদৃত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বহু-সংখ্যক ভক্তের চরিত্র কথা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ইঁহার একটী পদ এই,—

"রাধাকুণ্ড তীরে কুঞ্জ, কল্পলতিকা পুঞ্জ, পুষ্প শ্রেণি পরম সুন্দর।
সৌরভে আমোদ অতি, নানা বর্ণ নানা ভাতি, ঝাঁকে ঝাঁক গুঞ্জরে ভ্রমর॥"

এইরূপ শত শত বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্য অলঙ্কৃত। সেগুলি সমস্ত একত্র করিলে যে কত বড় গ্রন্থ হয়, বলা যায় না। এই সব কবির প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ও তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। সকলেরই হৃদয়-উদ্যানে ভক্তির পারিজাত প্রস্ফুটিত। সে পারিজাতের স্বর্গীয় সৌরভে মনপ্রাণ পুলকিত হয়।

মাধবীদেবী প্রভৃতি কয়েকটী ভক্তিমতী স্ত্রী কবিও এই সময়ে পদ রচনা করিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি করেন। কিন্তু ইঁহারও বহু পূর্ব্বে—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুকাল অগ্রে, চণ্ডিদাসের সেই সাধিকা নায়িকা রজকী রামমণির পদও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠক দেখিবেন, প্রাচীন বঙ্গেও স্ত্রী-কবির অভাব ছিল না। রামমণির পূর্ব্বেও যে, কোন

পুণ্যবতী রমণী লেখনী ধারণ করেন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। স্ত্রী-কবিদিগের এই ভক্তিভাব ও রচনাভঙ্গি আজিকার দিনে অনেক পুরুষ কবিও আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারেন।

গৌরদর্শনবঞ্চিতা, অনুতপ্তা, ভক্তিমতী মাধবী দেবী একটী গানে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

এই দুই ছত্রে কবি হৃদয়ে কি গভীর মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! মাধবী দেবীর রচিত একটী পদও এখানে উদ্ধৃত করিলাম;—

"কলহ করিয়া ছলা, আগে পিছু চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
যতেক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়।

এইরূপ রায়শেখর, প্রেমানন্দদাস, উদ্ধবদাস, পরমেশ্বরদাস, আত্মারাম দাস, নরহরি দাস, দেবকীনন্দন দাস, ভক্তশ্রেষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম দাস প্রভৃতি মহাজনেরা প্রাচীন কাব্যক্ষেত্রে যে সুধাবৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। সেই সকল বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। ভক্তচূড়ামণি—ঠাকুর নরোত্তম দাসের দুইটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইব, তাঁহার হৃদয়খানি কি অপার্থিব প্রেমে গঠিত। পরশমণি স্পর্শে, যেন তিনি খাঁটী সোণা হইয়াছেন।

প্রথম, গৌরাঙ্গ-প্রেমে-মাতোয়ারা ভক্ত কবির হৃদয়-অভিব্যক্তি;—

"শ্রীগৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার পদ সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌর-মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেই ডুবে,
সেবা রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

দ্বিতীয়, কবির অতুলীয় প্রার্থনা,—কি অপূর্ব্বভাবে ঝঙ্কৃত হইতেছে দেখুন ;—

"হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দ হইয়া।
বাহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, যুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি,
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব॥
মাধবী কুঞ্জের পরি, তাহে বসে শুক সারী
গায় সদা রাধাকৃষ্ণের রস।
তরুতলে বসি তাহা, শুনি পাসরিব দোঁহা,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করে এই অভিলাষ,
এমতি হইবে কত দিনে॥"

ঠাকুর নরোত্তম দাস প্রকৃতই ভক্ত চূড়ামণি সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার

রচিত প্রার্থনার খেদোক্তিগুলি বঙ্গভাষার পরশমণি। প্রকৃতই শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে, আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত এ মণি যিনি স্পর্শ করিবেন, তিনি খাঁটী সোণা হইবেন।, শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা বলিলাম এই জন্য যে, লোহায় ময়লার মাটী থাকিলে চুম্বক সহসা তাহাকে ধারণ করে না। ভক্তিপথের যিনি পথিক,—ভক্তি রসাস্বাদনে যিনি উদ্‌গ্রীব, অথচ সংসাহিত্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা যাঁর আছে, তিনি যেন নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পাঠ করেন,—মনের ময়লা কাটাইবার এমন সহজ ঔষধ প্রাচীন পদাবলীতে আর অতি অল্পই আছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক, "অমৃতবাজার পত্রিকার" স্বনামধন্য সম্পাদক, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার রচিত 'নরোত্তম চরিত্রের' এক স্থলে লিখিয়াছেন —

"সংসারে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া যে কঠোর ভজন সাধন করা যায়, ইহার উদাহরণ স্থলে ঠাকুর মহাশয় রহিলেন। ইনি রাজার ছেলে, পিতা রাজা, মাতা রাণী, উভয়ে বর্ত্তমান। রাজধানী তাঁহার বাসস্থান। এরূপ স্থলে থাকিয়া বিষয় হইতে অন্তর থাকা অতি কঠিন,—ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন।

'ঠাকুর মহাশয়ের নূতন যৌবন। দার পরিগ্রহ করিলেন না। যাঁহারা এরূপ ব্রহ্মচর্য্য রাখেন, তাঁহারা সমাজের প্রলোভনের মধ্যে না থাকিয়া, বনে বাস করেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় গৃহে রহিলেন, তবু তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারিল না।"

ব্যাপার বুঝুন! সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত রাজপুত্র নরোত্তমের কি গভীর বৈরাগ্য! সংসারে থাকিয়াও তাঁহার কি কঠোর সন্ন্যাস! বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমালোচনার এক স্থানে বলিয়াছি, সুখ-সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেই "সুখের কবি" বা দারিদ্র্য-দুঃখের সংস্পর্শে থাকিলেই "দুঃখের কবি" হয় না,—প্রকৃতি ও সংস্কারভেদে এটী হইয়া থাকে। এই নরোত্তম প্রভুর পরিচয়ে তাহা দেখুন না? এই মহাপুরুষের অন্তিম জীবন-কাহিনী আরও চমৎকার, আরও শিক্ষাপ্রদ! , ভক্ত ও ভাবুক পাঠককে আমরা এই মহাত্মার জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত শিশিরকুমারই সে পুণ্যচরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

সেবক—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

আবাহন।

এস প্রভো, দেখা দাও। কত জন্মজন্মান্তরের আকুল পিয়াসা লইয়া ঘুরিতেছি। এস, দেখা দিয়া তৃষিত হৃদয় শীতল কর। সংসার মরুভূমের মরীচিকায় পড়িয়া বৃথা ক্লান্ত হইয়াছি। স্নিগ্ধ বারির আশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর চলৎশক্তি নাই। তবু যে তৃষ্ণা—সেই তৃষ্ণা। এস প্রভো, আর ঘুরাইও না।

বহুদিন তোমা ছাড়া হইয়াছি। খেলিতে আসিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। কি ছিলাম জানি না, কি হইয়াছি জানি না, কি হইতে চলিয়াছি, তাহাও জানি না। প্রভো, প্রভো, এস। তুমি ভিন্ন এ সঙ্কটে আর কাহার মুখ চাহিব? কে অপরের জন্য ভাবিবে? কে নিজের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া অপরের বোঝা স্কন্ধে লইবে? এস, আর লুকাইয়া থাকিও না।

মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত চন্দ্রের ন্যায় মাঝে মাঝে মাত্র তোমার আভাস পাইতেছি। এস প্রভো, আর মায়ার অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকিও না। প্রিয়-দর্শন, আর আলো, ছায়া, সুখ দুঃখ, হাসিকান্নার মধ্যে ফেলিয়া রাখিওনা। প্রভো, আর যে খেলিতে পারি না। খেলা ভাঙ্গিয়া দাও। যাহারা চাহে, তাহাদের খেলাও। প্রাণ ভরিয়া খেলাও। তাহারাও আনন্দে থাকুক, তুমিও আনন্দে থাক। কিন্তু আমায় আর ভুলাইও না, প্রভো।

আমি কে—বলিতে পার? জান ত বলিয়া দাও। জান নাই কি? তবে আর লুকাইয়া রাখিও না। দোহাই তোমার, বল আমি কে? শুনিতে পাই—তুমি আমার আপনার হইতেও আপনার। তবে এ বিড়ম্বনা কেন প্রভো? কেন এ সন্দেহ প্লাবনে আমায় ডুবাও? এস, আমার অজ্ঞানান্ধকার নাশ কর। জ্ঞানের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে, হৃদয়কন্দর উদ্ভাসিত করিয়া উদয় হও।

কেন প্রভো তোমায় দেখিতে পাইনা? তুমি না নিকট হইতেও নিকটতর? তুমি না ঘটে, পটে, জীব, জন্তুতে, জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তরে, বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান? তবে আমার এ অন্ধতা কেন প্রভো? তবে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম তোমার সন্ধান পায় না কেন? মনই বা ধারণা করিতে পারে না কেন? বুঝিয়াছি, তোমার ইচ্ছা নয় যে দেখা দাও। তোমার ইচ্ছা নয় যে এ সাধের খেলা ভাঙ্গিয়া যায়। ইচ্ছা নয় যে এই মধুর লুকাচুরি, এই আনন্দের উৎস থামিয়া যায়। তাই কাছে থাকিয়াও তুমি দূরে, অন্তরে রহিয়াও তুমি অন্তরালে। এস প্রভো, তোমার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও। সংসারের

জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া, শোক মোহ ঘুচাইয়া, তিমিররাশি অপনয়ন করিয়া, এস প্রভো, তোমার সান্নিধ্যে লইয়া যাও। আর যেন কখনও বিচ্ছেদ না হয়।

না, তা বুঝি হইবার নয়। নতুবা কেন মন তোমার সেই মুনি-যোগীবাঞ্ছিত চরণরাজীবের অভিলাষী হয় না? কেন সুধা ছাড়িয়া বিষগ্রহণে লালায়িত? কেন অমরত্ব ফেলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গনে অগ্রসর? লীলাময়, লীলার অবসান তোমার বুঝি ভাল লাগে না? সন্তানের হাস্যোচ্ছুরিত আননে বয়োগাম্ভীর্য্য বুঝি পিতার নয়নাভিরাম হয় না? তাই পিতা তুমি সন্তানকে চিরদিন বালকই রাখিতে চাও। তবে তাহাই হউক, প্রভো, তাহাই হউক। দাও সেই বালকের সরলতা, সেই বালকের নির্ভর, সেই বালকের পবিত্রতা, যাহার স্পর্শে কঠিন কোমল হয়, খল সাধু হয়, মরুভূমি শস্যশ্যামল হয়। দাও সেই বালকের মান অপমানরাহিত্য, দাও তাহার সেই জাতিকুল, লজ্জা, ঘৃণা বর্জ্জনতা। আমায় বালকের মত অষ্টপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত কর। তবেই ত জানিব তুমি আমার আপনার।

না। মিছা কাঁদিয়া কোন ফল নাই। তুমি ন্যায় মঞ্চে আরোহণ করিয়া দয়া দাক্ষিণ্য বিসর্জ্জন দিয়াছ, তোমার অনুযোগ বৃথা। সময় না হইলে বৃক্ষে কুল ধরে না। সময় না হইলে ফুল ফলে পরিণত হয় না। সময় না হইলে সংকল্প প্রসবোন্মুখ হয় না। তাই তুমি বসিয়া আছ। নীরবে, অনন্ত সহিষ্ণুতার সহিত, আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছ। আমি আসিব বলিয়া উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছ—কবে আমার সময় হইবে, কবে তুমি আমার সহিত মিলিতে পারিবে! তুমি নিজের মায়ায় নিজে মুগ্ধ হইয়াছ। নিজের বিধানে নিজে আবদ্ধ হইয়াছ; তাই তুমি ইচ্ছা থাকিলেও দেখা দিতে পারিতেছ না।

না, তাই বা কেন? তোমাতে ত সকলই সাজে। জীবের পক্ষে সাধ্য অসাধ্য সম্ভব। তোমাতে ত সকলই সাধ্য, অসাধ্য কিছুই নাই। তুমিই না সোনাকুলের গাছে লাল ফুল ফুটাও, মূককে বাচাল কর, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাও? তবে এই সামান্য কাজে এত চাতুরী, এত ছল, এত অশক্তিভাণ কেন প্রভো? তোমার ইঙ্গিতেই না মায়া-নটী বিচিত্র অভিনয়ে ব্যাপৃতা? তুমিই না এই জড়বৎ প্রতীয়মান জগতের অন্তর্য্যামী চৈতন্য? তোমারই আজ্ঞায় না বায়ু বহে, সূর্য্যকিরণ দেয়? তুমিই না শমনেরও শমন? তবে আর নয়, প্রভো, আর নয়। সাকাররূপে হউক, নিরাকাররূপে হউক, সগুণরূপে হউক, নির্গুণরূপে হউক, ভিতরে হউক, বাহিরে হউক, যেরূপে পার, এস দেখা দাও।

কাহাকেও জানাইওনা। চুপে চুপে, নিভৃতে দেখা দাও। কোন জনপ্রাণী যেন জানিতে না পারে। আমি বিধি নিষেধ বুঝিনা। তুমি গড়িয়াছ, ভাঙ্গাও তোমার হাতে। তবে আর কেন ভুলাইয়া রাখ? স্বপ্নের ন্যায় মায়ারও অবসান হউক। স্বপ্ন ত চিরকাল থাকে না।

তুমি আসিতেছ; কতবার আসিয়াছ; আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই। সে দোষ আমারই, তোমার নয়। আর একবার আইস, এবার ঠিক চিনিব। আশীর্ব্বাদ কর যেন চিনিতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমারই কৃপায় তোমার মায়াবরণ ভেদ করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর যেন হে ঐন্দ্র-জালিক, তোমার ইন্দ্রজাল আর আমার চক্ষে ধূলা না দেয়। হাঁ আশীর্ব্বাদ চাহি, বরে প্রয়োজন নাই। ও যাহারা চাহে তাহাদের দিও। যাহাদের পর রাখিতে চাও, তাহাদেরই বর দিয়া ভুলাইও। আমি পর নহি। পর হইতেও চাহি না। আমি ভিক্ষার্থী নহি—নগদ বিদায়ে আমায় ভুলাইতে পারিবে না। তোমারই কৃপায় বুঝিয়াছি, সেইজন্যই চাহিতে আসিয়াছি—দাও, আমার পিতৃধন দাও। দাও সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দাও, আমার জিনিষ, আমার প্রাপ্য আমায় ফিরাইয়া দাও। মায়াধীশ এ মায়ার সংহার কর। দেখাও যে তুমি আমি এক—অভেদ। দেখাও যে কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই, হইবার নহে। দেখাও যে আমরা পিতাপুত্রে একসত্ত্বা, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

সন্তান যাহা চায় তাহার শতগুণ পায়। চাহিবার পূর্ব্বেই পায়। পিতা ত তাহার চাহিবার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি কি সন্তানের হৃদ্গত ভাব জানেন না? তবে প্রভো, আর ছলনা করিওনা। তর্কে আর আমার উদ্দেশ্য ভুলাইয়া দিও না। তোমায় ত তর্কে পাওয়া যায় না। তবে দাও বিশ্বাস, দাও, প্রভো, সেই বালকের বিশ্বাস, যাহাতে সাগর গোষ্পদ হইয়া যায়, পর্ব্বত সর্ষপ তুল্য হয়। দাও সেই বালকের অকুতোভয় তেজ, দাও তাহার সেই অকপট প্রেম। জয় ভাগবত-ভক্ত-ভগবানরূপী! তোমাকে নমস্কার, জয় গুরু কৃষ্ণ-বৈষ্ণবরূপী তোমাকে নমস্কার।

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

মা আসিতেছেন।

মেনকার মন কেমন করছে, কন্যা প্রাণের গৌরীকে অনেক দিন দেখেন নাই। কি করে একটীবার দেখতে পাবেন তাই ভাবছেন। আর গিরিরাজকে অনুনয় না করে থাকতে পারছেন না। তাই কেঁদে কেঁদে বলছেন :—

"গিরিবর!

আর কবে যাবে উমারে আনিতে কৈলাস ভবনে।
না হেরিয়া বিধুমুখ হৃদয়ে দারুণ দুঃখ,
কত আর সহিব জীবনে॥
শুনিয়া শিবের রীতি, হৃদয়ে উপজে ভীতি
ভূত প্রেত সঙ্গ সাথী, থাকে নাকি শ্মশানে।
কি কব তাহার গুণ, কপালে জ্বলে আগুন,
সিদ্ধিতে বড় নিপুণ, আপন পর না জানে॥
দীন অকিঞ্চনে ভাসে, তুষ্ট করি আশুতোষে
আনহ প্রাণের গৌরী নৈলে মরিব পরাণে॥"*

* শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত পূজনীয় নাগ মহাশয় বিরচিত।

গৌরী আসবেন—সাধের মেয়েটী এক বৎসর পরে আসবেন, গিরিরাণী ব্যস্ত হচ্চেন। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা জাগরণ ফুটে উঠছে। যে দিকে চাই—দেখি একটা আনন্দের উৎস ভেসে বেড়াচ্ছে। ঊর্দ্ধদেশে শারদ চন্দ্রিমা অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতি ছড়াইতেছে—এমন ত আর কখন দেখি না। চাঁদের এমন প্রাণকাড়া ভাব ত আর কখন উপলব্ধি হয়নি। যেন ভিতর থেকে একটা আনন্দ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে জীবের প্রাণে নূতন নূতন আনন্দের ফোয়ারা তুলছে। সকলে ব্যস্ত। যার মুখের দিকে চাই, দেখি কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ ছবি বুকে ধরে মুখে প্রতিফলিত করছে। চাঁদ যেন হাসতে হাসতে বলছে 'মা আসছেন তাই এত আনন্দ উৎস—তাই এত প্রকৃতিসুন্দরী আজ মনমোহিনী। তাই বুঝি ফুলটীতেও এ গন্ধ, এত পরাগ মাখা—যেন প্রাঙ্গন, বন, উপকূল, অন্তর, অনুরাগ সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলছে। মর্ত্তধামে মনে হয় এক বড় দরের চিত্রকর স্বর্গ থেকে নেমে এসে ফল ফুলে নবরাগ মিশিয়ে প্রকৃতিকে সাজিয়ে দিয়ে গেল। কথাটী কি, মা মা আমাদের আসছেন। এ মা বৎসর বৎসর হিন্দু-জাতিকে মেনকার সান্ত্বনা উদ্দেশে একবার করে

আসেন, তাই এই আসবার আগে এত কুতূহল—এত ছুটাছুটি, এত বিভোরতা। মা যে এলেন, আমরা সাধারণে কখন বুঝলুম না, স[illegible] পরিষ্কার করা হলো—প্রতিমা গড়া হলো—পোটো আসিয়া প্র[illegible] রং দিয়া চালচিত্র করতে লাগলো। ছেলেরা ছুটাছুটি করছে, আনন্দে আটখানা—নূতন নূতন জামা, জুতা, কাপড় আসবে, প'রে এ বাড়ী ও বাড়ী প্রতিমাদর্শন করে বেড়াবে। প্রবাসী গাটরী বাধছেন, এক বৎসর পরে লম্বা ছুটী পাবেন, বাটীতে আসবেন নানাবিধ দ্রব্যাদি নিয়ে—কত আনন্দে বুক ভরে আসছেন। আত্মীয়-স্বজন দেখে কত খুসী হবেন। এই যে এত কোলাহল ও আনন্দ যেন ভারতের সকলের প্রাণে জাগছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরাজ, অন্ততঃ এই পূজা উপলক্ষে ছুটী পাবেন ও আত্মীয় স্বজন একত্রে মিলবেন ও কর্ম্ম থেকে কিছুকাল অবসর পেয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরবেন এ জন্যেও আনন্দ আর ধরেনা। কিন্তু হিন্দু যিনি, তিনি বুঝলেন প্রতিমা গড়া শেষ হলো, এবার পূজা আরম্ভ হবে। পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত—অবস্থানুসারে যে যা পারলেন যোগাড় করলেন। পুরোহিত এলেন, পূজা আরম্ভ হবে, ঢাকী এলো বাজনা হবে, কামার এলো বলিদান হবে। সব ঠিক। কিন্তু এত আশার সঙ্গে সঙ্গে 'মা এলেন কি না' তা ত কই ভাবতে চেষ্টা পেলুম না। কই হাত যোড় করে মায়ের কাছে ভক্তি-বিভোর হয়ে শুনতে গেলাম—জগন্মোহিনীর কথা? মা বলছেন—ঐ যে প্রতিমার আড়াল থেকে,—"এস পিপাসী, এস আর্ত্ত, এস দীন, এস পরণে বসন নাই কার, এস উদরে অন্ন নাই কার, এস সাধু, এস উপাসক, সকলের জন্যে বরাভয় দিতে এই দেখ তোমাদের সম্মুখে করুণার কোল বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা আর ভীত হওনা—আর রিপু অসুরের ভয় নাই, আমি দমন করে দিতে এসেছি। এত ডাকি, তোমরা কি শুনতে পাওনা? সুখে, দুঃখে, শোকে, তাপে, আঁধারে, আলোকে, আমার লুকান জ্যোতি-রূপটী দেখতে কেন চাওনা? অন্নগতপ্রাণ, সরল প্রাণে আমায় দেখতে চাও, দেখা পাবে। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলে আমার স্বরূপটী দেখতে পাবে—স্নেহমাখা মাতৃরূপা পূর্ণজ্যোতির্ভরা—'আয় বৎস আয়' বলে সদাই ডাকছে। আমার এ তিন দিনের জন্যে আসা তোমাদের ভাব জাগাতে। আমার মা মেনকার মত তোমাদের প্রাণ কেঁদে উঠলে, আমি তোমাদের সঙ্গে তিন দিন কেন, চিরদিন ঘুরছি ফিরছি বুঝতে পারবে। এ তিন দিনের পূজায় প্রীত থেকে

ভাব গাঢ় করে লও—চির-পূজার ভিত্তি হবে—আমায় চিনতে পেরে দেহ গেলেও অমর হবে ও আমার সঙ্গে মিশিয়ে থাকবে।"

মাগো জগতজন-পালিনী হরমনোরমা! তোমার এ করুণার ডাক্ শুনে কেন ছুটে তোমার কাছে যাই না? মাগো মহিষাসুরমর্দ্দিনি! তোমার দয়া না হলে ত মা আমরা তোমায় হৃদয় চণ্ডীমণ্ডপে বসাতে পারবো না। একটু শক্তি না দিলে আমাদের কোন পূজার আয়োজন হবে না মা। মাগো মহামায়ে! তোমার এই তিন দিনের পূজার সময়ে চিরদিনের পূজার আয়োজন শিখিয়ে যাও। অকৃতি সন্তানগুলোকে আর মোহসাগরে নিমগ্ন করে রেখনা—মা। অনেকদিন হলো তোমায় ছেড়ে আছে।

"সকলি হারায়ে (মাগো) হয়েছে ভিখারী দীন,
তোমারে ভুলিয়া দেখ নিরানন্দ কি মলিন।"

মাগো। তুমি যে অন্তঃপুরবাসিনী—এই বাহ্যজগতের ভিতর পরদায় তোমার বাস—এখান থেকে একটু দূরে থাক। জগৎ তুমি দিবানিশি দেখছো, জগৎ তোমায় দেখতে পাচ্ছে না। তাইত ঐ যে ঐ আলেয়ার মত—দূরগতা ছায়ার মত, আমাদের মোহাবৃত দেখে দূরে দূরে পালাচ্ছো বোধ হয়। তাই বলি মা, তোমার অন্তঃপুরের পূজা পদ্ধতি শিখাও, যেন তোমায় এক মুহূর্ত্তও ভুলে দীনহীন কাঙ্গাল না হই। মাগো! আমাদের তোমা ধনে ধনী করো। শিবানী গো! হৃদয়কে আসন করে দাও, আঁখির জলে ও রাঙ্গাচরণ দুখানি ধোয়াতে দাও। মন যেন অর্ঘ হয়। স্নানের জন্য প্রেমবারি সৃজন কর মা, হৃদয় মাঝে। শ্রদ্ধা চন্দন, জ্ঞান পুষ্পে, ভক্তি সুধায় নৈবেদ্য সংযোজনায়, বিবেক ধূপ, সাধন দীপেতে ধরিয়ে আত্মারাম পুরোহিত খাড়া করে দাও মা। আর ষড়-রিপু ছাগকটা বলিদানের জন্য নিযুক্ত করে দাও। একটীবার এই পূজার আয়োজন স্থির করে দাও দেখি কি হয়—দেখি তোমার এখানে গড়া প্রতিমার পশ্চাতে লুকান ঐ স্নেহময়ী রূপটী দেখতে পাই কিনা?

মা আনন্দময়ী গো! চিরদিনের মা আমাদের—চিরজন্মের মত তোমায় মা বলতে শিখাও। আমরা মা তোমার অবোধ সন্তান, কোন বোধ আমাদের নাই। কেবল তোমার বারণটি উপেক্ষা করে কুপথে যেতে শিখেছি। তাই মা এই মানস পূজায় চিরবোধন বসায়ে দাও। বুঝে লই, ঐ যে তুমি মা প্রসন্নময়ী পাশে দাঁড়ায়ে রয়েছ। তুমি ত মা "বুঝি বা না বুঝি, দেখিবা বা না দেখি, সতত শিয়রে জাগো।" তবে সেটা আমাদের জানতে দাও মা, একবার মাত্র

জেনে এখানকার খেলা ছেড়ে, দূরে তোমার ঐ অভয় নগরে চিরবাসার যোগাড় করে লইগে। কৃপাময়ী মা আমাদের! তোমার কৃপা না হলে কিছুরই সম্ভব নহে। এখন প্রার্থনা, এই মানস পূজার মহামন্ত্রটী হৃদয় মাঝে জেগে উঠুক, আর জীবন-ভোর সেই মন্ত্রটী জপতে জপতে চলে যাই। এই মহা আনন্দের দিনে ক্ষণেকের তরে দেব মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দাও, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এই বলে নমস্কার করি ও মানবজনম সফল করি ঃ—

সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে॥

দীন সেবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পথিক।

(১)

আঁধারে আঁধারে আমি ঘুরিয়ে বেড়াই,
দিশেহারা পান্থ আমি পথ নাহি পাই,
বিষয় বাসনা সদা দিতেছে যাতনা,
কোন্ পথে শান্তি পাব বলনা বলনা।

(২)

ভীষণ প্রান্তর ইহা নাহি এর সীমা,
কোথা গেলে পাব আমি পথের ঠিক
হইয়াছি পথ ভ্রষ্ট আসিয়া বিদেশ,
কাতরে জিজ্ঞাসা করি কহ গো বিশে

(৩)

দেখিয়া আমার দশা সবে পরিহাসে,
আকাশেতে তারাদল মিটি মিটি হাসে,
কেহ না বলিয়া দেয় আমি কোথা যাই,
বিপন্ন পথিক সুধু ঘুরিয়া বেড়াই।

(৪)

কোথা আছ দীনসখা, চাহ দীনহীনে,
হাতে ধরে ডেকে লও এ অধম জনে,
পিপাসে আকুল হেথা প্রাণ বুঝি যায়,
আপন আবাসে গিয়ে জুড়াই হৃদয়॥

সেবক—শ্রীচারুচন্দ্র সাহা।

অকিঞ্চনের রোদন।

(গান।)

একবার বলে' দাওগো আমায়—
কি দোষ পাইয়া দীন সন্তানে
ফেলে দিলি, মা, এ পঙ্কে।
দেখিনি নয়ন মেলিয়া—
এসেছিল কোন অজানিত অরি,
হানিল শেল করঙ্কে!
আমায় একেলা পাইয়া সহস্র বৈরী
বাঁধিয়া শত বন্ধনে,
হাসিছে বিকট পিশাচের হাসি
নিরখি দীন-ক্রন্দনে,
সকলি আঁধার যে দিকেতে চাই,
হেথা যে বন্ধু জনেক নাই,
আমারেও যেন খুঁজিয়া না পাই,
মরি গো মহা-আতঙ্কে!!
আমায় দাও মা তোমার চরণের ধূলি,
সে যে গো পরশ-মণি আমার,—
ঘুচে' যাক্ মোর মোহের কালিমা,
ভুবন-মঙ্গল পরশে তার;
জ্বলিছে হিয়ায় শত অনুতাপ,
আমি যেন হেথা মূর্ত্ত-পাপ,
হারানিধি মোর এনে দে জননি,
টেনে তুলে' নে মা অঙ্কে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

প্রার্থনা।

তোমারি নির্ম্মল শান্ত মূরতি
কবি যেন সদা ধ্যান।
তোমারি অতুল গৌরবে প্রভু,
পাই যেন দিব্যজ্ঞান।
তোমারি উজল পুণ্য আলোক,
নাশে যেন মম মোহ নিরালোক,—
এ হৃদয়ে যেন করে সদা প্রভু,
বিমল কিরণ দান।
তোমারি সুন্দর জগমনোলোভা,
ভকত বাঞ্ছিত চির স্নিগ্ধ শোভা,
হৃদি মাঝে মম নিরখিয়ে প্রভু
জুড়ায় যেন এ প্রাণ।
তোমারি অক্ষয় শান্তি-প্রেম-সুধা,
নাশে যাহে সব পাপ তাপ ক্ষুধা,
এ তৃষ্ণিত প্রাণ সুখে দুঃখে যেন
করে সে অমিয় পান।
তোমার মঙ্গল মধু সাম-রব,
যাহে মুগ্ধ প্রভু, এ বিপুল ভব,
এ হৃদয়-তারে চির তরে যেন
বাজে সে মধুর তান।

শ্রীসরোজমোহন মজুমদার।

সমালোচনা।

উপনিষদের উপদেশ।—শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্ এ প্রণীত। প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা পাইয়াছি। এই সংস্করণে সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ, এবং তাঁহার ভাষ্যের গূঢ় অভিসন্ধি কি, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকার এই উপনিষদ্ রত্নদ্বয়

অনুবাদ করিয়াছেন। এরূপ পুস্তকের বিশেষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। তবে স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে, গ্রন্থকার কষ্টগম্য সংস্কৃত উপনিষদ সাগর মন্থন করিয়া প্রাঞ্জল ও সহজ বোধগম্য বাঙ্গালা অনুবাদরূপ অমৃত তুলিলেন ও ধর্ম্ম-পিপাসু জ্ঞান-দুঃখী নর নারীকে অকাতরে বিলাইলেন। এই গ্রন্থের "অবতরণিকাটী" তাঁর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের ও রচনা কৌশলের পরিচায়ক। সমস্ত পুস্তকের প্রতিপাদ্য নানাবিধ জটিল তর্ক অনুশীলন দ্বারা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই অনুশীলনে পাশ্চাত্য বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণের মত সমর্থন করিয়া বিচার চাতুর্য্যে আরও মাধুর্য্য বাড়াইয়াছেন। বেদান্ত ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বুঝিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে বিচার নৈপুণ্য ও মীমাংসা কুশলতায় পরিপূর্ণ এ অমিয় বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। এই "অবতরণিকায়" উপনিষদের দার্শনিক অংশ ও ধর্ম্ম মতের বিস্তৃত আলোচনা এবং সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের বাহ্যিক মত ভেদ, যাহা প্রকৃত বিরোধ ভাবাপন্ন নহে—সুন্দর যুক্তি ও মীমাংসার দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধন্য তাঁর সাধুচেষ্টা। এই নভেল নাটক ও হাস্য-রসাদির দুর্দ্দিনে বেদধর্ম্মের সরল বাঙ্গালা অনুবাদরূপ জয়পতাকা তুলিয়া বঙ্গ সাহিত্যে নব জাগরণ সৃষ্টি করিলেন সন্দেহ নাই। শোক সন্তাপের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে এরূপ মহারত্ন ধর্ম্ম-পিপাসু যদি হঠাৎ পান,—উহার বিমল জ্যোতি, নবদ্বার বিশিষ্ট ছিন্ন ঝুলির মধ্যে রাখিয়া অভূত শক্তি ও সান্ত্বনা যে পাইবেন, তার আর বিচিত্র কি? গ্রন্থকার সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া এই মহারত্ন ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করুন, ঈশ্বর চরণে কায়-মনো-বাক্যে এই আমাদের প্রার্থনা। হিন্দু সমাজ এই পুস্তকের স্বাদ পাইয়াছেন মনে হয়, কেননা এত অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল। এ পুস্তক ৫৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৷০ মাত্র। মুদ্রন ও কাগজ বিশেষ প্রশংসনীয়। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈষ্ণব-বিবৃতি।—শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও জেলা হুগলি, এলাটী পোঃ আঃ "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৴০ আনা মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্যধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবজনের আচার যে সম্পূর্ণ বেদবিহিত, গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা প্রদর্শনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিক

কাল হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ঐতিহাসিক তথ্য, বৈষ্ণব জাতির সামাজিক অধিকার নিরূপণ ও বৈষ্ণব সংস্কার প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক রচিত। এ গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা, একেবারে চলিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। প্রত্যেক হিন্দুমাত্রকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। বৈষ্ণব ভক্তের নিকট এ গ্রন্থ যে পরম আদরণীয় হইবে—সন্দেহ নাই।

প্রার্থনা-শতক।—শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত এবং উপরোক্ত "বৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণে এই প্রার্থনা গ্রন্থ সরল ও সুললিত ভাষায় লিখিত। উক্ত ঠাকুরের প্রার্থনা বৈষ্ণব জগতে যে অমূল্য নিধি, তাহা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। বোধ হয় নরোত্তম ঠাকুরের ভাব-লেশ-কণিকায় অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থকার এই মধুর প্রার্থনাগুলি লিখিয়াছেন। মন খুলিয়া প্রাণের কথা ভগবচ্চরণে জানাইবার প্রার্থনাই একমাত্র সহজ ও মোক্ষ উপায় বলিয়া আমাদের ধারণা। গ্রন্থকার সেই উপায় অবলম্বনে হৃদগত ভক্তি-উচ্ছ্বাস সেই রাতুল চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার ভক্ত। তাঁর এ প্রেমভক্তিপূর্ণ "প্রার্থনা শতক" যে বৈষ্ণব-সমাজের প্রাণ-মজান ধন হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভক্তি-যোগ।—খ্যাতনামা চিন্তাশীল সুলেখক শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত। মূল্য।০ আনা মাত্র। ভক্তি-যোগ সম্বন্ধে আর একখানি গ্রন্থ পাইলাম। আমাদের পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীযুত অশ্বিনী-কুমার দত্ত মহাশয়ও ভক্তি-যোগ বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়া জন-সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ও এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিলেন। ভক্তি-যোগ দ্বারা প্রেমের উৎস ফুটাইয়াছেন। ভগবান জীবের জন্য দয়ার কোল পাতিয়া "আয়" "আয়" করিয়া অবিরাম ডাকিতেছেন, ও আমরা কর্ম্মদোষে শুনিয়াও শুনিতেছিনা—সরলভাবে বরাবর এই অদ্ভুত প্রেম জাগাইয়াছেন। হরিপিপাসু ভক্ত এ গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাইবেন, আমাদের খুব ধারণা।

পদ্য-ভূগোল।—যশোহর বসুন্দিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রথম শিক্ষক শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ দ্বারা সঙ্কলিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। সকলেই জাত

আছেন যে ভূগোল অতি নীরসপাঠ্য। নানাবিধ বিদেশীয় নামগুলি কণ্ঠস্থ করা সুকুমারমতি শিশুর পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়ে; শিশুর গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে স্বভাবতঃই একটা ঝোঁক দেখিতে পাই। কোন বিষয় হাজার কষ্ট-বোধগম্য হউক, ছন্দের হইলে শিশুপ্রাণ আবৃত্তি করিতে যেন সুখ অনুভব করে। সরল শিশুদের এই গ্রন্থ খুব সুখপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই। পদ্যগুলি বেশ সরল ও মধুর করিয়া গ্রন্থকার বিলক্ষণ রচনানৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। টেকস্‌ট বুক কমিটী শিশুর ভূগোল শিক্ষায় এই বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইল বোধ করিব।

—০—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

ইন্দাশ—ধামুড় গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীতে একটী বালক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ পূর্ব্বক কতকগুলি বালক লইয়া বিগত ১৯শে ভাদ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার প্রিয় সেবক মহাত্মা রামচন্দ্রের পূজা, অর্চ্চনাদি এবং পতিতপাবন নাম সংকীর্ত্তন করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে সাধ্যমত মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

বিগত ১৯শে ভাদ্র রেঙ্গুণ "রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি" কর্ত্তৃক জন্মাষ্টমীর দিবসে ৪৪নং ষ্ট্রীটস্থ ৬নং ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার অন্তরঙ্গের বীর-ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও অর্চ্চনাদি হইয়াছিল এবং ২২শে ভাদ্র উক্ত স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের লীলাসম্বরণ মহোৎসব সুন্দর-রূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবার উৎসব স্থলে অনেকগুলি উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র সন্তান দ্বারা "রামকৃষ্ণ সংগীত" সুললিত কণ্ঠে সমস্বরে গীত হওয়াতে সাধারণে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। উৎসবের পরদিন প্রাতেঃ কতকগুলি দরিদ্র নারায়ণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ১৯শে ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিবস কটক রামকৃষ্ণকুটীরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব অতি সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে সমস্ত দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ভক্তগণ সমস্ত দিন রামকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন।

———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

কার্ত্তিক, সন ১৩১৯ সাল।
ষোড়শ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।

বর্ণমালায় ভগবদুক্তি।

১। অসৎ সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

২। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুই একমাত্র ঈশ্বর।

৩। ইন্দ্রিয়াদি হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

৪। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন সত্য, শ্রীগুরুরূপই কেবল অবলম্বনীয়।

৫। উপকার-ব্রতই স্বীয় চরিত্রের উন্নতির উপায়।

৬। ঊর্ণনাভীবৎ স্বকৃত কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইও না।

৭। ঋত পথে সদা বিচরণ করিবে ও ঋণ মুক্ত থাকিবে।

৮। একান্ত মনে তাঁরই শরণাগত হও।

৯। ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র থাকিতে তাঁর আস্বাদ পাইবে না।

১০। ওতপ্রোতভাবে তাঁরই লীলা জানিয়া, বিচলিত হইও না।

১১। ঔদাস্যতাই সকল বিঘ্নের হেতু।

১২। কামিনীকাঞ্চনই মায়া, মন থেকে ঐ দুটী গেলেই যোগ।

১৩। খ্যাপা না হতে পারলে কিছুই হলো না।

১৪। গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক।

১৫। ঘৃণা কারু কর্ম্মে না—পোকাটাকেও নয়।

১৬। চঞ্চল মন সত্য, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা তাকে বশীভূত করা যায়।

১৭। ছল চাতুরী অবলম্বনে কোনও মহৎ কাজ সাধিত হয় না।

১৮। জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য কার্য্য ঈশ্বরসাধন।

১৯। ঝঙ্কারে (জীবের চাটুবাক্যে) বধির হইয়া থাকিও।

২০। টান—অনুরাগ হইলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

২১। ঠকিবে না কোন কালে (তাঁরে) সরল প্রাণে ডাকিলে।

২২। ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।

২৩। ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাঁর উপাসনা হয় না—অন্তরে ব্যাকুল হওয়া চাই।

২৪। তত্ত্ব সুধা চাও যদি, নাম কর তাঁর নিরবধি।

২৫। থুথু একবার ফেলিলে আর যেমন গ্রহণ করা চলে না, তেমনি দান ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।

২৬। দীনজনে সতত দয়া করিবে।

২৭। ধ্যান করবে মনে বনে ও কোনে।

২৮। নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য কর, ফলাকাঙ্ক্ষী হইও না।

২৯। প্রফুল্লচিত্তে সদা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও।

৩০। ফকিরি অপেক্ষা সন্তোষজনক অবস্থা আর নাই।

৩১। বিশ্বাস সহকারে তাঁর নাম করিতে ভুলিও না।

৩২। ভালবাসা যদি জন্মে, তবে তাঁকে পেতে আর কি দেরী।

৩৩। মনেতে যাবতীয় আসক্তি ত্যাগ করিবে।

৩৪। যোগী হতে গেলে ত্যাগী হও, ভোগী হইও না।

৩৫। রসনায় তাঁর নাম গান অনিবার কর।

৩৬। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু জানিহ নিশ্চয়।

৩৭। বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভই হয় না—শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে।

৩৮। শক্তি মানতেই হবে, যতক্ষণ আমি আমার—এলাকায় আছ।

৩৯। ষড়রিপুকে সুবুদ্ধির দ্বারায় চালিত করিও।

৪০। সংসার কেমন? যেমন আমড়া। শস্যর সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটী আর চামড়া।

৪১। হরিনাম একবার করিলে যাবতীয় পাপ তখনি পালায়। যেমন হাজার বছর অন্ধকার ঘরে একটী দেশালাই জ্বালিলে তখনি আলো হয়।

৪২। ক্ষুণ্ণ মনে থাকিওনা, নিজের হানি হইবে।

গুরুতত্ত্ব।

আজকাল আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বড়ই অল্প হইয়া পড়িয়াছে এবং সে কারণ আমারাও দিন দিন অধঃপতিত হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এত অধঃপতনের কারণ কেবলমাত্র ধর্ম্মে অবিশ্বাস, শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা। কারণ, ধর্ম্ম না থাকিলে কোনও জাতিই এমন কি কোনও জীবই থাকিতে পারে না। কেননা, "ধৃ" ধাতু হইতেই ধর্ম্ম; "ধৃ" অর্থে ধারণ করা। অর্থাৎ যাহা যাহাকে ধারণ করিয়া রাখে, বা, যে যাহাকে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। মদিস্থত্রবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মে যতদিন আমাদের লক্ষ্য ছিল, যতদিন সেই ধর্ম্ম যত্নসহকারে আমরা পালন করিয়াছিলাম, ততদিন তাহা সবল থাকা প্রযুক্ত আমরাও বলীয়ান ও উন্নত ছিলাম, আর যে দিন হইতেই আমরা সেই ধর্ম্মে লক্ষ্যচ্যুত হইলাম, ধর্ম্মপালনে বীতশ্রদ্ধ হইলাম, সেইদিন হইতেই—তাহার দৌর্ব্বল্য যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণেই দুর্ব্বল বা অবনত হইতে লাগিলাম। ধর্ম্মের সবল বা বলীয়ান অবস্থা—ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাতে আস্থাস্থাপন ও তাহার পালন এবং ধর্ম্মের দুর্ব্বল অবস্থা—তাহাতে অবিশ্বাস হেতু অনাস্থাপূর্ব্বক তাহার উপর অশ্রদ্ধা বা তাহার অপালন।

এখন দেখিতে হইবে, আমাদের ধর্ম্মের উপর এত অবিশ্বাস হয় কেন? যে জাতি, ধর্ম্মের জন্য এককালে অকাতরে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ তাহারাই ধর্ম্মে এত অনাস্থাবান কেন? ইহার একমাত্র কারণ আমাদের গুরুর অভাব। যেদিন হইতে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের মধ্যে, প্রথম ও প্রধান আশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উঠিয়া গেল, সেইদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। যদিও গার্হস্থ্য আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে বটে, কিন্তু তাহা তোমার আমার ন্যায় অসংযমীদিগের পক্ষে নহে; কেননা, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম যে কি, বা তাহার কার্য্যাদিই বা কিরূপ তাহা আমরা বুঝিতেই পারিনা; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুর সহিত সদা সঙ্গহেতু তাঁহার কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহার কৃপায় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক যোগযাগাদি শিক্ষা করিয়া এবং গার্হস্থ্যাশ্রমকে সম্যকরূপে অবগত হইয়া, সংসারে প্রবেশ করিলে গার্হস্থ্যাশ্রম যে

সংসারাশ্রম অতি সুখের স্থান হইত এবং তখনই উহা শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে থাকিয়াও আমরা নিশিদিন দুঃখের দুর্ব্বিসহ যাতনায় প্রপীড়িত! "সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলেই বাঁচি" এই বাসনা সদাই মনে উদয় হইতেছে! এই সকল দুঃখ কষ্টের একমাত্র কারণ, আমাদের গুরুর অভাব। কিন্তু, "গুরুর অভাব" বলিলেই কেমন একটা গোলযোগ বাধিয়া যায়; কেননা, চলিত কথায় আছে—

"গুরু মিলে লাখে লাখ।
চেলা নাহি মিলে এক॥"

অর্থাৎ "গুরু অনেক পাওয়া যায়, শিষ্য একটীও মিলে না। এ কথা সত্য;— কিন্তু যদি ঠিক গুরু পাওয়া যায় তবে সে যেমন শিষ্যই হউক না কেন, গুরুর শক্তিতে সে উপযুক্ত শিষ্যরূপেই গঠিত হইয়া যায়। ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, এক এক স্থানে গুরুর একটীমাত্র কথাতে অতি পাপীরও উদ্ধার হইয়াছে, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চোর রত্নাকর, যিনি পরে বাল্মীকি নামে প্রকাশিত হন। তারপর, যদি বলা যায়,—

"স্বভাব যাদৃশী যস্য ন যায়তে কদাচনম্।
অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে॥"

অর্থাৎ "যাহার যাহা স্বভাব তাহা কখনও যায় না, (যেমন) কয়লাকে শতবার ধৌত করিলেও তাহার কাল রং ঘুচেনা। ইহাও সত্য, স্বীকার করিলাম; কিন্তু

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লাকি ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥"

অর্থাৎ যদি সদ্‌গুরু পাওয়া যায় ও তাহার দ্বারা ভেদাভেদ শিক্ষা করিয়া জ্ঞান উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে, যেমন কয়লাকে অগ্নিতে দিলে তাহা আর কাল থাকে না, তদ্রূপ জীবেরও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; ইহাও তো সাধুবাক্য? ইহাও বা অসত্য বলি কিরূপে? মোটের উপর গুরু যদি শক্তিমান হয়েন, তাহা হইলে শিষ্য অনেক পাওয়া যায়। অভাব বাস্তবিক গুরুর, শিষ্যের নহে।

দ্বিতীয়ত "গুরুর অভাব" বলিলেই হয়ত, অনেকেই ক্রুদ্ধ হইবেন; কেননা, সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে গুরু নাই কাহার? দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই কয়জন? এ ক্ষেত্রে গুরুর অভাব বা গুরু নাই বলিলে তাঁহাদের ক্রোধ হইবারই কথা। কিন্তু কাণে কাণে একটা বীজমন্ত্র বলিয়া দিলেই কি গুরু হয়?

"গুরু" শব্দের অর্থ কি? "গু" শব্দে অন্ধকার ও "রু" শব্দে আলোক। শাস্ত্রে আছে—

"গু-শব্দস্তন্ধকারক স্যাদ্রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

"গু" অন্ধকার ও "রু" শব্দে তাহার নিরোধক; অতএব গুরু অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেন বলিয়া "গুরু" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। তবে কাণে কাণে একটা একাক্ষরী দ্ব্যক্ষরী বা ততোধিক সংখ্যক বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াই গুরুর কর্ম্ম শেষ হইল কৈ? আমরা সকলেই আপনাপন ইষ্টমন্ত্র জপান্তে গুরুকে প্রণাম করিয়া থাকি। আমাদের গুরু প্রণামের জন্য আমরা সচরাচর যে তিনটী মন্ত্র দেখিতে পাই, সে তিনটীর অর্থ কি, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক; তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারিব—গুরু কে, বা গুরু হইবার যোগ্য কে।

প্রথম মন্ত্র:—"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম॥"

অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধজনের চক্ষু যিনি জ্ঞানাঞ্জনরূপ শলাকাদ্বারা উন্মিলন করিয়া দেন, বা যাহার দ্বারা উন্মিলিত হয়, সেই শ্রীগুরুকে আমি নমস্কার করি। ইহাঁর দ্বারা উপরোক্ত "গুরু" শব্দের ব্যাখ্যায় একই রূপ ভাবার্থ পাইলাম। তারপর, তিনি নয়ন উন্মিলন করিয়া কি করেন? তাহা দ্বিতীয় প্রণামে পাওয়া যায়, যথা:—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈঃ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থাৎ "অখণ্ডমণ্ডলাকার এই চরাচর (বিশ্ব) যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত, তাঁহার স্বরূপ যিনি দেখাইয়া দেন, বা যাঁহার দ্বারা দর্শিত হয় সেই শ্রীগুরুকে আমি নমস্কার করি।" (উপরোক্ত "তৎপদং" শব্দের অর্থ অনেকেই "তৎচরণং" অর্থাৎ তাঁহার চরণ বা পদ করেন; কিন্তু তাহা নহে, "তৎপদং" মানে "তৎস্বরূপম্"—তাঁহার স্বরূপ, বা নিজরূপ অথবা তৎ অবস্থা।) তারপরেই সেই গুরু কি বস্তু তাহা জানাইবার জন্য তৃতীয় প্রণাম, যথা:—

"গুরুর্ব্রহ্মাঃ গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মাৎ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থাৎ "গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর (শিব), গুরুই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, অতএব শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। উপরোক্ত মন্ত্রত্রয়ের অর্থ সম্যক অবগত

হইলেই সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে, আমরা সচরাচর যে গুরু করিয়া থাকি, তাহাকে ত' আর যথার্থ গুরুকরণ বলিয়া মানিতে পারি না!!! যদি কাণে কাণে দুই একটা মন্ত্র শুনাইয়া দিলেই সকল কার্য্য শেষ হইত, তাহা হইলে, প্রণাম মন্ত্রগুলি ঐরূপ বাক্যবিন্যাসের দ্বারা রচিত হইবার কারণ কি? উহার কি কোনও অর্থ নাই? তাহা কি কখনও সম্ভব? না,—শাস্ত্রীয়বাক্য কখনও নিরর্থ হইতে পারে না। তবে কি আমাদের ঐ বীজ সকল কিছুই নহে? না, তাহাও হইতে পারে না। বীজ সকল সবই ঠিক, সবই ফলপ্রদ; তবে তাহার সাধন আবশ্যক। বীজবপন করিলেই কি ফসল পাওয়া যায়? না তাহার পরেও জল সেচনাদিরূপ কার্য্য করিলে তবে ফসল উৎপন্ন হয়? সেইরূপ, বীজমন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক কেবলমাত্র করে বা মালায় জপ করিলেই কোনও ফল পাওয়া যায় না। যেমন তৃষ্ণা হইলে 'জল জল' শব্দ মুখে উচ্চারণ করিলে তৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না—জলপানরূপ ক্রিয়ার দ্বারা তৃষ্ণা নিবারিত হয়; তদ্রূপ, বীজমন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক জপও করিতে হইবে; আবার তাহার ক্রিয়ারও আবশ্যক। মহাত্মা কবির বলিয়াছেন :—

"কবির মালা কাঠ কি বহুৎ জন কবি ফের।
মালা ফের শ্বাসকী যাহে গাঁঠি নাহি সুমের॥"

"অর্থাৎ কাঠের মালাত অনেকেই ফিরাইয়া থাকেন, কেবল তাহাতে কিছু হইবে না, সেই সঙ্গে শ্বাসের মালাও ফিরাও, যাহাতে সুমেরুর গাঁঠ নাই। কিন্তু, এই সকল ব্যাপার আজ কালের গুরুদিগের নিজেদেরই জানা আছে কি না সন্দেহ, তাঁহারা আবার শিষ্যগণকে কি প্রকারে শিক্ষা দিবেন? শাস্ত্রে আছে—

"মন্ত্রার্থং মন্ত্র চৈতন্যং যো ন জানাতি সাধক।
শত কোটী জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্নজায়তে॥"

মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্র চৈতন্য যে সাধক না জানে, শত কোটী জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। সুতরাং, বীজমন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক যে মন্ত্র পাইলাম তাহার অর্থ কি, বা তাহাকে কিরূপে চৈতন্যযুক্ত করিতে হয়, তাহা না জানিয়া শুধু মুখে জপ করিলে কি হইবে? যেহেতু কেবল বর্ণরূপী মন্ত্র সকল পশুভাবে অবস্থিত, প্রমাণ যথা :—"পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ!" এই সকল ব্যাপার একমাত্র সদ্গুরু ভিন্ন অন্য কেহই জানেন না; সুতরাং, আজকালের চলিত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কেহই ফললাভ করিতে পারেন না। আজকালের গুরুগিরিত একটা (বিনা পুঁজিতে) ব্যবসা মাত্র!! ইহাতে কত

হইতেছে এই যে, অন্ধের হাত ধরিয়া অন্ধের গমনের ন্যায় গুরু ও শিষ্য উভয়েরই পতন হইতেছে! কঠোপনিষদের দ্বিতীয়বল্লীর পঞ্চম শ্লোকে বলে যথা,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা ; স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতন্মন্যমানা।

দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া ; অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

অর্থাৎ "অবিদ্যা বা অজ্ঞান আচ্ছন্ন বুদ্ধিহীন ব্যক্তিও আপনাকে মহাপণ্ডিত মনে করিয়া অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে।"

এক্ষণে আমাদের 'মন্ত্র' ও 'দীক্ষা' সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক ; কারণ, 'মন্ত্র' ও 'দীক্ষা' কি. বা কাহাকে বলে জানিলে, তবে তাহার শিক্ষাদাতা অর্থাৎ গুরুর আবশ্যক হইবে ; তখন "গুরুতত্ত্ব" বুঝা যাইবে। 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ (মনঃ ত্রায়তে ইত্যর্থ) যাহার দ্বারা মন ত্রাণ পায়, অর্থাৎ মনের লয় হয়, তাহাই মন্ত্র—

"মননং বিশ্ব বিজ্ঞানম্ ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষনামামন্ত্রণাত্র উচ্যতে॥"

যাহার মনন হইতে বা যাহাকে মনন করিলে বিশ্ব-বিজ্ঞান বিশ্বময় বিশেষ জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) জন্মে ; অর্থাৎ যাহাকে মনন করিলে ব্রহ্মসত্ত্বা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসত্ত্বা পৃথক নহে এই একান্ত অনুভূতি প্রত্যক্ষ হয়, এই অংশে মন সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়। এই অংশে "ত্র" সমষ্টিতে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের "আমন্ত্রণ" যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মন্ত্র। আমি ইষ্টমন্ত্রজপে বসিলাম, আর আমার মন হাটে বাজারে ঘুরিতে লাগিল। তাহা হইলে মনের লয় হইল কোথায়? তাই—এমন ক্রিয়া আবশ্যক যাহাতে মন সহজেই লীন হয়। সেই ক্রিয়া যিনি দেখাইয়া দেন, তিনিই একমাত্র মন্ত্রদাতা গুরু ; নচেৎ. 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ শুধু বীজাদি মাত্র নহে। এই স্থলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আমার স্মরণ হইল। শুনিতে পাই রামকৃষ্ণদেবের কথায় কথায় চৈতন্য সমাধি হইত, যাহাকে সচরাচর লোকে "ভাব" বলে। ঐ চৈতন্য সমাধির অবস্থাই যথার্থ মনের 'লীন' অবস্থা। এখন, দেখিতে হইবে, রামকৃষ্ণদেবের কোন শক্তিবলে ঐরূপ অবস্থা হইত। তাঁহার, তাহা যে শক্তিই হউক না কেন, তিনি যে কোনও রকম উচ্চসাধন করিয়াছিলেন, ইহা মানিতেই হইবে। তাঁহারই যথার্থ 'মন্ত্র' হইয়াছিল, 'মন্ত্র' একবার সাধন করিলে কি আর সে জীবের জীবভাব থাকে? সে তখন শিবভাবাপন্ন হইয়া যায়। সেইজন্যই আজ রামকৃষ্ণদেব অবতার নির্ব্বিশেষে দেবতা জ্ঞানে

পূজিত। হায়! হায়!! আজ প্রকৃতসাধন অভাবে আমরা এতদূর অধঃ-পতিত, এমনিই অজ্ঞানাচ্ছন্ন যে, ঐ পরমপূজ্য সিদ্ধ মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া প্রকাশ করায়, আমরা বলিয়া থাকি "এটা রামকৃষ্ণ সেবকদের বেজায় গোঁড়ামী; তিনি না হয় একজন সাধকই ছিলেন, তা ব'লে তাঁ'কে একেবারে দেবতা করিয়া তোলাটা বড়ই অন্যায়" ইত্যাদি ইত্যাদি। হায়রে! অন্ধজীব আমরা, জীবই যে শিব, ইহা আমরা কোনও মতে ধারণা করিতে পারিনা। নিজের কোনও শক্তি নাই, সুতরাং, অপরের কোনও শক্তির পরিচয় পাইলেত, তাহাকে "ও কিছু নয়, ও সব ভেল্কী বা বুজরুকী" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উড়াইয়া দিয়া থাকি। হায়! হায়!! এই সব সর্ব্বনাশক বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত বলিয়াই আমরা সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পাই না; অথবা, গত জীবনের কোনও সুকৃতি বলে যদি কোনও মহাত্মা হঠাৎ সাক্ষাতে আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক এমন ভাবে ঠাট্টাবিদ্রূপাদি করি যে, তিনি আমাদের সেই ভীষণ অজ্ঞানতার ব্যবহারে সে স্থানে আর ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারেন না। এই সকল "হাম্‌বড়া হায়" অবস্থায় বিচরণ করিতে হয় বলিয়াই যথার্থ গুরুর অভাব অনুভূত হয়। অহং অভিমানে হৃদয়পূর্ণ থাকিলে সে হৃদয়ে স্থানাভাববশতঃ মহাপুরুষেরা দেখা দেন না। যা'ক, আমি অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি, এস্থানের এ কথা নয়। আশা করি, "মন্ত্র" শব্দের অর্থ, কিছু বুঝা গেল।

তারপর দীক্ষা। দীক্ষা কাহাকে বলে? দীক্ষা শব্দে দু'টী অক্ষর "দী" "ক্ষা" অর্থাৎ "দীয়তে পরম জ্ঞানম্, ক্ষীয়তে পাপ কর্ম্মণি" যাহা পরমজ্ঞান (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) দান করে ও পাপ সকলের ক্ষয় করে তাহাই দীক্ষা। তন্ত্রসারেও উক্ত আছে:—

"দিব্যজ্ঞানম্ যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা, মুনিভিস্তন্ত্র বেদিভি॥"

অর্থাৎ "দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্যজ্ঞান দান করে ও পাপ সকলের ক্ষয় করে এই জন্য তন্ত্রবিদ্ মুনিগণ তাহাকে দীক্ষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" এই দীক্ষা মনুষ্যমাত্রেরই গ্রহণ করা আবশ্যক; যথা তন্ত্রসারে:—

"দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষা মূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥"

"জপের মূল দীক্ষা, তপস্যার মূলে দীক্ষা, অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি যে কোনও

আশ্রমেই বাস করা হউক, দীক্ষার আশ্রয় লইতে হয়।" দীক্ষা না লইয়া জপই হউক আর পূজাই হউক, কিছুই ফলদান করে না, যথা :—

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ পূজাদিকাঃ ক্রিয়া।

ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্ত বীজবৎ॥" (ইতি তন্ত্রসারে)

অর্থাৎ শিলার উপর বীজবপন করিলে যেমন তাহাতে অঙ্কুর উদ্গম হয় না, তদ্রূপ, অদীক্ষিত অবস্থায় জপ পূজাদি করিলে কোনও ফললাভ হয় না। এক্ষণে, 'মন্ত্র' ও 'দীক্ষা' সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু বুঝা গেল। এইবার সেই মন্ত্র ও দীক্ষা প্রদান করে কে? সেই বিষয়ই আলোচ্য এবং তাহাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এখন দেখিতে হইবে গুরু অর্থাৎ উপরোক্ত দীক্ষাদানে সক্ষম গুরু কে হইতে পারে ও তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে গুরুর প্রণামের ব্যাখ্যার দ্বারা যে গুরু নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহাকে সদগুরু বলে। "সৎ" শব্দে একমাত্র আত্মা; কারণ, আত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু, আত্মা ব্যতীত সবই অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহা অসৎ এবং যাহা নিত্য তাহাই সৎ। সেই পরমাত্মাকে যিনি চিনাইয়া দেন, তিনিই সদগুরু। জীবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া 'সৎ' বস্তু চিনাইয়া দেওয়ার জন্যই তিনি সদগুরু নামে অভিহিত হন। সেই সদগুরু বড়ই দুর্লভ, তাহা না হইলে, বৎসর বৎসর শিষ্য নিকটে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রাহক গুরুর অভাব নাই—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ।

দুর্লভঃ সদগুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপনাশকাঃ॥"

এক্ষণে, গুরু কে ইহাই বিচার্য্য। শাস্ত্র বলে—"আত্মৈব গুরুরেকঃ" অর্থাৎ "আত্মাই একমাত্র গুরু।" অর্থাৎ আমার ভিতরেই আমার গুরু আছেন; এই জন্য সাধক গাহিয়াছে—

"ঘুমালে যে জেগে থাকে, সেই তোমারই গুরু বটে।

সে আছেরে হৃদয় মাঝে, হের তারে অকপটে॥" ইত্যাদি।

আমি ঘুমাইলে কে জাগিয়া থাকে? আমার প্রাণ নয় কি? তবে প্রাণই আমার গুরু! সেই গুরু যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আমিও আছি, আর তিনি যখন এ দেহ ত্যাগ করেন, তখন আমি কোথায়? গুরুই জীবের লয়কর্ত্তা ও গুরুই জীবের রক্ষাকর্ত্তা। গুরু ভিন্ন জীবের যে আর অন্য গতি নাই! সুতরাং এমন যে গুরু, এমন যে প্রিয়তম বস্তু গুরু,—তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা আমাদের

কোনও মতে উচিত নহে। যে গুরুর অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব রহিয়াছে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকাতেই আমাদের এত জ্বালা যন্ত্রণা!! ঐ যে "আত্মা বৈ গুরুরেক" বলা হইয়াছে, উহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় "আত্মাই গুরু"; সুতরাং সেই আত্মা আমার এই দেহের মাঝে কোথায় কি ভাবে আছেন তাহা জানা আবশ্যক। বলিয়াছি প্রাণই আমার গুরু; কেননা, প্রাণ না থাকিলে আমি থাকি না, প্রাণ আছে তাই আমিও আছি, সুতরাং প্রাণ আত্মা, আত্মাই প্রাণ। প্রাণ ভিন্ন আমার আপন আর কে আছে? সেই প্রাণই (আত্মাই) গুরু; কারণ:—

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ, প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

অর্থাৎ প্রাণই ভগবান ঈশ্বর প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা, প্রাণই সমস্ত জীবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সমস্ত জগতই প্রাণময়। এই শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বলিখিত গুরু প্রণামের তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলব্ধি হয়। প্রাণই এক মাত্র যে সার বস্তু, তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলাই বাহুল্য। আমরা সকলেই সচরাচর বলিয়া থাকি ত যে "নিজের প্রাণের চেয়ে বড় ত কেহ নয়?" তবেই যদি প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়, তাহা হইলে, গুরু কি প্রাণাপেক্ষা ছোট? আর যদি বলা যায় যে "গুরু প্রাণ অপেক্ষাও বড়, তাহা হইলে "প্রাণের অপেক্ষা বড় কেহই নাই" একথাটা ভুল হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক নিজের প্রাণাপেক্ষা বড় কেহ হইতেই পারে না; সুতরাং প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং গুরুই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, এই দুইটীর সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, গুরুই প্রাণ, প্রাণই গুরু স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যথা:—"প্রাণহবৈ মাতা, প্রাণহবৈ পিতা, প্রাণহবৈ আচার্য্য"; অর্থাৎ "প্রাণই পিতা, মাতা এবং আচার্য্য বা গুরু।" আবার, গুরু যে, মন্ত্রও সে, এবং উপাস্যও সে।

আমাদের চলিত দীক্ষাকালীন গুরু বলিয়া দিয়া থাকেন যে "গুরু, মন্ত্র ও উপাস্য অভেদ জ্ঞান করিবে।" ইহা অতীব উচ্চ উপদেশ, কিন্তু, গুরু, মন্ত্র ও উপাস্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ গুরু কে, মন্ত্র কি, এবং উপাস্য কে, ইহা সম্যক না জানিলে অভেদ জ্ঞান কিরূপে হয়? আমি দেখিলাম, "গুরু" সম্মুখে বসিয়া, "মন্ত্র" শুনিয়া লইলাম—দুই একটী বা ততোধিক সংখ্যক অনুস্বার যুক্তবর্ণ, এবং আপন "উপাস্য" মনে মনে গঠন করিয়া লইলাম; এই স্পষ্ট তিনটী দেখিতে পাইতেছি। এই তিনে এক কি করিয়া করি?

সুতরাং, ঐ সকল সম্যক জ্ঞাত না হইলে অভেদজ্ঞান অসম্ভব। "মন্ত্র" যে প্রাণ, তাহা শিব স্বয়ং বলিয়াছেন; যথা,—কুলার্ণব তন্ত্রে :—

"শিবাদি ক্রিমি পর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনং।
নিশ্বাস শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়॥"

অর্থাৎ "শিবাদি ক্রিমি পর্য্যন্ত প্রাণিগণের শ্বাসরূপে যে নিশ্বাস বহিতেছে তাহাই মন্ত্র।" ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাণবায়ুই একমাত্র মন্ত্র। এই প্রাণবায়ু চঞ্চল থাকায় আমাদিগের মনও চঞ্চল হয় এবং ইহাই আমাদিগের জীবভাব (অর্থাৎ, প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই জীবভাব এবং তাহার স্বতঃ স্থির ভাবই শিবভাব)। প্রাণের চঞ্চলতায় যে মনের চাঞ্চল্য ইহা সত্য, তাহা বোধ হয় বলিতে হইবে না। হঠপ্রদীপিকায় বলে "চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।" আমরাও তো সচরাচর দেখিতে পাই যে, যখন আমরা একস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকি, সেই সময়, প্রাণটা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বতঃই স্থির হইয়া যাওয়ায়, মনটাও যেন কেমন এক রকম, ক্ষণকালের জন্যও উন্মনা-ভাবগ্রস্ত হয়। সেই সময় যেন আমাদের কোনও চিন্তা থাকে না; কিন্তু সেটা এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে, আমরা তাহা সব সময় ধরিতে, বা বুঝিতে পারিনা। সেই উন্মনা ভাবই মনের স্থির অবস্থা। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা বুঝিলাম, যে প্রাণই গুরু ও প্রাণই মন্ত্র; আর প্রাণই যে উপাস্য তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ, প্রাণই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। প্রাণ আছে বলিয়াই উপাস্য জ্ঞান হইতেছে এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রাণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গুরু, পিতা মাতা ইত্যাদি অর্থাৎ যে কোনও উপাস্যই হউক না কেন, তিনিই প্রাণরূপে আমার মধ্যে বর্ত্তমান। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, প্রাণই গুরু; সেই গুরু আমাদের এই দেহ মন্দিরেই বিরাজ করিতেছেন; সাধকের গানে আছে—

"গুরু যে, সে কল্পতরু, হৃদয় মন্দিরে।"

"এই হৃদয় মাঝেই গুরু আছেন" বলিয়া যেন, "তবে আবার বাহিরের গুরুর আবশ্যক কি?" একথা মনে করিবেন না; কারণ, হৃদয় মাঝে প্রাণরূপী গুরু সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সত্য; কিন্তু সেই প্রাণকে চিনাইয়া দেয় কে? মনে করিতে পারেন "প্রাণকে আবার চিনাইবার আবশ্যক কি? প্রাণ যখন নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে রহিয়াছে অথবা এই নিশ্বাস প্রশ্বাসই যখন প্রাণ, তখন সে প্রাণকে চিনেনা কে?" কিন্তু তাহা নহে; আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস বলিতে যাহা বুঝি তাহা প্রকৃত নিশ্বাস প্রশ্বাস হইলেও তাহাকে প্রাণ বলে না।

কেননা, নাসিকা দ্বারা (মুখ দ্বারা, যেরূপেই হউক) বাহিরের বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করাকে নিশ্বাস, ও সেই বায়ুকে পুনরায় বাহিরে ত্যাগ করাকে প্রশ্বাস বলে, ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি, সুতরাং, সেই বাহিরের বায়ুকে কথনও প্রাণ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যোগীগণ বাহিরের বায়ুগহণ না করিয়াও জীবিত থাকেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়ুই যদি প্রাণ হয়, তাহা হইলে, মৃতব্যক্তির দেহে "পম্প" নামক যন্ত্রবিশেষের দ্বারা বায়ু প্রবেশ করাইলে তাহার চৈতন্য আসে না কেন? আরও একটা কথা, মৃত্যুর পরে কি দেহ হইতে বায়ু নিঃশেষ হইয়া যায়? তাত' যায় না; মৃত্যুর পরেও দেহের মধ্যে বায়ু থাকে; তা'না থাকিলে, বাহিরের বায়ুর চাপে উহাকে চেপ্টা করিয়া ফেলিত!! তাহা হইলে, মৃত্যুর পরেও দেহে বায়ু যখন থাকে, তখন, তাহাকে প্রাণ বলা যাইতে পারেনা। সুতরাং আমরা যাহাকে প্রান বলিয়া জানি তাহা প্রাণ নহে; এস্থলে মহাজনের পথ অনুসরণ করিতে হইবে। সাধক রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন "অজপা হইলে রোধ, জন্মে তবে তার বোধ" অর্থাৎ হংসরূপ অজপা মন্ত্র—নিশ্বাস প্রশ্বাস—রোধ হইলে তবে সেই মহাপ্রাণ বা আত্মার বোধ জন্মে; আরও, শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"হ'কার পুরুষ প্রোক্তঃ 'স'কার—শক্তিরুচ্যতে।
দ্বয়োর মধ্যে ভবেৎ বিন্দু ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দন॥"

এতদ্দ্বারাও জানা যায় যে 'হ'কার 'স'কার রূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে বিন্দুরূপী ব্রহ্ম জনার্দ্দন, বা আত্মা, বা প্রাণ আছেন। পূর্ব্বোক্ত 'হ'কার 'স'কারকে মন্থন করিলে ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দন—বিন্দু—আত্মা, বা প্রাণের প্রকাশ হয়। যেমন দুগ্ধ মন্থন দ্বারা মাখন লাভ হয়, তদ্রূপ ঐ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মন্থনে প্রাণের প্রকাশ হয়। এই মন্থন বা মৈথুন ক্রিয়াই সদ্‌গুরু শিক্ষা দেন এবং এই মৈথুন তত্ত্বই তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'কার, যথা—

"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্তঃ কারণম্।
মৈথুনং জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান সুদুর্লভং॥"

এই মৈথুনতত্ত্বকে যিনি দেখাইয়া, বুঝাইয়া ও শিখাইয়া দেন তিনিই সদ্‌গুরু। যাক, আমি আবার অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি; এ সকল সাধনতত্ত্ব, সুতরাং এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

এক্ষণে, আমরা বুঝিলাম, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণ নহে; অতএব সেই প্রাণকে

চিনাইয়া দিবার জন্যই বাহিরেও গুরু আবশ্যক। যেহেতু সেই প্রাণের বিষয় কোনও পুস্তকে, বেদে, পুরাণে কোথাও নাই; কারণ, শাস্ত্রে বলে "শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।" সুতরাং, সেই প্রাণ অবাঙ্মানসগোচর। সেই নিত্যানন্দ স্বরূপ, অদ্বিতীয়, আমার একমাত্র সুহৃদ, একমাত্র বন্ধু পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রাণরূপী গুরুকে চিনাইবার জন্যই গুরুর আবশ্যক। সেই বাহিরের গুরু, প্রাণরূপী গুরু হইতে কোনও প্রকারে প্রভেদ নহে। কেননা, তিনি একমাত্র প্রাণরূপী গুরুকে চিনাইতে সক্ষম। প্রাণ ভিন্ন প্রাণকে চিনাইবে কে? ভগবান জীবকে ধরা না দিলে, কেহ কি তাঁহাকে ধরিতে পারে? সুতরাং, প্রাণকে চিনাইতে প্রাণই সক্ষম। অতএব সেই গুরুই আমার প্রাণ। এই দেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে গুরু আছেন এবং এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও (বহির্জ্জগতেও) গুরু আছেন। এতএব গুরুলাভ-বাসনা হৃদয়ে বলবতী হইলে, আপন প্রাণকে আপনি জ্ঞাত হইবার বাসনা প্রবল হইলে, অশান্তিপূর্ণ সংসারে শান্তিলাভার্থে কাতর হইলে, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থ গুরুই, নরাকার ধারণ করিয়া (বহির্জ্জগতের গুরুরূপে) আসিয়া বাসনাপূর্ণ করেন। নতুবা, সেই সদ্‌গুরু লাভের গত্যন্তর নাই। সেই নরাকার গুরুকে একমাত্র উপাস্যজ্ঞানেই জীবের চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। যদি এ জগতে কোনও কার্য্য থাকে, তাহা হইলে, একমাত্র সেই গুরুর সন্তোষ সম্পাদন। কারণ, তিনি সন্তুষ্ট হইলে জীবের আর কোনও অভাব থাকে না; পরন্তু, তিনি রুষ্ট হইলে, জীবের আর কোনও মতে নিস্তার নাই। শাস্ত্রে বলে:—

"গুরুঃ পিতা, গুরুর্ম্মাতাঃ গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতি।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥"

অর্থাৎ গুরু পিতা, মাতা, দেবতা ও গতি; শিব রুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে, আর রক্ষক কেহই নাই। তাই বলি, পাঠক পাঠিকাগণ! যদি এ হেন গুরুলাভের অর্থাৎ প্রকৃত গুরুলাভের আন্তরিক বাসনা করেন, তবে হৃদয় হইতে অভিমানরূপী গুরুলাভের অন্তরায়টী একেবারে ঘুচাইয়া ফেলুন; অভিমানের তিলমাত্র সংস্রব থাকিতে হৃদয় গুরু উপদেশ গ্রহণে সক্ষম হয় না। দেখুন গীতাতে অর্জ্জুন যতক্ষণ আমি জানি ভাবে কথা কহিতেছিলেন, (১ম অঃ ২৮ হইতে ৪৫ ও ২অঃ ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত) ততক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপী গুরু কোনও উপদেশ প্রদান করেন নাই; কিন্তু, যখন অর্জ্জুন "আমি তোমার শিষ্য, শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও, বলিয়া শরণাপন্ন

হইলেন (২য় অধ্যায় ৭ম শ্লোক) তখন শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে শিক্ষা বা উপদেশ প্রদান আরম্ভ করিলেন!! তাই বলি, "হাম বড়া হ্যায়" অতীব শত্রু; এই শত্রুই আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহাকে দূর করিতে হইবে। এক্ষণে সেই গুরুর সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আমার সামর্থ্য নাই, কেননা, সে গুরুকে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিতে গেলে, পুনরায় সাধন ব্যাপার আসিয়া পড়ে, যাহা ঐ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

উপসংহারে দুই চারিটী কথা বলিয়া উপস্থিত এ প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা অনেকস্থলে সাধুবেশধারী ভণ্ডদিগের দ্বারা নানারূপে প্রতারিত হওয়ায়, সাধুসন্ন্যাসীর উপর আমাদের কেমন একটা অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে; সেজন্য আমরা প্রকৃত কর্ম্মীগণকে চিনিতে পারি না। আমার বক্তব্য এই যে, ঐ সকল সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে কে কর্ম্মী, কে ভণ্ড, কাহার ভিতর বস্তু আছে, বা কাহার ভিতর নাই, এ সকল তথ্য আবিষ্কারের শক্তি যখন আমাদের নাই, তখন হে আর্য্য নরনারী। সাধুসন্ন্যাসী দেখিলে তাঁহাকে ভক্তি না আসে ক্ষতি নাই; কিন্তু কখনও কাহাকেও অবজ্ঞাপূর্ব্বক তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া যেন নিজের পরকালের পথে কণ্টকারোপণ করিও না। কেন না, কোন সময়ে ভগবান, কাহাকে কি ভাবে, পরীক্ষা করেন, তাহার.ত কোনও স্থিরত্ব নাই! যাঁহাকে দেখিয়া আমার তিলমাত্র ভক্তির উদ্রেক হইল না, হইতে পারে তিনিই একজন সিদ্ধমহাপুরুষ আমার ভক্তির পরীক্ষা কারণ আমার সম্মুখে উপস্থিত!!! তাই বলি গুরুলাভের একমাত্র উপায় অভিমানশূন্য হৃদয়ে গুরুর জন্য কাতরতা। কাতর হইয়া প্রার্থনা করুন, "হে ভগবন! আমাকে সদ্‌গুরু মিলাইয়া দিন, আমার সদ্‌গুরু ভিন্ন উপায় নাই।" দেখিবেন, সেই ভগবানই নরাকারে সদ্‌গুরুরূপে আসিয়া আপনার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন। কিন্তু, এই পথের পথিক হইতে হইলে, আপনাকে কুলশীলাদি বিসর্জ্জন দিতে হইবে; কারণ, ঐ সকল পাশ থাকিলে গুরুলাভের বড় ব্যাঘাত হয়!! "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ সুতরাং এগুলিকেও ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবেন। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তাঁহার কৃপায় আত্মকর্ম্ম সাধন করিবামাত্র, আপনার সাধনায় বাধা দিবার জন্য, আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বিবিধ প্রকারে চেষ্টিত হইবে, সাবধান! বিচলিত হইবেন না। এ সকলও গুরুর কৃপা, কারণ, ইহাই চিত্ত স্থৈর্য্যের পরীক্ষা। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে, এ সকল পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক। যে ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে

ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে সদা সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চালাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন, আজ সাধনাভাবে তাঁহাদেরই বংশধরগণ এই আত্মকর্ম্মরূপ মহাধর্ম্মে বাধা প্রদান করিতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না !! কি ভীষণ অবস্থা ! কি অজ্ঞানতার পরিচয় !! তাঁহারা নিজে এই সকল জানেন না, বা করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া অপরকেও করিতে দিবেন না। মোটের উপর এই মাত্র জানিয়া রাখিবেন সাধনপথে বহু বাধা। আপনাদিগের নিকট অধমের করযোড়ে অনুনয়, সদ্গুরু প্রদত্ত ধনে কোনওরূপে অবিশ্বাস করিবেন না, কারণ ঐ সকল সাধন-কণ্টক-রূপী নরাকারের পশুগণ আপনার সেই গুরুদত্ত ধন কিছুই নহে, ইহাও প্রমাণের চেষ্টা করিবে। সাবধান, কোনও মতে অবিশ্বাস করিবেন না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—

"সব মানুষ মানুষ নয়, শুধু মানুষের খাপ।
কারুর ভিতর বাঘ ভালুক, কারুর ভিতর সাপ॥"

তাই বলি, সাধনপথে বাধা দানকারী কখনও মনুষ্যপদ-বাচ্য নহে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর" তবে সেই বিশ্বাস আসে কাহার? যাহার প্রাণবায়ু স্থির হইয়াছে। (বিশ্বাস=বিগত শ্বাস) অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু স্থির হইলে সে বিশ্বাস আসিবে। যতদিন তাহা না হয়, সদ্গুরু প্রদত্ত ধন সাধন করিয়া চলুন—তাঁহার আদেশানুযায়ী চলিলে আপনাকে কেহ পশ্চাৎপদ করিতে পারিবে না। সাধনার প্রথম অবস্থায় অতি সাবধানে থাকিতে হয়, কিন্তু তাহা একবার পরিপক্ক হইলে আর কিছুতেই কিছু করিতে পারে না। গাছ যখন শিশু থাকে তখন তাহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, নতুবা ছাগল গরুতে খাইয়া ফেলে; কিন্তু সেই গাছ একবার বড় হইয়া গুঁড়ি বাঁধিয়া ~~যাইলে~~ তাহাতেই আবার হাতী পর্য্যন্ত বাঁধা চলে! সাধনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ জানিবেন। এই গুরুতত্ত্ব পাঠে, যে সকল পাঠক পাঠিকাগণের আজকালের প্রচলিত দীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন "একবার গুরু হইয়া গিয়াছে, এখন ত' আর সে গুরু পরিত্যাগ করিতে পারি না! কি করিব?" তাঁহাদিগকে নিবেদন— গুরু পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? সদ্গুরু লাভ যদি আন্তরিক বাসনা হয়, ভগবৎ কৃপায় তাহা সংঘোটন হইয়া যাইবে। এরূপ গুরুগ্রহণে গুরু ত্যাগ করা হয় না। তাহা শ্রীগুরুরই অপর মূর্ত্তিতে কৃপাবিতরণ বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়।

তাই বলি, পাঠক পাঠিকাগণ! আত্মজ্ঞান লাভার্থে সদ্‌গুরুর চেষ্টা করুন। মনুষ্য জন্ম যেন বৃথায় না যায়। মনের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য মন হইতে বিষয় বাসনা ত্যাগ করতঃ তত্ত্বদর্শন পূর্ব্বক মনকে 'সহজে' আনয়ন করা আবশ্যক, তাহাই মন্ত্র। কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম একমাত্র সদ্‌গুরুর করুণা ব্যতীত হইবার উপায় নাই, যথা ;—

"দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগ দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।

দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরু করুণাং বিনা॥" (হঠপ্রদীপিকা)।

হে নরনারী! এই সংসারিক ত্রিতাপজ্বালার বিকারগ্রস্ত অবস্থা হইতে "সহজ" অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করুন; তাহা হইলে শান্তি পাইবেন। সেই 'সহজ' অবস্থা একমাত্র সদ্‌গুরু ব্যতীত কেহই দিতে পারেন না; অথবা, যিনি পারেন তিনিই সদ্‌গুরু—কারণ "সহ জায়তে যঃ স সহজ" জন্মাবধি যিনি সঙ্গী তিনিই সহজ। তিনি কে? আপনার প্রাণ; সেই প্রাণেতে অবস্থিতি করার নামই সহজাবস্থায় থাকা। তাহাই সর্ব্বপ্রকারের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই উপায় শিক্ষার জন্য যত্নবান হউন—আর্য্যজাতির গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে, পুনরায় আমরা পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত হইতে পারিব।

(গীত।)

(মন) গুরু গুরু করে ফের, গুরুকে তা চিন্‌লে না।
গুরুকে চিনিলে কি আর, থাকে কোনও যাতনা॥
"গুরু" শব্দ দু'টী অক্ষর অর্থ কি তার দেখনা,
(তখন) গুরুই গুরু বুঝিয়ে দেবে, চিন্‌তে বাকী রবেনা।
গুরু কে জানিলে রে মন, তবে পাবি সাধনা,
ভজন-পূজন সব অকারণ, জেনোরে গুরু বিনা॥
শিক্ষা কিম্বা দীক্ষা-গুরু, কে কার গুরু বলনা,
যে গুরু ক'রে (ও) রে মন, ত্রিতাপ-জ্বালা ঘুচে না।
(যারেক) গুরু স্মরণ করলে যখন, (জীবের) যম-ভয় (ও) থাকে না,
(তখন) সেই গুরু করে বল দেখি মন, কেন জ্বালা যাবে না?॥
যদি গুরু লাভিবারে, কর তুমি বাসনা,
(তবে) মানে প্রাণে আত্মাভিমানে, পদতলে রাখনা।

অভিমান থাকিতে হৃদে, গুরু-সন্ধান হবে না,
অভিমান বিষম-ব্যবধান, গুরুর নিকট হ'তে দেবে না॥
ব্যবধান ঘুচিয়ে গেলে, গুরু পেতে দেরী রহে না,
আপনি দেখা দেয় সে এসে, থাকিতে যে পারে না
শরণাগত হ'য়ে একবার, (তাঁরে) কাতর প্রাণে ডাকনা,
(দেখবে) অন্তরে নয় অন্তরে তোর, বিরাজ করে সে জনা॥
"আত্মা বৈ গুরুরেক" শাস্ত্র-নির্দ্দেশ বুঝনা,
যে আছে ব'লে আছ তুমি, যে গেলে তুমি রবে না।
(সেই) সেই আবার নরাকারে, চিনাইতে আপনা,
সদ্‌গুরুরূপে হয়রে প্রকাশ, বিতরিতে করুণা॥
সে জন শুধু প্রেম-ভিখারী অন্য কিছু চাহেনা,
প্রেম-ভক্তি-বিনিময়ে, শিখায় সহজ-সাধনা।
বিপিন বলে হেন গুরু, আর তো কভু পাবনা,
স্থান যেন পাই (তাঁর) শ্রীচরণে, আর কিছু নাই বাসনা॥

সেবক শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০—

সংসারে সুখী কে ?

যখন আমরা বিস্ফারিত নয়নে এই পরিদৃশ্য সংসারের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, মানব-হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি প্রভৃতির বিষয় যখন স্থির চিত্তে বিচার করি, তখন দেখিতে পাই এ সংসারের কি ধনী—কি দীন—কি জ্ঞানী—কি মূর্খ—কি অন্ধ—কি চক্ষুষ্মান সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে ইহজন্মে যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, মণিমুক্তা-খচিত দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা যাঁহার বিশ্রামস্থল এবং শত শত ব্যক্তি যাঁহার ইঙ্গিতানুবর্ত্তী, পাঠক ঐ শুন তিনি "বিধাতা কেন তাঁহাকে আরও অধিক সুখী করিলেন না"—বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছেন, আবার জীর্ণ কুটীরবাসী, ভিক্ষুক "হায়রে, জীবনে একদিন সুখভোগ হইল না" বলিয়া বিধাতার পক্ষপাতীত্ব কীর্ত্তন করিতেছে। পাঠক তুমি এ সংসারে এমন কোন স্থান দেখিবে না, যেখানে অভাবের তাড়না নাই—জগতে এমন কোন লোক দেখিবে না, যিনি বলিতে

পারেন—আমি "সুখী।" এই সংসার-বিপণীতে সুখ একমাত্র বিক্রেয় পদার্থ, আর সংসারবাসী তাহার নিত্য ক্রেতা।

মোহান্ধকারে নিমজ্জিত মানব আপনার অর্থগত দারিদ্র্য ও অপরের স্বাচ্ছল্য দেখিয়া মনে ভাবে যে বিধাতা বড়ই পক্ষপাতী—তাঁহার দৃষ্টিতে সকলে সমান নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি তাই? যে বিধাতা ধনীর বিহারের জন্য উন্মুক্ত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দিয়াছেন, সেই বিধাতাই ত হে দরিদ্র! তোমার দিবসের শ্রান্তি-জনিত স্বেদ অপনোদনের জন্য সেই একই প্রান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে বিধাতা অমল-ধবল মর্ম্মর বিনির্ম্মিত প্রাসাদবাসীর অবগাহনের জন্য সুনির্ম্মল তটিনীর সৃজন করিয়াছেন, সেই বিধাতা ত তোমার জন্য সেই একই তটিনী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তোমার ঐ স্বেদযুক্ত কলেবরের শীতলতা সম্পাদন জন্য প্রভাতে যে মৃদুমন্দ-মলয়-পবন প্রবাহিত হয়, ধনীর ঘৃত-দুগ্ধ-নবনীত পুষ্ট, চম্পক-বিনিন্দিত শরীরের জন্যও ত তাহা হয়, তবে তোমার এত ক্ষোভ কেন? যে তরুণ অরুণ যামিনীর দুর্ভেদ্য তমোরাশি অপসারিত করিয়া ধনীর অট্টালিকা সুবর্ণ-বর্ণে রঞ্জিত করে, সেই অরুণও ত আবার তোমার কুটীর আলোকিত করে। যে কোকিল ধনীর কর্ণকুহরে কুহু কুহু ধ্বনি বর্ষণ করে সেই কোকিল ত তোমারও কুটীর পার্শ্বে আম্র-পল্লবের অন্তরালে বসিয়া বসন্তের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। তবে বল দেখি, তুমি বিধাতার নিরপেক্ষতার এত দোষ-কীর্ত্তন কর কেন? তুমি হয় ত বলিবে, বিধাতা যেমন ধনীর ও আমার একই আকাশ, একই বাতাস, একই সরিৎ, একই প্রান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তেমনি একই প্রকার বৈষয়িক সম্পদ করিলেন না কেন? করিলেন না কেন—এ প্রশ্নের উত্তর, হে দীন! তুমি তোমার নিজের অন্তরকে একবার জিজ্ঞাসা কর। দেখিবে তোমার অন্তর তোমাকে বলিবে,—ভগবানের চক্ষে সকলই সমান—মানুষ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে বৈষয়িক সুখ দুঃখের অধিকারী। তোমার অন্তর তোমাকে বলিয়া দিবে, হে দীন! তুমি পূর্ব্বজন্মে ভগবানের আদেশ মত বা মনুষ্যোচিত কর্ম্ম কর নাই তাই তোমার এই দারিদ্র্য।

এখন এস ধনী, একবার তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ পীযুষ-ধবল অট্টালিকায় বসিয়া অসংখ্য আত্মজন পরিবেষ্টিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের অট্টহাসিতে আত্ম-ভুলিয়া কি সুখ পাইতেছ? দরিদ্র পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে ইহজন্মে যদ্ভই অর্থ-কষ্টে আছে জানি, আর তুমি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে ইহজন্মে

বড়ই সুখে আছ জানি, কিন্তু বল দেখি, তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয় কি ? ঐ যে অনিন্দ্যসুন্দরী কামিনীকুল তোমার ভুজলতা বেষ্টিত হইয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় এক একবার মৃদু মৃদু হাসিতেছে, উহার হৃদয়ে কি কাল-কূট রহিয়াছে তাহা তুমি জান কি ? হে ধনী ! তুমি কি বলিতে পার, তোমার ঐ অভিন্নহৃদয়া রমণীগণ কখনও তোমার সন্দেহের পথবর্ত্তী হয় নাই ? আর যে ঐ বিষয় বিভবের গর্ব্বে তুমি এত স্ফীতবক্ষ হইতেছ, বলিতে পার তোমার ঐ বিষয় চিরকাল একই ভাবে রহিবে কি ? পূর্ব্বতন পুরুষগণের কর্তৃত্বাধীনে তোমার সম্পত্তি যাদৃশী বিস্তৃত ছিল, বলিতে পার কি যে তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই ? আমার বিশ্বাস হে ধনী ! তুমি কখনই একথা গর্ব্বিতভাবে বলিতে পার না যে, তোমার এ দেহে কখনও রোগের সঞ্চার হয় নাই—তোমার চিত্তপ্রসাদনকারিণী কখনও তোমার অপ্রিয়ভাজনী হয় নাই—তোমার সম্পত্তি কখনও হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা হয় নাই।

এই যে পঞ্চ মহাদেশাত্মক অবনীমণ্ডল, এই অবনীমণ্ডলে যাহা কিছু চেতনাচেতন পদার্থ থাকুক না কেন তৎসমুদায়ের ক্ষয় অনিবার্য্য। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত, শীতের পর বসন্তের আগমন যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, তেমনি সুখের পর দুঃখের আগমনও স্বাভাবিক। যে রোম ঐশ্বর্য্যবলে একদিন সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, হে ধনী ! একবার সেই রোমের বর্ত্তমান অধোগতির বিষয় চিন্তা কর। একদিন তোমার ঐ ব্যোমস্পর্শী প্রসাদ যে ধূলিসাৎ হইবে না, তাহার কি কোন স্থিরতা আছে ? এ সংসারের যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থ যে ক্ষণবিধ্বংসী—ক্ষণপ্রভার ক্ষণকালস্থায়িনী প্রভাপেক্ষাও যে ইহার প্রভা ক্ষণস্থায়ী। তাইত শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

বাতান্তর্দীপ শিখালোলং জগতি জীবিতম্।
তড়িৎ স্ফুরণ সঙ্কাশা পদার্থ শ্রীর্জগত্রয়ে॥
কাস্তাদৃশো যাসু ন সন্তি দোষাঃ।
কাস্তাঃ দিশো যাসু ন দুঃখদাহ॥
কাস্তাঃ প্রজা যাসু ন ভঙ্গুরত্বম্।
কাস্তাঃ ক্রিয়া যাসু ন নাম মায়া॥

অর্থাৎ ইহজগতে জীবন বায়ুর অন্তর্গত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল। বিদ্যুতের

ক্ষণস্থায়ী প্রকাশের ন্যায় ত্রিগুণাগতিক পদার্থের শোভা। ঈদৃশ কোন্ দৃষ্টি আছে, যাহাতে কোন দোষ নাই? এমন কোন পন্থা আছে যাহাতে দুঃখের পীড়ন নাই? বিনাশ নাই এমন জীবই বা কি আছে? এমন কোন্ ক্রিয়াই বা আছে যাহা মায়াকর্ষিণী নহে?

সংসারে যে কিছুই চিরস্থায়ী নহে তদুপদেশ প্রদানকল্পে সেই পুরাণ-প্রসিদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যে অমৃতময় বাক্য কয়েকটী বলিয়াছিলেন তাহা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভারতের গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। তিনি বলিতেছেন, "সংসারে আয়ু বৃক্ষপত্রোপরি লম্বমান শিশির বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, কমলদল-পত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় অস্থির। হে রাম! তুমি কামিনীর প্রেমের স্থায়ীত্বে বিশ্বাস করিও, রামধনুরও স্থায়ীত্বে বিশ্বাস করিও; কিন্তু ধনের স্থায়ীত্বে কখনও বিশ্বাস করিও না।"

তাইতে বলিতেছি, হে ধনিন! তুমি ঐ বাহ্য সুখের ক্ষণিক হাসির মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া কি সুখ পাইতেছ? যে ধন অন্যের অভাব মোচনার্থে ব্যয়িত না হইল, বল দেখি সে ধনেই বা প্রয়োজন কি?

"ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে
বলেন কিং যো র্ন রিপূন্ নবাধতে॥"

বিষয়ের বাহ্যসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তুমি মনে কর তোমার মত বুঝি এ সংসারে আর কেহ সুখী নয়। তোমার ঐ অপার 'সুখাপেক্ষা' বুঝি আর সুখ নাই? কিন্তু সত্য কি তাই? বিষয় সুখ ভূমাসুখে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। ভূমাসুখ বাস্তব, বিষয়সুখ তাহার ছায়া—ভূমাসুখ বদন আর বিষয় সুখ দর্পণ। বিষয়ের দিকে তোমার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে বলিয়া হে ধনী! তুমি মনে করিতেছ তুমি বড় সুখেই আছ? কিন্তু তাহা মনে করিও না। জানি, জীব যাহা কিছু করে তাহা সুখেরই জন্য করে—জানি "যথা বৈ করোতি, সুখমেব লব্ধা করোতি" কিন্তু অভিমত ধ্যানযুক্ত যোগীপুরুষ স্বকীয় নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ স্থির অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত আত্মচৈতন্যের যে সুখ অনুভব করেন, তুমি কি সেই ভূমাসুখ অনুভব করিতে পার? তা পারিবে কেন? নিত্য-ধ্যান-যুক্ত যোগী যে ভাবে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের বোঝা শিরে বহন করিতে পারেন, হে ধনি, তুমি কি সেই ভাবে ত্যাগের ব্রতে ব্রতী হইতে পার? তুমি কি তোমার অতুল ধনসম্পত্তি ও রাজপ্রাসাদাবলী জ্বলন্ত হুতাশনে বিদগ্ধ হইতে দেখিয়া সুহাস্য আস্যে বলিতে পার—"মিথিলা দগ্ধ হইতেছে তাহাতে আমার কি?"

মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি জানিতে পারিতেছ না যে জগতে সমস্ত বস্তুই ক্ষয়-পরিণামী। সমস্ত সংযোগই বিয়োগ-পরিণামী। জীবন-প্রবাহ বহিয়া কালসিন্ধুর দিকে ধাবিত হইতেছে—সৃষ্টির বিশালবপুঃ প্রলয়ের করাল কবলে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে—অভ্যুন্নতি পতনই সূচনা করিতেছে—মিলন বিরহের জন্য, হে মোহান্ধ ধনি! তাহা কি তুমি মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া থাক ? যাহা অনিত্য তাহা অশুচি, সুখ, দুঃখ বোধ ও আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা। তুমি এই অবিদ্যার মহাধাঁধায় পড়িয়া যাহা দুঃখের আকর তাহাকেই সুখের আকর মনে করিতেছ—বল দেখি ইহজগতে তোমার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে ?

কস্তুরিকা-মৃগ যেমন আপনার বক্ষঃস্থ কস্তুরিকার গন্ধে উন্মত্ত হইয়া কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে তাহা নির্ণয়ের জন্য ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায় তুমিও তেমনি বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা নিবন্ধন ভূমাসুখের ছায়ামাত্র দর্শন করিয়া সেই ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছ ; কিন্তু জান কি ছায়ার অনুসরণে কায়া মিলে না ?

*আপন পুত্র কন্যার সুধাংশুবদন নিরীক্ষণ করিয়া তুমি বড় সুখেই কাল-*যাপন করিতেছ ? কিন্তু জান কি এ সব ভোজের বাজী। যে পুত্রের সুখের জন্য তুমি নিজে অনাহারী থাকিয়া, ভিক্ষুককে মুষ্টি পরিমাণ ভিক্ষা না দিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিতেছ, তাহা কি তোমার সঙ্গে যাইবে ? যখন তোমার এই দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া "সাধের পাখী" কোন্ অচেনা রাজ্যে পলায়ন করিবে, তখন ঐ যে অসংখ্য নরকঙ্কাল পরিপূর্ণ শ্মশান দেখিতেছ—যেখানে শৃগাল কুক্কুরগণ ভীতিজনক স্বরে চীৎকার করিতেছে, সেখানে তোমার পুত্রই তোমাকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিবে—তখন—

কোথায় রবে ঘর বাড়ী তোর কোথায় টাকা কড়ি !

তাইতে বলি হে অন্ধ মানব! পুত্র-কন্যার বদনারবিন্দ দর্শনে আনন্দিত হইয়া সেই ভূমানন্দকে ভুলিও না।

তুমি মনে করিতেছ তোমার ঐ পুত্রের কমনীয়-বদন তোমাকে বড়ই আনন্দিত করিতেছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি সত্য সত্যই কি তাই ? কই সদ্যমৃত পুত্রের উপর ত তোমার স্নেহ পরিদৃষ্ট হয় না—কই মৃত পুত্রকে দেখিয়া ত তোমার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে না ? উঠিবে কেন ? তুমি মোহান্ধ, তাই তুমি বুঝিতে পার না যে—

ন বারে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু
কামায় পতিপ্রিয়ো ভবতি

ন বারে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মস্ত
কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ॥

জগত প্রিয় হয় সেই সখার স্বরূপ বলিয়া—পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, তাঁহার "আত্মজ" বলিয়া। যাঁহার যত আত্মজ্ঞান তিনি তত জগতকে আপনার মত দেখেন—সমগ্র জগত তাঁহার নিকট কুটুম্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহার প্রাণ জগত-প্রাণের সহিত একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া তিনি পরোপকারপ্রাণ হন।

কিন্তু হে মোহান্ধ মানব! তুমি আমি ত তাহা পারি না—আত্মাকে সর্ব্বভূতে তুমি আমি ত দেখিতে পারি না, তাইতে ত এই জগত তোমার আমার নিকট কেবল ভোগের আগার বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্তর্নিহিত আনন্দ বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতির প্রেরণায় প্রকৃতিগত সুখকেই যথার্থ সুখ মনে করিয়া তাহাতে লিপ্ত হই। কস্তুরিকা-মৃগের ন্যায় মোহান্ধ জীব আমরা,—আমরা আমাদের ভিতরে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহা জানিতে না পারিয়া পুত্র কন্যা দারাদিতে তাহার কারণ অনুসন্ধান করতঃ বৃথা প্রতারিত হই। কিন্তু যাহার লক্ষ্য ভূমানন্দ—যাহার লক্ষ্য সুখদুঃখবিহীন শুদ্ধানন্দ, সে কি দুঃখ বহুল ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সুখে তৃপ্ত হইতে পারে? স্পর্শমণি দর্শন যাহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য, তাহার চিত্ত কি তুচ্ছ শিলাখণ্ডে পরিতৃপ্ত হইতে পারে?

যত কিছু পার্থিব সুখ দেখ না কেন সকলই পরিণাম দুঃখদায়ী। আজ তুমি প্রাসাদবাসী—কাল তুমি শ্মশানবাসী—আজ তুমি ধনী—কাল তুমি ভিক্ষুক—আজ তুমি যুবা—কাল তুমি বৃদ্ধ। আজ তোমার যৌবন কালে যে শক্তি বা ক্ষমতা আছে, কাল তুমি বৃদ্ধ হইলে তাহা রহিবে না। তাইতে ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

পরিণাম তাপসংস্কার দুঃখৈগুণবৃত্তি নিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।

অর্থাৎ পরিণাম, তাপ এবং সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ এবং গুণবৃত্তি-বিরোধ হেতু যাবতীয় বিষয় সুখ বিবেকীর নিকট দুঃখ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

আমরা অনুরাগের অন্ধকারে নিমগ্ন বলিয়া বিষয়কেই সুখানুভবের হেতু বলিয়া মনে করি, নিত্য নূতন কামনার পূরণ করিয়া হৃদয়ে বড়ই সুখানুভব করি, কিন্তু আমাদের এবম্বিধ কামনার দ্বারা সুখের পরিবর্ত্তে যে দুঃখই উৎপন্ন হয় তাহা একবারও ভাবি না—অথবা ভাবিবার অবকাশ পাই না।

ন জাতু কাম কামনামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥

কামনা দ্বারা কাম কখনও নষ্ট হয় না—ঘৃতাহুত বহ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অতএব হে বিষয়বিমুগ্ধ,, অন্ধ পথভ্রান্ত সুখান্বেষী মানব! এস একবার ত্যাগের সুবিশাল ছত্রতলে। এখন বুঝিলে ত তৃষ্ণা কখনও শান্ত হয় না—এখন বুঝিলে ত তৃষ্ণা চিত্তে নিয়ত বাস করতঃ শান্তিবৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিয়া মনুষ্যকে গভীর দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন করে। বুঝিলে ত এই অজ্ঞানসম্ভূত তৃষ্ণা আত্মতত্ত্ব উদ্ভাসন পক্ষে অন্ধকার রজনী। কুরঙ্গিণী ব্যাধ-বীণাধ্বনিতে উন্মাদিনী হইয়া পরে যেমন তাহার শরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তেমনি তৃষ্ণা-মায়াবিনীর কুহকে মুগ্ধ মানবও অপার যাতনা ভোগ করে।

বিষয় সুখ প্রদান করে পরিণামে দ্বিগুণ দুঃখ দানের জন্য, ক্ষণপ্রভা প্রভা দান করে দ্বিগুণ অন্ধকার বিস্তারের জন্য, মলয়ানিল প্রবাহিত হয় তীক্ষ্ণ ঝটিকা বিস্তারের জন্য। বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দ, যৌবনে পাপচিন্তার সূচনা করে—আবার যৌবনের প্রমোদ, বার্দ্ধক্যের দুঃখ-রূপে পরিণত হয়—জীবনের এক মুহূর্ত্তের সুখ পর মুহূর্ত্তে দুঃখের কারণ। অতএব এস ভাই! সংসারের ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে বৃথা প্রলোভিত না হইয়া যাহা নিত্য—যাহা ভূমা—যাহা অনন্ত, তাহার দিকে অগ্রসর হই। তাহা হইলে—

দুঃখ দূরে যাবে, মনে সুখ পাবে,

সদা নিরাতঙ্কে রবে।

তবে আয় ভাই!—আজ হ'তে একবার ত্যাগের বর্ম্মে চর্ম্ম আচ্ছাদিত করি—আয় ভাই, সমস্ত জগত আজ আপনার ন্যায় দেখিতে শিখি—আর শিখি, এ জগতে ভোগে সুখ নাই, ত্যাগে সুখ। যথা—

সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎ সুখ শান্ত চেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানা মিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্।
নাহত্যক্ত্বা সুখমাপ্নোতি ন্যাহত্যক্তা বিন্দতে পরং
নাহত্যাক্ত্যাচ ভয় শেতে ত্যক্তা সর্ব্বং সুখী ভব॥

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

—•—

স্বপনের চাঁদ।

নীরব নিভৃত গাথা শুনিয়াছি কবে।
ববে কোন্ অতীতের স্মৃতি কথা হবে॥
চাঁদে মাখা ছবি সম, ভাসে মূর্ত্তি অনুপম,
অখণ্ড মণ্ডলাকার হৃদয়ে সুন্দর।
বিজলী বিকাশে যথা নবজলধর॥
কত নিশি কত দিন কত সন্ধ্যা-বেলা।
উদ্‌ভ্রান্ত এ চিত্ত সনে কান্ত প্রেম-খেলা॥
সারা দিন গেছে কেঁদে, কত নিশি সেধে সেধে,
শ্রীপদে ভগন-হিয়া দিয়াছি অঞ্জলি।
কভু কি দিয়েছে ধরা সেই চতুরালী॥
আছে তাঁর বাছা দিন সফল মুহূর্ত্ত।
বসিবে অন্তরে যবে নিরঞ্জনে ধূর্ত্ত॥
নয়ন মুদিত রবে, ঊর্দ্ধমুখী প্রাণ হবে,—
ভ্রূযুগের মাঝে আসি' পূর্ণমূর্ত্তি তাঁর।
দাঁড়াবে নাচায়ে চিৎ-স্পন্দনে অপার॥
নিবাত-নিষ্কম্প স্থির দীপ শিখা প্রায়।
মূলাধার হতে প্রাণ হেরিবে তাঁহায়॥
জীব-ভাব মুছে যাবে, রবে মন স্থির হবে,
জীবে শিবে মিশে যাবে আধেয়ে আধার।
উথলিবে শুষ্ক প্রাণে প্রেম পারাবার॥
চিদাকাশে রাকা-চাঁদ তখন উদিবে।
সঙ্কল্প বিকল্প সব চির লীন হবে॥
মহাব্যোম কম্বু-নাদ, শুনাবে অধর চাঁদ—
"এক আমি ছাড়া কেহ নাহি প্রাণারাম।
স্মরণ জাগাতে জীব-হৃদে অবিরাম॥"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়।

"বুভুক্ষুরিব সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগ মোক্ষ নিরাকাঙ্ক্ষী বিরলোহি মহাশয়॥"

অষ্টাবক্র সংহিতা।

নারায়ণগঞ্জ ঢাকাসহরের প্রধান বন্দর। কলিকাতা হইতে ঢাকা যাত্রিগণ শিয়ালদ ষ্টেষণে রেল চাপিয়া গোয়ালন্দ পৌছেন, সেখান হইতে জাহাজে নারায়ণগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত আসেন; পরে পুনঃ রেলযোগে ১০ মাইল পথ চলিয়া ঢাকা নাবিয়া থাকেন। নারায়ণগঞ্জ টাউনে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্‌সেফী চৌকি এবং মিউনিসিপেলিটি আছে। এখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরপূর্ব্বকোণে সুপ্রসিদ্ধ নাঙ্গলবন্দ স্নানক্ষেত্র। ব্রহ্মপুত্রস্নান-যোগ উপলক্ষে বাসন্তী অশোকাষ্টমী সময়ে সেখানে সুবৃহৎ মেলা বসে এবং নানাদিগদেশবাসী স্নানার্থী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বুধাষ্টমী যোগ হইলে সকল তীর্থই স্নানদিবস এই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন; বৎসরের একদিন এস্থান তীর্থরাজরূপে পরিগণিত হয়েন। ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ষষ্ঠাবতার মহাত্মা পরশুরামের মাতৃহন্তা কুঠার এই তীর্থক্ষেত্রে হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল,—অন্য তীর্থাদি স্নানে তাঁহার যে মহাপাতক দূর হয় নাই, এখানে স্নান করিলে তাহা দূর হয়। নাঙ্গলবন্দ তীর্থ স্নানের ইহা বিশেষ মাহাত্ম্য। কিম্বদন্তী আছে, বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী দেবীসহ এই পবিত্রতীর্থে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন এরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করাতেই ভার্গববীর পরশুরামের হস্তস্থিত পরশু পড়িয়া যায় এবং তিনি মাতৃবধরূপ মহাপাতক হইতে রক্ষা পান। পরবর্ত্তীকালে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ, বীরাগ্রণী হলধারী বলভদ্রদেবও ব্যাসশিষ্য পুরাণবেত্তা মহামুনি সুতকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হন এবং সেই ব্রহ্মকুণ্ডস্নানে পাপমুক্ত হইয়া লোকহিত কামনায় তিনি এই পরমতীর্থজল সাধারণের সুখলভ্য করণার্থ লাঙ্গলদ্বারা ভূমিখাত খনন করিতে করিতে এ স্থানে আসিলে তাঁহার লাঙ্গল আর চালাইতে সক্ষম হন নাই। শ্রীশ্রীবলরামজীর লাঙ্গল এই ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া তদবধি ব্রহ্মপুত্রনদের এই সীমান্ত তীর্থ "লাঙ্গল বন্ধ" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, উক্ত তীর্থের তথ্য নির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লাঙ্গল বন্ধ যে পূর্ব্ববঙ্গে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ জলতীর্থ মহিমায় গৌরবান্বিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বনামধন্য স্বামীপাদ শ্রীল বিবেকানন্দজি যৎকালে ঢাকানগরীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তিনিও পূজনীয়া মাতৃদেবীসহ সশিষ্যে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থক্ষেত্রে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ টাউনের এক মাইল পশ্চিমে প্রান্তবর্ত্তী দেওভোগ গ্রাম। এই নগণ্য গ্রামেই নরপুঙ্গব শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের আবাসবাটী। তাঁহার জন্ম-ক্ষেত্র বলিয়া এবং তাঁহার তপস্যাপূত ভাগবতী তনুর ভস্মাবশেষ বক্ষে করিয়া, দেওভোগগ্রামও তীর্থীভূত হইয়াছে। উক্ত লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবিত-কালে বহু সাধুভক্ত তাঁহার পুণ্যময় দর্শনাভিলাষে তথায় আসিতেন। বেলুড় মঠের স্বামীপাদ শ্রীমৎ তুরীয়ানন্দজি, ত্রিগুণাতীতজি, সারদানন্দজি, এবং শুদ্ধানন্দজি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে আসিয়া সকলেই সে স্থানে গিয়াছেন।

মহানুভব নাগমহাশয়ের নরলীলা অবসানের দুই বৎসর পর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজি ঢাকা নগরীতে কিছুকাল অবস্থানান্তর পৌরাণিক পীঠস্থান শ্রীশ্রীকামাখ্যামায়ী দর্শনার্থ কামরূপ তীর্থে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির আকর্ষণে ইত্যবসরে তিনিও দেওভোগ গ্রামে গমন করেন। মহাপুরুষের আবাসস্থান এবং সমাধি-কুটীরে তাঁহার নিত্য পূজার অনুষ্ঠানাদি দর্শন করতঃ স্বামীজি সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। স্নানান্তে মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে পুণ্যশ্লোক নাগমহাশয়ের শান্তিময় ধামের ৺চণ্ডীমণ্ডপগৃহের পূর্ব্ব পার্শ্বের আসনে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল স্বামীজি শয়নাবস্থায় ছিলেন, অপর পার্শ্বের

ফরাসে আগন্তুক ভক্ত ও দর্শকমণ্ডলী বসিয়া বসিয়া তৎকালোচিত আলোচনা করিতেছিলেন। শুনিয়াছি, বেলুড়মঠে ফিরিয়া স্বামীজি গুরুভাইদের নিকট বলিয়াছেন, শেষ জীবনে মাত্র তিনদিন তাঁহার সুনিদ্রা হইয়াছে; সে তিন দিনের একদিন দেওভোগের এই পুণ্য নিকেতনে। তিনি প্রাতে নয়টায় দেওভোগ যান, আহারান্তে বৈকাল প্রায় পাঁচটার সময় ঢাকা অভিমুখে পুনর্যাত্রা করেন। বিদায়কালে শ্রীশ্রীমা (৺নাগ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) বাৎসল্যভরে স্বামীজিকে লালপেড়ে একখানা কাপড় দেন; তিনিও উপহারের বহুমানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "দেখগো, তোমার কাপড়খানা কোথায় রাখ্‌ছি" এবং কাপড় মাথায় বাঁধিয়া সেখান হইতে রওনা হইলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় নাম শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের বিদেহ ভাব পুরাণেতিহাসেও বিরল। তাঁহার দয়া, দীনতা এবং ত্যাগ অতুলনীয়; তাঁহার সর্ব্বভূতে আত্ম-নিষ্ঠ প্রেম ও সেবা সম্পূর্ণ অমানুষিক। রাজর্ষি জনক এবং নানকের ন্যায় আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ আজকালকার গৃহস্থাশ্রমে বসবাস করিয়াও তিনি যে ঋষিজুষ্ট সংযম, তিতিক্ষা, নিষ্কাম-চেষ্টা ও ভগবৎ-প্রাণতার আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সন্ন্যাসাশ্রমপূজিত ত্যাগিজীবনেরও বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা তাঁহার দেবদুর্লভ তন্ময়ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করিবেন। তাঁহার স্বাভাবিক অকিঞ্চন ভাবভক্তি, তাঁহার পবিত্রতা-সন্দীপিত অঙ্গকান্তি, দিব্যতেজপুঞ্জোদ্ভাসিত বদনমণ্ডল এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সরলতাপ্রসূত মহাপ্রাণের খেলা—ঈশ্বরাপিপাসু সহৃদয় দর্শকমাত্রকেই যে কি এক অদ্ভুত অভিনব ভাবে অভিভূত করিয়াছে, যাঁহারা তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই তাহা অনুধাবন করিতে সক্ষম।

পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজি যে দিন প্রথম ঢাকা আসিলেন, সে দিন তাঁহার মুখে অন্য কোন বার্ত্তা শুনিতে পাই নাই; স্বভাব সুলভ উচ্ছ্বাস-ভরে তিনি কেবল নাগ মহাশয়ের বিষয়ই আলোচনা করিয়াছিলেন। অবশেষে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি আমাদিগকে বলিলেন "তাঁর কথা আর কি বল্‌ব, নাগমশায় কি মানুষ ছিলেন রে! দুনিয়াটা ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে এসেছি তাঁর মত আর একটী লোকত দেখলুম না। তাঁকে ২৫ বৎসর দেখেছি, এক ভাব, একটু নড় চড় দেখি নাই; এও কি মানুষে সম্ভবে!" দেখাও যায়, সাধক জীবনে অন্তরে ও বাহিরে কত ভাব পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়; কিন্তু শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় আশৈশব ত্যাগ ও সেবার জলন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ এক আত্মনিষ্ঠভাবেই জীবনের

লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্যমুক্ত অবস্থা না হইলে কাহারও পক্ষে এতাদৃশ ধীর স্থির, অটল অচলভাবে আজীবন অবস্থান কখনও সম্ভবপর নয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি একদিন ৺পুরীধামে জনৈক মুন্সেফ বাবুকে আমাদের সম্পর্কেই বলিয়াছিলেন "নাগমহাশয় এক অদ্ভুত লোক ছিলেন, আমাদের ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ও তিনি ভিতরে যেন একই বস্তু ছিলেন, দেহ কেবল দুটী ভিন্ন ভিন্ন ছিল।" আমাদেরও ধারণা, প্রেম-ভক্তির অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ভাবে অভিন্নাত্মা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুরকে সংসার ধর্ম্মে আবদ্ধ করেন, জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবও সে ভাবেই নরদেব নাগমহাশয়কে সংসার-ধর্ম্মে থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ত্যাগীশ্বর শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ও ভোগসাধন সংসারাশ্রমেই মহা-যোগীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চরম শয্যায় যখন শরীর রোগভারে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ, এমন কি বিন্দুমাত্র পথ্য গলাধঃকরণে অশক্ত—তখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল আনন্দোল্লাসে নিত্যপ্রফুল্ল; আর ভগবৎ প্রসঙ্গমাত্র তিনি মুহুর্মুহুঃ সমাধি মগ্ন হইতেছেন। পাঠক, বলুন দেখি, এ হেন অশরীরি-ভাব কাহার সম্ভবে?

পরমশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অল্পদিন হইল শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের একখণ্ড জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত লোকোত্তর পুরুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি সকলই গুপ্ত, কাস্মিনকালেও তিনি আড়ম্বর কিম্বা লোকপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন না। "যত ব্যক্ত, তত ত্যক্ত" ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। যখন লোক সমাগম সম্ভাবনা কম থাকিত, তেমন দিন দেখিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বর যাইতেন। এতন্নিবন্ধন পরমশ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টার মহাশয় লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" গ্রন্থাবলীতে তাঁহার প্রসঙ্গমাত্রই দৃষ্ট হয় না। আমরা সৌভাগ্যক্রমে শেষ ১২।১৩ বৎসর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময় সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছি; দুঃখের বিষয়, তাঁহার দিব্যদর্শন ও আধ্যাত্মিক অনুভবাদির কথা কচিৎই শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু অনুক্ষণই দেখিয়াছি, ভগবৎপ্রসঙ্গ কিম্বা কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইলে তাঁহার অলোকিক অবান্তর হইত। কথায় কথায় তিনি প্রধানতঃ ভগবান রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এবং অনুভবাদির বিষয় উল্লেখ করিতেন। কখন কখন বা সাধক প্রবর ৺রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গীতাদি হইতে জ্ঞান ভক্তি অনুপ্রাণিত পদাবলীর আবৃত্তি করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরোধে তিনি

কেবল আত্মগোপন করিয়াই চলিয়াছেন; তথাপি, সময় সময় তাঁহার অমানুষিক দেবভাব লুক্কায়িত রাখা অসম্ভব হইত, বস্ত্রাবৃত বহ্নির ন্যায় তাহা স্বতঃই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেন,—"গৃহীর ধর্ম্মশিক্ষা দিবার অধিকার নাই, ত্যাগী সন্ন্যাসী মহাত্মারাই আচার্য্যের আসন নিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট তত্ত্বকথা শুনিলে এবং শিখিলেই জীবের মঙ্গল হয়।" আগ্রহবান তত্ত্বপিপাসু পাঠক উদ্বোধন আফিসে শরৎবাবুর নবপ্রণীত গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। উক্ত মহাপুরুষের স্মৃতিমন্দিব নির্ম্মাণ কার্য্যে এই গ্রন্থ বিক্রয়ের আয় প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং যাহারা গ্রন্থ ক্রয় করিবেন তাহারা একটী মহৎকর্ম্মের সহায়করূপে পুণ্যসঞ্চয়েও সমর্থ হইবেন।

আমাদের শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণী মহাপুরুষের জীবিতকাল হইতেই অতি গোপনে তাঁহার শুভ জন্মতিথির অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার লীলাবসানের পর হইতে স্থানীয় ভক্তগণ প্রকাশ্যভাবে তিথি পূজায় যোগদানের সুবিধা পাইয়াছেন। এতৎপূর্ব্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা বিরোধী শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের অপ্রীতি ভয়ে কেহই একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পান নাই। বহুভাগ্যবলে লেখকের এবার সে শুভযোগে দেওভোগ উপস্থিত থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল। বিগত ২৬শে ভাদ্র, বুধবার, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে তাঁহার জন্মোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ষাকাল—বাড়ীব চতুঃপার্শ্ব জলমগ্ন, নৌকা ব্যতীত কাহারও তথায় গমনাগমনের সম্ভাবনা নাই—তাহাতে আবার সেদিন প্রভাতকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বাদল ও বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, সুতরাং চতুর্দ্দিকের ভক্ত সমাগমের বাধাবিঘ্ন অনেকই বিদ্যমান ছিল। এত প্রতিকূলতা ভেদ করিয়াও প্রায় ২৫০ জন নরনারী উৎসাহভরে তিথিপূজা উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। সামান্য পল্লীগ্রামে এতাদৃশ বিরুদ্ধ অবস্থাসত্ত্বে এতৎ পরিমাণ লোক সমাবেশ কম কথা নহে। কলিকাতা, শ্রীহট্ট এবং জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে কতক কতক ভক্ত আসিবেন সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আগমন হয় নাই। কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত জন্মতিথি দিনের ভ্রান্ত সংবাদে তৎপূর্ব্বেই উপনীত হইয়াছিলেন।

ভক্তপ্রবর নটবরবাবু তিথিপূজা কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের সমাধিকুটীর এবং চণ্ডীমণ্ডপ পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত হইয়াছিল। স্থানীয় নমশূদ্র ভক্তগণ সুমধুর হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঢাকা সদর হইতে প্রায় ৩০জন কলেজের ছাত্র উৎফুল্লচিত্তে উৎসবে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা হরি-

মোনিয়মাদি যন্ত্রযোগে শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় সম্বন্ধে সময়োচিত একটী গান করেন। সে গানটীতে পাঠক দেবমানব ভাবের বিচিত্র সমন্বয় সম্পন্ন এই মহাপুরুষের জন্মকর্ম্মের সূত্রাকার নিবদ্ধ অস্ফুটচিত্র দেখিতে পাইবেন। গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ঢাকার ভক্তগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমাব্যঞ্জক একটী গান এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ও মাথুরলীলাঘটিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলীও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তান, লয় ও ভাবসমন্বিত মনোহর সঙ্গীত উপস্থিত জনমণ্ডলীর সাতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ হইতেও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন। কর্ম্মকর্ত্তৃগণের উদ্যম ও উৎসাহ-আবেগ, ভক্তগণের ভাবোল্লাস এবং কীর্ত্তনের আনন্দধ্বনিতে সেদিন দেওভোগের পুণ্যভবন দিব্যভাবে উচ্ছলিত হওয়ায় মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাব যেন জাগ্রতবৎ প্রতীয়মান হইল। প্রথম বেলায় ঠাকুরের বালভোগের প্রসাদ বিতরিত হইল। রাজভোগ সমাপনান্তে বেলা তিনটার পর দূরাগত ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত অভ্যাগতদিগকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। ভক্তগণের "মহাপ্রসাদের জয়" "অন্নপূর্ণামায়িকি জয়," "শ্রীগুরু মহারাজকি জয়" ইত্যাদি আনন্দসূচক জয়নিনাদে সেই শ্রীধাম আশ্রমভূমি মুখরিত হইয়াছিল। আমরা দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম যে, পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গও ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত মহাপুরুষ-পূজার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে। শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় প্রবর্ত্তিত পরাভক্তির আদর্শ লোকসমাজে যত অধিক আদরণীয় হয়, এ দেশের ততই মঙ্গল।

(তিথিপূজার গান।)

রাগিণী সাহানা—ঝাপতাল।

অমল রূপ রতন, অপ্রতুল রাগ ঘন ;
অমিয় ছাঁকা বদন, কাঁদিছে কে বাছাধন।
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন, নমঃ কেও নন্দন॥
অঙ্গে ভঙ্গ তমোরাশি, পূরববঙ্গ পরকাশি ;
কেরে অকলঙ্ক শশী, ত্রিপুরা অঙ্ক শোভন।
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন ; নমঃ কেও নন্দন॥
আশ্রম ধরম লাগি, পরম স্বধাম ত্যেগি,
দীনসাজে মহাযোগী, এলো কি জগজ্জীবন।
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন ; নমঃ কেও নন্দন॥

আঁখিতে করুণামাখা, হাসিতে প্রেমের শিখা;
একি সেই প্রাণসখা, দুঃখ তাপ নিস্তারণ।
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন; নমঃ কেও নন্দন॥
কা'র হেন আকর্ষণ, কে'ড়ে নেয়রে প্রাণ মন;
আয়রে হৃদয়ধন, আদরে রাখি গোপন।
নমঃ কেও নন্দন, নন্দন; নমঃ কেও নন্দন॥

পূর্ব্ববঙ্গ বামাচার প্রধান স্থান। প্রায় ১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে অদ্বৈতকেশরী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধজ্ঞানতত্ত্ব প্রচারকল্পে কামরূপ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহার প্রভাব এতদ্দেশে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। শুনা যায় দিগ্বিজয়ী পরিব্রাজকরাজ অল্পকাল মধ্যেই তান্ত্রিক বামাচারীদের আভিচারিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সশিষ্যে এ দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমভক্তির আচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্টদেশবাসী বটে, তবু তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশেই আবদ্ধ। তিনি পদ্মার পার আসিয়াছিলেন জানা যায়, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ স্থানে যে তাঁহার পদার্পণ হইয়াছিল তাহা অনিশ্চিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ভক্তির ধর্ম্ম গৌড়ীয় গোস্বামীগণ সহায়ে এ দেশে অসাধারণ প্রসার লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা যে প্রাচীন বামাচারের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই, ইহাও নিঃসন্দেহ। ইদানীং শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয় শুদ্ধ জ্ঞানভক্তি সমন্বিত অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করায় পূর্ব্ববঙ্গের মুখ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে ভোগকলুষিত গৃহস্থাশ্রম পবিত্র হইয়াছে এবং যাঁহার নিরঙ্কুশ ও ভোগাতীত ভাবরাশি ভবিষ্য সাত্ত্বিক বন্যার উৎসস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া এই তামসচার প্রদেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্লাবন আনয়ন করিবে, তাঁহার মহিমাময় নামে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা আমার অকৃতিশীল জীবনের একমাত্র সম্বল হউক।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী জনৈক কাঙ্গাল।

সাধনায় কেন বিড়ম্বনা।

—:•:—

সাধনপথের পথিক হইয়া কেন এত নিত্য নিত্য বিড়ম্বনা আমরা সম্মুখে দেখি—কেন এত জ্বালা যন্ত্রণার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে অদূরে আলোক দেখিয়াও পৃষ্ঠাকৃষ্ণ এক শাঙ্কুর দ্বারায় আবার পশ্চাৎপদ হই—ঐ "আয়" "আয়" আহ্বান শুনিয়া আবার পথ হারাইয়া চকিত নয়নে চারিদিকে মধুর অস্ফুট ডাকের অনুসরণ করি—ইহার তাৎপর্য্য অনেক ঠেকিয়া ঠেকিয়া, অনেক সহ্য করিয়া দয়াময় কৃপায় আজ বোধ আসিল—মূলে এক বিষম ভুল—গোড়ায় এক মস্ত গলদ। তাই দুপা না অগ্রসর হইতে হইতেই চারি পা পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতেছি। মনে আছে বাসনা সেই রাতুল চরণ বক্ষে ধরি—অন্তরে তাঁর মনোময় মন্দির গড়ে গোপনে প্রেমনয়নে নিরীক্ষণ করি ও সব ভুলে যাই—কিন্তু সব ভুলিতে গিয়া দেখি তাঁকেই ভুলে বসে আছি, কারণ ভুলি না আমি—ভুলায় আমায়, কেহ। সেটী হল ইন্দ্রিয়গণ আমার। ইন্দ্রিয়গণ ছাড়া আমি নাই—অতএব উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যাইবার আমার শক্তি নাই। উহারাই আমাদের সকল কাজেই লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনার মধ্যে নাচাইতেছে, উঠাইতেছে, আবার অবশেষে কোন অকূল মোহের সাগরে ভাসাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাধনার অন্তরায় উহারা। উহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার ও উহাদিগের হইতে পরিত্রাণ এখন একমাত্র উপায়।

ইন্দ্রিয়ই মনুষ্য জীবনের নিম্নতম স্তর। এই স্তরের আরো নিম্নে মনুষ্য যাইতে পারে না। এই সন্ধিস্থলে মনুষ্য ও পশুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই জ্ঞান সূর্য্য বিহীন চির মোহান্ধদেশে কত শত হিংস্রক শত্রু উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে—হিংসা, প্রতিহিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, কুআশা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, প্রলোভন, মিথ্যা, চৌর্য্যতা, প্রবঞ্চন, খলতা, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ, কামাদি প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় হুহুঙ্কার প্রতাপে এই নিম্নস্তরে উন্মত্ত হিংস্রক জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, কত বলশালীকে গ্রাস করিতেছে, কত সাধককে একেবারে মোহ সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। কোনটী কখন কাহাকে গ্রাস করিবে কিছুরই ঠিক ঠিকানা নাই।

"লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে।
জানিনে কখন ডুবে যাবে কোন অকূল গরল পাথারে॥"

এই স্তরে বিভীষিকার রেখা দেখা দেয়—তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক, দুঃখ এবং অনুতাপও একসঙ্গে মূর্ত্তিমান।

এক্ষণে কথা, এই মোহময় অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসারে আত্মসংস্থ যিনি নন্—সর্ব্বদাই যিনি ইন্দ্রিয়গণের প্রকোপে অজ্ঞান-সাগরে ভাসমান, তিনি কেবল মাত্র এখানে উহাদের তাড়না ভোগ করিতে আসিলেন—উহাদের প্ররোচনায় উঠিলেন ও পড়িলেন এবং অবশেষে অকালে লীলা-সম্বরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন—বুঝিলেন না যে, এই গভীর অন্ধকারের ঊর্দ্ধদেশে এক দিব্য-জ্যোতি অনন্ত আলোক বিস্ফারিত করিয়া আলোক নির্দ্দেশ দ্বারা আকর্ষণী শক্তিতে আপনার দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। দুর্ভাগ্য অপার যে এই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ঐ ঊর্দ্ধদেশ অনুসরণ করিলাম না—আলোক আজও পথ দেখাইতেছে, কালও দেখাইবে, ও অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ দেখাইয়া আসিতেছে, একবার কিন্তু নজরে না পড়িলে এই এতদিনের ছানি-পড়া চক্ষে আলো আসিবে না—সেই অতীতা অক্ষরা শক্তিময়ী মা দেখিতে পাইব না। যতদিন ইন্দ্রিয়ের ছলনা এড়াইতে না পারিব ততদিন বলিতে সক্ষম হইব না,—

"ঐ বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।"

কিন্তু জ্ঞানী, সংযমী, আত্মসংস্থ সাধকগণ উদ্ধরেতা হইয়া ঊর্দ্ধালোক দৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা এ আশার ছলনা-ভরা-মোহমদিরা পূর্ণ সংসারের কিছুই ভাল চক্ষে দেখেনও না, কোন কিছু এখানে উপভোগও করেন না। তাঁহারা কেবলই সেই চির শান্তিপূর্ণ অমর স্বর্গরাজ্যের আলোক ও রহস্য ভেদ করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন ততই সেই নিত্য-মঙ্গল জ্যোতি-নির্ম্মল আলোক ও চির আনন্দ সিন্ধুতে নিমগ্ন থাকেন।

আমরা চিরদিন এই ইন্দ্রিয়গণের দাস হয়ে থাকি—ভগবানের তাহা ইচ্ছা নহে। ধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উত্তরোত্তর তাঁর দিকে ধাবিত হই, এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা। আমরা তাঁর মানব-সন্তান—চিরদিন এখানে পড়িয়া মোহের ধূলি মাখিব ও কেবলই সং সাজিয়া সংসার লইয়া থাকিব, ইহা কখন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এই ইন্দ্রিয়গণ আমাদের উপর আধিপত্য করুক ও আমরা উহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করি, বিশ্বপাতার একেবারে অভিপ্রায়

তাহা নহে ও একারণে উহাদের সৃজন হয় নাই। উহাদের নিয়ন্তরে গিয়া আমরা বাস করিব এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এখানে আনেন নাই—উহাদের সহিত সমরায়োজনে ব্যস্ত হইয়া পরস্পরের শক্তিদ্বারা যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিব ও উহাদিগকে উহাদের দেশে তাড়াইয়া দিয়া উর্দ্ধদেশে যাইবার সূচনা করিব—সময়ে হতবুদ্ধি হইলে হৃদয় রথের রথী যে বিশ্ব-সারথী তাঁর হস্তে উহাদের রজ্জু ন্যস্ত করিয়া বলিব "দয়াময়! তুমি দয়া করিয়া এ বিপন্নকে তোমার দিকে টানিয়া লও—আমি নিজে যাইতে অপারক" এই হ'ল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

এখানে জানা উচিৎ দুইটি মহতী শক্তির মাঝে আমরা পড়িয়া আছি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রামে যখন একেবারে দুর্ব্বল ও অপারক হইয়া পড়িব তখন তাঁহাকেই স্মরণ লইব। এই বিপন্ন অবস্থায় মনের মাঝে কত প্রশ্ন উদয় হয়। বিষয় ভোগ করি, না সংযমী হয়ে সেই দয়াময়ের দুয়ারে বৈরাগ্য প্রার্থী হই?—"বল—সংসার ত্যাগ করিব, কি সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব?" এইরূপ নানা প্রশ্ন উদিত হয়। এ বড় বিপন্ন অবস্থা। এ অবস্থায়, এ দুর্ব্বল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মুহূর্ত্তে, সেই আর্ত্তের আশা দুর্ব্বলের রক্ষক অনাথশরণ, দুঃখীর চিরসখা একমাত্র ভরসা। জনৈক ভক্তের বৈরাগ্যপূর্ণ সেই আশ্বাসবাণী এ মুহূর্ত্তে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলিতেছেন "জীব! তুমি কি সংসার-মোহ ছেদনে উদ্‌যোগী হইয়াছ? তুমি কি আপনাকে আত্মীয় স্বজনের দ্বারা লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আত্মরাজ্য উদ্ধারের জন্য সমরায়োজনে উদ্‌যোগী হইয়াছ? এ সোণার সংসার তোমার চক্ষে কি লুণ্ঠন ও ছলনার লীলাভূমি বলিয়া প্রতিফলিত হইতেছে? পত্নীর প্রেমধারা হলাহল বুঝিয়া তুমি কি আপনাকে বিষজর্জ্জরিত ভাবিতেছ?—পুত্রস্নেহের হৃদয়গ্রাহী কমনীয়তা পাষাণের মত তোমার বুকে কি বাজিতেছে? আত্মীয় স্বজনের কলকণ্ঠ তোমার শ্রবণকুহরে কি বজ্রধ্বনির মত ঘর্ঘরিত? তুমি কি যন্ত্রণার বোঝা বহিতে একান্ত অস্বীকৃত? আপনার জীবন বৃথা যায় দেখিয়া তুমি কি ব্যাকুল? ভীষণ মায়াবর্ত্তের তরঙ্গ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অশক্ত ভাবিয়া তুমি কি নিরাশ হইয়াছ? মায়ার সমর-প্রাঙ্গণে মায়া হননে উদ্যোগী হইয়া, তুমি কি মায়ার ছলনায় আবার ভুলিতেছ? তবে দাও, তোমার ইন্দ্রিয় অশ্বযোজিত হৃদয়-রথের রজ্জু বিশ্ব-সারথীর হস্তে দাও। একবার রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অকুতভয়ে দাঁড়াইয়া নিজের কর্তৃত্বরূপ ধনু পরিত্যাগ

করিয়া করযোড়ে জ্যোতির্ম্ময় সারথীর নিকট কাঁদিয়া বল—প্রভু! সখা! আমি বিপন্ন, আমি মায়ামূঢ়, আমি সংসার মায়া হনন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও পারিতেছি না, আমি স্ত্রীপুত্রের মোহের বন্ধন কাটিতে অশক্ত, আমায় রক্ষা কর—আমায় পথ দেখাও, আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।”

প্রাণ একান্ত এইরূপে ব্যাকুল হইলে তিনি নিজ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া উচ্চস্তরে টানিয়া লইবেন ও বুঝাইবেন যে, ইন্দ্রিয়গণের নিম্নস্তরে থাকিয়া যিনি ব্যাকুলতাবশতঃ একটু নড়িবার চড়িবার চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি অনন্তময়ের দেশে ক্রমশঃ ধাবিত হইবেন। জীবমাত্রেই এই মহা সন্ধিস্থল হইতে উর্দ্ধদেশে যাইবার প্রয়াস পাইতেছে—এখান হইতে প্রেমময়ের রাজত্বের পথ ইন্দ্রিয়সংযম ও সাধনার দ্বারা তাঁর কাছে অতি নিকট ও সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানেই “আত্ম-বিজয়ের” সোপান আরম্ভ। এ স্থানের রম্যতা যাঁহার প্রাণে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি জন্মের তরে স্বার্থপরতায় জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ও এ মোহময় সংসারে সকল ভুলিয়া ধর্ম্মরূপ পাথেয় সঞ্চয় করিয়া তাঁকেই শরণ লইয়াছেন।

মানুষের যত রকম শত্রু আছে, কামাদি ইন্দ্রিয়গণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটুখানি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশাল এক অট্টালিকা ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিতে যেরূপ সমর্থ, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কেহ একটু প্রবল হইলে পলকে প্রলয় দেখাইয়া ঠিক সেইরূপ ছারখার করিতে সমর্থ। কত মহাপ্রাণ একটু আধটু, একটী না একটীর প্রকোপে পড়িয়া সাধনার্জ্জিত সৎকর্ম্মাদি কর্ম্মনাশার জলে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত করিয়া পুনরায় ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এক্ষণে—এ ছুটাছুটীর মাঝে—এ বড় ব্যথা পাওয়া হৃদয় নিয়ে একটু শান্তির আশায় ব্যাকুল হইলে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বিধ্বস্ত করিলেও কোন স্থানে উহা পাইব না—একমাত্র উপায় আছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ। আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা মনোমন্দিরে সেই বিশ্বস্বরূপের সত্তা অঙ্কিত করিতে হইবে, তবে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে, তখন কূটস্থ চৈতন্য জাগরিত হইয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা দান করিবে; মানব জনম সফল হইবে। জ্ঞানী তাঁর ইন্দ্রিয়গণকে অধীনে রাখিবার চেষ্টা পান, আর আমাদের মত শিশুবুদ্ধি উহাদের অধীন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এখন আমাদের পরিত্রাণ কি রূপে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। এই ইন্দ্রিয়গণের ক্রীড়ার উপর আমাদের উত্থান

পতন সবই নির্ভর করিতেছে। উহাদের সৃজন উদ্দেশ্যশূন্য নহে। অজ্ঞানীর চক্ষে,—উহারা বিভীষিকাময় কিন্তু জ্ঞানীর কাছে উহাদের মহৎ অর্থ আছে, উহাদের উন্নতিকল্পে তুলিবার মহতীশক্তি আছে।

যেমন কুসুমে কীট—মৃণালে কণ্টক দিয়া উহাদের মাধুর্য্য বাড়াইয়াছেন, তেমনি প্রভু দয়াল আমাদিগকে প্রবৃত্তির ক্রীড়ার মাঝে ফেলিয়া মনুষ্য জীবনের এত মহিমা ও কদর বাড়াইয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ যদি মনুষ্যজীবনের এতটা স্থান অধিকার করিয়া না বসিত—মানব জীবনের যে নিষ্ফল—ধর্ম্মসাধনা—এত আদৃত ও অমৃতময় হইত না। মানুষকে ভগবান আকর্ষণী শক্তির দ্বারা নিকটে লইবেন তাই এই ক্রীড়াশীল চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের কৌশল-রচনা। তা না হইলে এই মনুষ্যদেহকে কি আজ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বলা হইত! এই প্রবৃত্তির সঙ্গে আজ মানুষের যুদ্ধ উপস্থিত—তাই দেহাভ্যন্তরে আজ সাধনক্ষেত্র সম্ভব হইয়াছে। এমন মানব জনম পাইয়া, এ হেন যুদ্ধের জন্য উৎসাহী হইতে হইবে, নচেৎ "আত্ম-প্রতিষ্ঠা" লাভ হইবে না। আমরা শুধু শিখিয়াছি উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া চলিতে,—বুঝিনা, ভেবে ও দেখিনা—উহারা কোথায় ছলনায় আলেয়ার মত লইয়া গিয়া দিশেহারা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। উহারা চায় উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে—দাসত্ব চাহে না আমাদের কাছে—সাধন যুদ্ধের দ্বারা বশীভূত করি ও আত্ম-সংযম অভ্যাস করি। কেবল সুখের কোলে গা ঢালিয়া ঘুমাইয়া থাকিতে অভ্যাস আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। এত বাজে কার্য্য করে মরুর মাঝে ছুটাছুটী করি—এত স্থানে অযাচিত ভাবে গমনাগমন করি—এত ভাল মন্দ দ্রব্যাদি খাই—সকল রকমে সময় পাই, কেবল একটীবার মধুর নাম লইয়া যে ধর্ম্ম যুদ্ধে যাত্রা করিব, তার সময় পাইলাম না। তাই পূজনীয় কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"আমি, সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাইনে;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন, তব সঙ্গ-সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন, তোমার কাছে তো যাইনে;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই, তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে, তোমার মহিমা গাইনে;
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই, জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে, ও পদতলে বিকাইনে,
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা, মনেরে শুধু শিখাইনে।" —রজনীকান্ত।

যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে মনুষ্যজীবন সাধনার দ্বারা পবিত্র করিতে হইবে, নচেৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রতাপ একেবারে যাইবে না। সাধন তত্ত্বের বিষয় বিশেষ ভাবে আমরা এখন আলোচনা করিতেছি না। কেবলমাত্র সহজভাবে কিরূপে অগ্রসর হইতে হইবে, দু'চারি কথায় তাহাই বর্ণিত হইল। এ পথের প্রথম ও শ্রেষ্ঠবন্ধু একমাত্র বিবেক। এই বিবেকের সাহায্য লইয়া কোনটী মিথ্যা কোনটী সত্য—কোনটী নিত্য কোনটী অনিত্য স্থির করিতে হইবে। সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইলে বিবেক, বৈরাগ্য, সদাচরণ ও প্রেম যে চারিটী গুণের প্রয়োজন, তন্মধ্যে বিবেকই প্রধান ও সর্ব্ব প্রথম। এই বিবেক শক্তি দ্বারা মানুষ বুঝিতে পারে সাধনার প্রয়োজন কেন? এ পৃথিবীতে মানুষ অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া—অনেক আকাঙ্ক্ষা করিয়া অবশেষে বিবেক সাহায্যে বুঝে—যাহা কিছু ভোগ উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত, তাহা কেবল এই সাধন-পথেই আছে। এ তত্ত্ব মানুষ যতক্ষণ না অবগত হচ্ছে, ততক্ষণ এটী দাও ওটী দাও প্রভু আমায়, এই করিয়া উন্মত্ত। লক্ষ্য যতক্ষণ না স্থির হয় ততক্ষণ অনর্থ দ্রব্যের জন্য, অযাচিত ভাবে যিনি আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন, আমরা তাঁকে বিরক্ত করি। কবি তাই বলিতেছেন——

"(ওরা) চাহিতে জানেনা দয়াময়।
চাহে ধন, জন, মান, আয়ুঃ, আরোগ্য বিজয়!
করুণার সিন্ধুকূলে, বসিয়া, মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয়;
তীরে করি' ছুটাছুটী, ধূলি বাঁধে মুঠি মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা দিয়ে,
দুদিনের মোহ, ভেঙ্গে চুরমার হয়;
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহা ব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়॥
আহা! ওরা জানেনাত, করুণা নিঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর ঝর ঝর;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে; তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যাহে পিয়াসা না রয়॥"—রজনীকান্ত।

যাঁরা সাধনার দিকে ঝুকিয়াছেন, তাঁহারা এই বিবেক সাহায্যে মিথ্যা হইতে সত্য বাছিয়া লন। এই বিবেক বলিয়া দিবে—যেটী ঈশ্বর-ইচ্ছা বিরুদ্ধ সেটী কখন করা কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত কাজে এই সত্য সাধনা অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথমে চিন্তাতে ইহা আরম্ভ করিতে হইবে, কেননা চিন্তা সত্যপূর্ণ হইলে কার্য্য মঙ্গলময় হইবার খুব সম্ভাবনা। অহঙ্কার—রাগ—বিবেক সব চূর্ণ করে। বিবেক সত্যবাক্য প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দেয়। বিবেক স্বার্থপরতার বীজ ধ্বংস করে—বুঝায় প্রত্যেক মানবে ও প্রত্যেক পদার্থে প্রভু ভগবানের যে টুকু অংশ, সেটুকু আরাধনার বিষয়। জ্ঞান আনাইয়া দেয়—সকল ব্যক্তি, বস্তু ও ক্রিয়ার মধ্যে সেই ব্রহ্মসত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৈরাগ্য বা নিষ্কামতা অভ্যাস চাই। বৈরাগ্য না আসিলে "আমি" "আমি" লইয়াই এ সংসারে বিষম গোলযোগ বাঁধে। বৈরাগ্য সাধনা না আসিলে দেহেতেই "আমি" বোধ থাকে। কঠোর বৈরাগ্যসাধন অর্থাৎ সব জিনিষে মায়াশূন্যতার বোধ আসিলে দেহের উপর মায়া একবারে কমিয়া যায়। দেহের উপর এ মায়ার ত্যাগ না আসিলে আত্মাস্বাদ আইসে না। "গীতা-পরিচয়" বলিতেছেন:—"এক সঙ্গে দুই রস ভোগ হইতে পারে না। যিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন তিনি আত্মাস্বাদ পাইবেন কিরূপে? যিনি দেহাস্বাদ করেন, তাঁহার কি আত্মাস্বাদ হয়? এক সঙ্গে দুয়ের জ্ঞানও তিষ্ঠিতে পারে না। দেহজ্ঞান যাঁহার প্রবল তাঁহার আত্মজ্ঞান হইবে কিরূপে? দেহ দর্শন বা বিষয় দর্শন যাঁহার হয় তাঁহার আত্মদর্শন হইবে না। দেহ দর্শন করিতে "আমার দেহ", "আমার দেহ" বোধ হয়, তখন দেহে আত্মাভিমান জন্মে। "দেহ আমি" "দেহ আমি" এই বোধ প্রবল হইলেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। দেহাভিমানজ শোক ত্যাগ কর এবং আত্মানুভবে সন্তুষ্ট হও। "আমি দেহ নহি" "আমি আনন্দস্বরূপ" এই দুয়ের অনুভবই জীবন্মুক্তি।" এই বৈরাগ্য সাধন আরম্ভ হইলে জীবের নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য পড়ে। কর্ম্ম করিতে ভগবান পাঠাইয়াছেন—কর্ম্ম করিয়া যাওয়া চাই—ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না, কারণ—"নিষ্কাম কর্ম্মে ভগবৎ-সেবা দ্বারা নৈষ্টিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমোভাব এবং কাম লোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয়। চিত্ত তখন সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে 'আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; ইহাই মুক্তি। এইরূপ

আত্মদর্শন সাধিত হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মক্ষয় হয়।" বৈরাগ্য সাধনের অন্তরায় যে গুলি ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় তন্মধ্যে অকারণ বহু কথা প্রয়োগ সর্ব্ব প্রধান। এই কদর্য্য অভ্যাস অনেক দূরে লইয়া ফেলে। অনর্থক উদ্দেশ্যবিহীন কথা কহিয়া আমরা মনের স্থৈর্য্যতা ও একাগ্রতা নষ্ট করিয়া ফেলি। বেশী কথা কহিতে গেলে কোন না কোন বিষয়ে পরনিন্দা আসিয়া পড়ে। অতএব বলা অপেক্ষা শোনা অভ্যাস করা মন্দ নহে। মৌনব্রত অবলম্বন বৈরাগ্য সাধনে বিশেষ উপকারী। বেশী কথা না কহিলে প্রাণে প্রাণে শক্তি সঞ্চার হয়। পরের কার্য্যে অনধিকার হস্তার্পণও আর একটী বৈরাগ্য সাধন বিরোধী। অপরে কি বলে, কি করে, আমার কি প্রয়োজন উহাতে! আমার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া অন্তরের দিকে প্রাণমন টানিয়া নিজের কাজ করিব—এই হ'ল বৈরাগ্য-সাধনের আর একটী মূলমন্ত্র। কেবল জটাবল্কল ধারণে কঠোরতা আইসে এমন নহে। প্রাণকে অগ্রে বাহ্যজগতের কামনা থেকে দূরে রাখিতে হইবে—বহির্সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরসাধন আসিবে। জীবে নির্দ্দয়তা আরও একটী অন্তরায়। জীবে দয়া করিতে হইবে। আমরা একেবারে উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে অনেক জীব হিংসা করিয়া ফেলি। এ পুণ্য ভারতভূমিতে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বহুদিনের পুরাতন ধর্ম্ম। আমরা হিংসা প্রবৃত্তির দাস হইয়া জীব হিংসার দ্বারা নিজের প্রাণেও হিংসা সৃজন করিতেছি। ভগবানের সত্ত্বা সব স্থানে,—এ বেদবাক্য আজকালের অভ্যাস দোষে একেবারে ভুলিতে বসিয়াছি।

সদাচরণ সাধনায় আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। আমাদের আচরণ—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণে পূর্ণ হইলে সদাচরণ নামে খ্যাত। আত্ম সংযম অভ্যাস করিতে হইবে—কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বশে রাখিতে পারিলে এই সদাচরণ অভ্যাস জগতে সম্ভব হইবে। শম দম প্রভৃতির দ্বারা মনের শান্তভাব, ও এই শান্তভাব হইতে স্থৈর্য্যের উৎপত্তি হয়। মনের স্থৈর্য্যতা আসিলে আর অকারণ নানা বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া মর্ম্ম বেদনায় পুড়িতে হইবে না। অবসাদকে একেবারে মনে স্থান না দেওয়াই মনের শান্তিস্থাপনের প্রধান উপায়। প্রত্যহ সৎউদ্দেশ্যে মন ও প্রাণ নিয়োগ করিলে জীবনের উদ্দেশ্য সাধু হইয়া আসিবে। অহঙ্কারকে সর্ব্বদাই বাধ্য রাখিতে পারিলে সদাচরণ আপনাআপনি অভ্যাস হইয়া আসিবে। উপরোক্ত

শম দমাদির দ্বারা কার্য্যে আত্ম-সংযম, মত সহিষ্ণুতা, সন্তোষ ও একাগ্রতা, বিশ্বাস, অভ্যাসদ্বারা উৎকর্ষ লাভ করে।

অবশেষে প্রাণ মন স্থির হইলে—শান্ত হইয়া গেলে—প্রেম আসিবে। এইটী সাধনার অমৃত ফল। এই প্রেম আসিলে, হৃদয় মন সব জন্মের মত সরল হইয়া যাইবে, কুটীলতা আর থাকিবে না। তখন মন আর কোন অভ্যাসের দাস নহে—কেবল নিত্য নিরঞ্জনের মহিমাদর্শন ও অনুভবে মহা আনন্দ সিন্ধুতে চির-নিমগ্ন—যেন আর উঠিতে চাহে না। এই প্রেমধন লাভই সাধনার উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য স্থির করিয়া উক্ত সাধন চতুষ্টয় অভ্যাস করিতে পারিলে. আত্ম-সংস্থ হইতে পারিব ও মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

আমরা কলির জীব। মোটামুটী ভাবে আমাদের করিতে হবে কি? উক্ত ঋষিকথিত সাধন চতুষ্টয় যত দূর সম্ভব কার্য্যে পরিণত করাই আমাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। বিফলে দিন যায়, আর স্থির থাকা কর্ত্তব্য নহে। বিবেক সাহায্য করিয়া বৈরাগ্যসাধন সিদ্ধ হইলে ক্রমশঃ প্রেম হৃদয়স্থান অধিকার করিবে—পরে দেখিতে পাইব নিত্যনিরঞ্জন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-কদম্বমূলে একদিন প্রণব-বীণা বাজাইতেছেন—আর এই যে ইন্দ্রিয়গণ বিভীষিকাময় ছিল—সকলই মোহন বেণুরবে চিরদিনের মত বশ্যতা স্বীকার করিয়া গোপিনীবেশ ধারণ করিয়াছে। এখন আর শত্রুতার ভাব নাই, সকলই মিত্রতায় পরিপূর্ণ, মিত্রতা লাভই ধর্ম্মজীবনের পুণ্য ফল। এ ফল যাঁর জীবনে ঘটিল, তিনি মনুষ্য জীবন পাইয়া সার্থক জীবন লাভ করিলেন—মানব জনম সফল হইল। আর যিনি বঞ্চিত, তাঁর মনুষ্য জীবন বৃথা হইল।

এখন বুঝিলাম—ইন্দ্রিয়গণের সহিত আমাদের নিরন্তর যুদ্ধের উপর আমাদের ধর্ম্মজীবন নির্ভর করিতেছে। এস নরনারী ভাই ভগ্নী ধর্ম্মপিপাসু যেখানে যে আছো—আমরা গীতানিনাদিত সেই শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদ হৃদয়ে বদ্ধমূল করি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা "যুদ্ধ কর" শিরে ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের পথ অনুসরণ করতঃ ইন্দ্রিয়গণের সহিত—মানসিক দুর্ব্বলতার সহিত—যুদ্ধ করি। দেখিব দেবমন্দিরের দ্বার এখন আমাদের জন্য আগের মত উন্মুক্ত—অন্তরে প্রবেশ করিয়া মহাদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া চিরদিনের মত যোগধ্যানে নিমজ্জিত থাকিব। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন—যেন সেই সাধনার সূচনামাত্রও আমাদের শীঘ্রই আরম্ভ হউক। হরয়ে ওঁ।

শ্রীধিরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মোক্ষফল।

(১)

রামকৃষ্ণ নামে, ভরিয়ে নিছি—
মাথায় পসরা,
দীনহীন কে, কোথায় আছিস,
আয় সবে ত্বরা।
নামটী মধুর মিষ্ট ফল,
(সবে) মুখে ভুগে বল,
দেখ্‌বি সত্যি কি না, মিষ্টি মধুর, মন পাগল করা।

(২)

এ নাম-ফলের নিব মূল্
সবার চরণ ধূল,
আমি পসারিণী শুদ্ধ হয ঘুচবে গো জ্বরা।
আমি দিয়ে চোকের জল,
ফলিয়েছি এ ফল,
(তবু) দীন-দশা মোর, দাম কোরেছি, নে সবে তোরা।

(৩)

তোরা চরণ ধূলো দে,
আমার মাথা থেকে নে,
"শ্রীরামকৃষ্ণ" সুপক্ক ফল টাট্‌কা রস ভরা।
ও সেই কামারপুকুরে,
বড় বেশী নয় দূরে,
ধোরে ছিল কল্পবৃক্ষ এ নিখিল ধরা।

(৪)

ও সেই চারা গাছটি রে,
বাড়্‌লো দক্ষিণ-সহরে,
পেয়ে ভক্ত হিয়ায়, ভক্তি মাটি প্রেমরস ধারা॥
এখন রেখে সুনাম ফল,
যত ভক্ত হৃদিতল,
বিরাজে যোগোদ্যানে নিত্য রূপে ভক্ত-মনহরা।

(৫)

সে যে মোক্ষতরুর বাগ,
ধরি সুপথ অনুরাগ,
অহনিশি "শ্রীরামকৃষ্ণ" সুনামটি স্মরা,
কোথায় কে খদ্দের নাও,
আগে চরণ ধূলা দাও,
(আমার) যাচ্ছে বেলা, সন্ধ্যা আসে, মাথায় পসরা ॥

ভক্তকিঙ্করী—মনবুলবুল রচয়িতা।

অদর্শনে অভিমান।

ক—কই কৃষ্ণ? রামকৃষ্ণ নমঃ নারায়ণ,
খ—খল সংসারেতে কই সরল স্বজন।
গ—গদাধর বনমালী মানসমোহন,
ঘ—ঘরের মাণিক কই? অন্তরের ধন।
ঙ—ঙ করি যায় দিন সদা মন দুঃখে,
চ—চলিতে নারিনু হায় শান্তিধাম মুখে।
ছ—ছলনা চাতুরী ভয়, ভরা ভবকারা,
জ—জনমে জনমে আসি কেঁদে হই সারা।
ঝ—ঝরে আঁখি নিশিদিন ত্রিতাপ-অনলে,
ঞ—ঞ নাকি সুর ভাবি মহামায়া ছলে।
ট—টলিব না মায়ার সে রঙ্গ ভণিতায়,
ঠ—ঠকি কি জীবনে আর চিনেছি তোমায়।
ড—ডরিব না মৃত্যু-ভয়ে হে ভবকাণ্ডারি!
ঢ—ঢলিয়া পড়িব আমি চরণে তোমারি,
ণ—ণমঃ রামকৃষ্ণ নামে পাপ তাপ হরে,
ত—তরিবারে 'নাম' আছে লব তারস্বরে।
থ—থর থর কাঁপি সদা আমি ক্ষুদ্র নর,
দ—দয়াময় 'দীনাশ্রয়' তুমি বিশ্বম্ভর।
ধ—ধরিতে শ্রীপদ দুটি দাও ভিখারীরে,
ন—নহিলে ডুবিব হরি বৈতরণী-নীরে।

প—পরম দয়াল নামে দিব যে দোহাই,
ফ—ফলিবে নামের গুণ মনে আশা তাই।
ব—বলিতে মধুর নাম তৃপ্ত তনু মন,
ভ—ভজি পতি বিশ্বপতি মধুবমোহন।
ম—মজিতে মধুব তুমি মহীতে অতুল,
য—যাচি নাথ একমাত্র চরণ বাতুল।
র—রবি শশী আসে যায়, দিন দিন দীন্
ল—লহ পদে প্রাণময় রবনাক ভিন্।
ব—বলিতে নারি যে আর প্রিয়তম ছবি,
শ—শক্তি গেল অদর্শন, অভিমানে মবি।
ষ—ষড়রিপু জড় হোয়ে প্রতাপ ফলায়,
স—সহিতে সামর্থ দাও, নাশ সে সবায়।
হ—হরি হরি তবে হব চিদানন্দময়,
ক্ষ—ক্ষমিয়া আসন কর সুশীল-হৃদয়।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

—০—

মহাসমাধি।

(১)

কার শোকে কাঁদে আজি এ ভারতবাসী,
ক্ষুব্ধ হৃদি, ঝরিতেছে অশ্রু দিবানিশি?
কার মহাসমাধিতে, শোক ভার শ্রান্ত চিতে,
বঙ্গ অন্তঃপুরনারী ফেলে অশ্রুরাশি?
ডুবিল আঁধারে আজি পূর্ণিমার হাসি!

(২)

শ্বেতদ্বীপ-নিবাসিনী কে তুমি জননী?
শাপভ্রষ্টা দেবী ওগো মরতের রাণী!
ভারত কল্যাণ তরে, শ্রীগুরুচরণ স্ম'রে,
স্বকর্ত্তব্য সাধি' গেলে দিবস যামিনী;
তোমার তুলনা দেবি, তুমিই আপনি।

(৩)

ত্যজিয়া জনমভূমি, সমাজ, সংসার,
কত না সহিলে দেবি এ বিশ্বমাঝার।
ধন্য গুরু-পদাশ্রিতা, ধন্য ওগো তুমি মাতা,
গুরুর আদেশ বাণী ক'রেছিলে সার,
তাই দেবি! আজি তুমি মরিয়া অমর।

(৪)

ভ্রমান্ধ সন্তান মাগো শোকে বিচলিত,
তোমার বিরহে দেবি হৃদয় ব্যথিত,
(তব) আননের সরলতা, হৃদয়ের উদারতা,
নিশিদিন যেন মোরে রাখে জাগরিত;
দুর্গম সংসার-পথে ধ্রুবতারা মত।

(৫)

রামকৃষ্ণ-স্বামিজীর চিরপদাশ্রিতা,
সার্থক আজিকে দেবি তুমি 'নিবেদিতা',
তোমার ও কালীপূজা* হিন্দুর গৌরবধ্বজা,
তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি অস্তিমের গাঁথা, †
ধ্বনিছে সবার মুখে তব পবিত্রতা।

(৬)

ব্রত শেষে গেলে দেবি আপন আলয়ে,
নশ্বর এ বিশ্ব ত্যজি নিখিলে মিশায়ে,
দয়াময় বিশ্বপিতা, তাঁরি পদে নিবেদিতা,
অনন্তের পথে গেলে নির্ভিক হৃদয়ে,
"নিবেদিতা" নাম তব সার্থক করিয়ে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিশ্বাস।

---

* Kali the mother.

† The master as I saw him.

বালন্যাসী যোগানন্দ।

(১)

জান কি হে জীবগণ, দ্বিজ উপবনে,
কামারপুকুর ধামে।
দ্বিশাখায় সুশোভিত, তরুবর সুললিত,
পরিচিত পৃথ্বীতলে "রামকৃষ্ণ" নামে।
দুই শাখা জ্ঞান ভক্তি খ্যাত ভব ধামে॥

(২)

পবিত্র সুতরু-শাখে, দ্বিবিধ কুসুম,
হের বিকশিত হয়।
সমবৃক্ষে সমফুল, নহে ভিন্ন গুণকুল,
মূলে ভিন্ন নয় শুধু নামে ভিন্ন হয়।
জ্ঞানী, প্রেমী, ন্যাসী, গৃহী নামে পরিচয়॥

(৩)

বিজ্ঞান বিটপে জাত, এক সুমনস,
মন-লোভা পরিমল।
ভবে যোগানন্দ নাম, ধবে পূর্ণ মনস্কাম,
সুতরু সংযোগে থাকি লভি সুবিমল।
বিজ্ঞান নির্ঝর ঝর পিয়ে অবিরল॥

(৪)

ফুটিল বহুল ফুল, এক বৃন্ত'পরি,
রহিয়া অপরে সেই।
খসিয়া পড়িল ভূমে, কুমার যোগীন্দ্র নামে,
জ্ঞানী ভক্ত বালন্যাসী এই আখ্যা পাই।
দর্প দাম্ভিকতা তথা নাহি পায় ঠাঁই॥

(৫)

মহাত্যাগী যোগীবর, সম্যক প্রকারে,
ত্যাগি' সংসার বাসনা।
দলি দুই পদতলে, ছার ভব সুখদলে,
রামকৃষ্ণ পদতলে লইয়ে বিশ্রাম।
মহানন্দ যোগানন্দ লভে অবিরাম॥ রামকৃষ্ণ-দাসী—দেবেন।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত।—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। গ্রন্থখানিতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যলীলা সুললিত ছন্দে প্রকটিত হইয়াছে। পূজনীয় সেবক রামচন্দ্র এ অবতারের জীবনী গদ্যে আমাদিগকে বহুদিন পূর্ব্বে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানি হল' পদ্যে। ইহা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় গ্রন্থকাব একজন পরম ভাবুক ও ভক্ত। এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে সেই দেব-চরিত্রের অনির্ব্বচনীয় ও সুন্দর ভাবরাশি মধুর ছন্দে ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকার চালিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেব-জীবনটাই ত "ভাগবত।" এতদিন ভক্তমণ্ডলী মনে মনে এই ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন. আজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু জীবনকাহিনী ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া অনেকদিনেব এ আশাপূর্ণ করিলেন। শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ-জগতে এ হেন ভাগবত আজ কত উচ্চস্থান ও আদব পাইবে ভাবিয়া আমাদের আনন্দ ধরে না। ধন্য রাজেন্দ্র বাবু, ধন্য তাঁব এ ভক্তিপূর্ণ সাধু চেষ্টা। আর শত ধন্য কাঙ্গালের পিতা মাতা রামকৃষ্ণ। নিজ জীবনের ভিতর দিয়া যিনি মহা সমন্বয়তত্ত্ব এই ভীষণ বাদানুবাদের দিনে অকাতরে সরলভাবে প্রকাশ করিয়া ভেদজ্ঞান দূর করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রাজেন্দ্রবাবুর "অবতারলীলা" ও "মাথুরলীলা" পাঠ করিলে মনে হয় সুপ্ত হৃদয় তন্ত্রীটী প্রেমানুরাগে ঝঙ্কারিত করিয়া তুলে। "সাধন-লীলা" ও "প্রচার-লীলা" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকার যে দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সুস্থ শরীরে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "প্রচার-লীলা" পর্য্যন্ত সমাধা করিতে পারিলে ভাগ্যবান মনে করিব। "সাধন-লীলা" আমরা কতদিন পাইতাম, যদি না কোন হীনচেতা ঈর্ষাবশতঃ ইহার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি অপহরণ করিত। গ্রন্থকার যে এজন্য অতিশয় মর্ম্মাহত, মুখপত্রে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এ কারণে ভক্ত সাধারণ আরও বেশী মর্ম্মাহত সন্দেহ নাই। এরূপ মহৎকার্য্যে বাধা বিঘ্ন বহু, এ কারণ আমাদের নিবেদন গ্রন্থকার যত শীঘ্র পারেন এ সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তুলুন। প্রত্যেক হিন্দু সংসারে ইহার ভূয় প্রচার আমাদের একান্ত কামনীয়। অন্যান্য-শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ সঙ্গে সঙ্গে এই সহজগম্য গ্রন্থটী পাঠ করিয়া মহাজীবনের উপদেশ স্তরে স্তরে উপলব্ধি করুন ও এই জ্বালামালাময় সংসারের দুর্গমপথ ক্রমশঃ অতিক্রম করতঃ উত্তরোত্তর ভগবানের দিকে অগ্রসর হউন, এই আমাদের একান্তানুরোধ ও প্রার্থনা। পুস্তকের ভাষা

অতিশয় প্রাঞ্জল, এমন কি বালক বালিকাতেও সহজে অর্থ বোধ করিতে সমর্থ। মুদ্রাঙ্কণ প্রশংসনীয়।

সাধু নাগ মহাশয়।—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওভোগের শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রিত সাধু শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের পবিত্র জীবন-চরিত। শরৎ বাবু এই মহাপুরুষের বিশিষ্ট ভক্ত, অতএব তাঁহার জীবন তিনি যেরূপ বিবৃত করিবেন, এমন আর কেহ পারিবেন না। বনের পাখি সখ্যভাবে যে মহাপুরুষের হস্ত হইতে ভক্ষ্য লইয়া আনন্দে নৃত্য করিত, তাঁর আর ব্রহ্মদর্শনের বাকি কি? এতটা সাম্যভাব তাঁতে বর্ত্তমান ছিল যে, বনের বিষাক্ত সর্প হঠাৎ সম্মুখীন হইলে মাতৃ সম্ভাষণ করিবামাত্রই যেন মহাত্মার মহামন্ত্র ঈঙ্গিত বুঝিয়া নত মস্তকে বনের দিকেই আবার অপসরণ করিত—এ মহাপুরুষের কথা আর সামান্য জীবে কি বলিবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন "মনের সাপে খায় না, বনের সাপে খায়।" ধন্য শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ, তোমার এই নাগ মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া, তুমি যে কি ও কত মধুর ছিলে—অনুভব করিতে প্রাণ অস্থির হয়। ইঁহাদের কথা ইঁহারাই জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবকমণ্ডলী নাগ মহাশয়কে বিশিষ্টভাবে চেনেন। অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আমরা এই মহা জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রাণ শান্ত হইবে—হৃদয় মন নবীন প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হইবে। এবম্প্রকার মহৎ জীবন এখন আমাদের আদর্শ না হইলে, আমাদের পতিত জীবন গড়িয়া উঠিবে না। গ্রন্থকার অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা যে অমূল্য রত্ন আজ ধর্ম্মজগতে দান করিলেন, এ কারণ হিন্দুহৃদয়-মাত্রই তাঁর নিকট ঋণী সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। প্রত্যেক হিন্দুকেই আমরা এ মহৎ জীবন পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

পুণ্যস্মৃতি।—শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। পুস্তকে গ্রন্থকার ধ্রুব-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান চির মহান, শাশ্বত ও পুরাতন পুরুষ। তাঁহার অসীম পুরাতনত্ব ভক্ত জীবনের দ্বারা নিত্য নূতনত্বে যুগে যুগে প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন। শিশুভক্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবত কথিত ধ্রুব-চরিত্র ভক্তির উচ্ছ্বাসে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতই তিনি পুণ্যস্মৃতি জাগরিত করিলেন। ধর্ম্মহীন অপবিত্র পতিত জীবনে এবম্বিধ অতীত পুণ্যস্মৃতি যে মৃত সঞ্জীবনীর

মত ম্রিয়মান হৃদয়-তরু মুঞ্জরিত করিয়া তুলে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত লাবণ্যবাবু এই "পুণ্যস্মৃতি" জন সাধারণের সমক্ষে ধরিয়া যেন মৃত প্রাণে নব প্রাণের সঞ্চার করিলেন। শিশুর ভক্তিভাবপূর্ণ সকরুণ ক্রন্দনে ভগবান শীঘ্র দ্রবীভূত হন। নিত্য সাধনা ও ধ্যান ধারণার দ্বারা আমাদের জীবন শিশুর ন্যায় পবিত্র করিতে পারিলেই ভগবদ্দর্শনের সম্ভাবনা—গ্রন্থকার এই অমূল্য পবিত্র উপদেশের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভাবচ্ছটা তাঁহার পুস্তকের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের হৃদগত ভক্তিভাব অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তির ক্রীড়া করিয়া প্রাণ মন না কাঁদাইয়া থাকিতে পারে না! নিষ্ঠাবান গ্রন্থকার ধ্রুবের নিকট মহর্ষি নারদের শ্রীহরির রূপ বর্ণন যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, ভক্তির সহিত পাঠ করিলে ক্ষণেকের জন্যও বনমালাধারী নবীন নীরদ শ্যাম কলেবর, মানস মন্দিরে স্ফুরিত হন। মরি মরি কি ভাবচ্ছটা! পড়িতে পড়িতে শরীর পুলক-স্পন্দনে শিহরিয়া উঠে! গ্রন্থকার ভক্ত—তাঁর এ ভক্তির প্রস্রবণ সুকুমারমতি বালক বালিকাকেও অতি সহজেই ভাসাইয়া দিতে সমর্থ। এই কুরুচিপূর্ণ নভেল নাটকের দিনে এরূপ গ্রন্থ যদি বালক বালিকাদের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়, কোমল প্রাণ বালক বালিকা হৃদয়েও ধর্ম্মভাব জাগাইয়া কুরুচির স্রোত ফিরাইবে ও ভারত আবার হিন্দুর সোণার ভারত হইবে—এরূপ বিশ্বাস হয়। ভাষা ও রচনা কৌশল অতি প্রশংসনীয়। মুদ্রাঙ্কণও সুন্দর। প্রত্যেক হিন্দু নরনারীকে এই পুস্তক পাঠ করিতে আমারা বিশেষ অনুরোধ করি।

—০—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ২৩শে কার্ত্তিক, শুক্রবার কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কালীপূজা উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

৩রা অগ্রহায়ণ, সোমবার, জগদ্ধাত্রী পূজার দিন যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ-সেবক পরমভক্ত রামচন্দ্রের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ দিন বহু ভক্ত সমবেত হইয়া রামচন্দ্রের আদর্শ জীবন আলোচনা করেন। ঠাকুরের নামকীর্ত্তনে উদ্যান মুখরিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ শত কাঙ্গালীকে অতি পরিতোষরূপে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—০—

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

পৌষ, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, নবম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

—:-০-:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৫ পৃষ্ঠার পর।)

৬২৯। যার প্রতি গুরুর কৃপা হয়, তার আর কোন ভয় নাই। সে সব বুঝতে পারে।

৬৩০। ঈশ্বর আমার হৃদয়মাঝে আছেন—সর্ব্বদা এই চিন্তা করবে।

৬৩১। সমাধি অবস্থায় বায়ুর নানা রকমের গতি হয়। কখন পিঁপড়ের মত গতি, কখন বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়—এই রকম গতি, আবার কখন মাছ যেমন জলে সোঁ করে চলে যায়, এই রকম গতি হয়।

৬৩২। পাহাড়, সমুদ্র ও খুব বড় মাঠ দেখলে, ঈশ্বরের ভাব উদ্দীপন হয়।

৬৩৩। ঈশ্বরকে দর্শন করতে হলে সাধনের বিশেষ দরকার।

৬৩৪। যা মিথ্যা বলে জানছি—বুঝছি, তাকে রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করার নামই তীব্র বৈরাগ্য।

৬৩৫। ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব, তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

৬৩৬। ঈশ্বর সত্য আর সবই অনিত্য, তিনিই একমাত্র বস্তু আর সবই অবস্তু, এই জ্ঞানের নামই বিবেক।

৬৩৭। যদি ভগবান লাভ করতে চাও তবে আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন পবিত্র হলে ভগবান হৃদয়-মন্দিরে এসে বস্‌বেন।

৬৩৮। লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বরকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর কাছ থেকে আদেশ পায়, তবে সেই লোক শিক্ষা দিতে পারে।

৬৩৯। তীব্র বৈরাগ্য হলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে দেখে যেন সংসারে দিনরাত দাবানল জ্বলছে। মাগ ছেলে আত্মীয়দের যেন পাতকুয়া দেখে। তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার ত্যাগ আপনিই হয়ে যায়।

৬৪০। অনুরাগ হলেই ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর জন্য খুব ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হলে সমস্ত মনটা তাঁতে গত হয়।

৬৪১। ছাদে উঠতে হলে সিঁড়ির ধাপ এক একটী করে ত্যাগ করে তবে ছাদে উঠতে হয়; কিন্তু ছাদে উঠে যদি বিচার করে দেখ, তখন দেখতে পাবে যে, যে ইট চুণ সুরকিতে ছাদ তৈয়ারি, সেই ইট চুণ সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী হয়েছে। এমনি প্রথমে নেতি নেতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, পরে দেখা যায় যে, ব্রহ্মও যে বস্তু, এই জীব জগৎও সেই বস্তু;—যিনি আত্মা তিনিই আবার পঞ্চভূত হয়েছেন। এই জ্ঞান যার হয়, তারই বিজ্ঞান।

৬৪২। শোণিত শুক্র থেকে হাড় মাংস হচ্ছে, সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়, তেমনি সূক্ষ্ম পরমাত্মা থেকে জড় পদার্থের উদ্ভব কিছু অসম্ভব নয়।

৬৪৩। যার শুদ্ধ মন হয়েছে, তার দিব্যচক্ষু লাভ হয়। সে তখন সর্ব্বত্রই ঈশ্বর দর্শন করে।

৬৪৪। যতক্ষণ স্ত্রীলোকে আসক্তি আছে, ততক্ষণ শুদ্ধ-মন হবার উপায় নাই।

৬৪৫। মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখনি পূর্ণজ্ঞান হবে। তিনিই সাধুরূপে, খলরূপে, ছলরূপে, লুচ্চরূপে মানুষ সেজে বেড়াচ্ছেন।

৬৪৬। যা চায়, তাই কাছে রয়েছে, তবু মানুষ নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। একজন তামাক-খোর টিকে ধরাবে বলে রাত দুপুরে এক লণ্ঠন হাতে নিয়ে আর একজনের বাড়ী আগুন চাইতে গিয়েছে। দোর ঠেলাঠেলি করে তাদের উঠিয়ে আগুন চাইতে লাগলো। তারা দোর খুলে দেখে যে, তার হাতে লণ্ঠন রয়েছে। তখন বল্লে যে, তোমার হাতেই আগুন রয়েছে আর তুমি

কিনা এত কষ্ট করে এসে দোর ঠেলাঠেলি করে আগুণ চাইছ! তীর্থ ভ্রমণও এইরূপ, যে জ্ঞানলাভ করবার জন্য তীর্থ যাওয়া—তা তোমার ভিতরেই আছে, দেখলেই হলো।

৬৪৭। সিদ্ধাই থাকলে সাধকের অহঙ্কার হয়—সে ভগবানকে ভুলে যায়।

৬৪৮। সিদ্ধাইয়ের নানা গোল। এক সাধুর সিদ্ধাই ছিল, যা বলতো তাই হোতো। সে একদিন সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় ঝড় উঠলো, ঝড়ে তার কষ্ট হবে বলে বল্লে—ঝড় থেমে যা। সেই ঝড়ে একখানা জাহাজ পাল ভরে যাচ্ছিল। তার কথায় যেমন ঝড় থামা, অমনি পালে বাতাস না পাওয়ায় জাহাজখানা টুপ করে ডুবে গেল। কত লোক মারা গেল। লোক মারা যাওয়ার যে পাপ, তা সমস্ত সেই সাধুকে অর্শালো।

৬৪৯। আর এক সাধুর খুব সিদ্ধাই ছিল। সে ইচ্ছামত মেরে ফেলতে ও বাঁচাতে পারতো। একজন ঈশ্বরনিষ্ঠ সাধু তাই শুনে তাকে দেখতে এলো। তখন সেখান দিয়ে একটা হাতি যাচ্ছিল। সিদ্ধাই সাধু হাতীটার গায়ে একটু ধূলোপড়া দিতেই সেটা ছটফট করে মরে গেল। আবার একবার ধূলোপড়া দিতে ধড়মড় করে বেঁচে উঠলো। তখন আগন্তুক সাধুটী তাকে বল্লে, আপনার ত খুব শক্তি! কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি যে হাতি মারলেন আর বাঁচালেন, এতে আপনার নিজের কি উন্নতি হলো? ঈশ্বরের পথে আপনি কতটুকু এগুলেন? সিদ্ধাইয়ের দ্বারা কি ভগবান লাভ হয়? এই কথা শুনে তবে তার জ্ঞান হলো।

৬৫০। শুধু পড়া শুনায় কিছু হয় না, বাজনার বোল মুখস্থ বলতে পারা যায়, কিন্তু হাতে ঠিক ঠিক আনা ভারি শক্ত।

৬৫১। যে কখন ঐশ্বর্য্য ভোগ করে নাই, সেই ঈশ্বরের কাছে ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য করে হেদিয়ে মরে। যে শুদ্ধভক্ত, সে কখন ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে না।

৬৫২। সকাল সন্ধ্যায় সব কর্ম্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে।

৬৫৩। উদার আর সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে তিনি অনেক দূরে।

৬৫৪। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।

৬৫৫। যে ঠিক লোক, তার কোথাও অপমান হবার ভয় নাই। ভগবান তাকে রক্ষা করেন। তার সকল স্থানেই জয়।

৬৫৬। তাঁকে যদি পাও, তবে সবই পাবে।

৬৫৭। মা, বাপ, কত বড় গুরু! নারদের মা যতদিন বেঁচে ছিল, নারদ তপস্যা করতে যেতে পারেনি, মার সেবা করেছে। মার দেহত্যাগ হলে তবে তপস্যায় চলে গেল।

৬৫৮। খুব চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় শেয়ানা আর চতুর, তাই পরের গু খেয়ে মরে।

৬৫৯। বহির্মুখ অবস্থায় লোকে স্থূল জিনিস দেখে, তখন অন্নময় কোষে মন থাকে।

৬৬০। অন্তর্মুখ অবস্থা—যেমন কপাট বন্ধ করে বাটীর ভিতর ঢোকা। অর্থাৎ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম কারণ ও মহাকারণে যাওয়া।

৬৬১। প্রদীপ যখন জ্বলে, তার যে লালচে রং ও ভাব, তাকে স্থূল শরীর বলা যায়, ভিতরকার সাদা আভাযুক্ত যে একটা অংশ, তাকে সূক্ষ্ম শরীর বলা যায়, আর সব ভিতরকার কাল খড়কের ন্যায় ভাগটীকে কারণ শরীর বলা যায়।

৬৬২। মহাকারণে গেলে মানুষের মন লয় হয়ে যায়—আর কিছু বলা যায় না।

৬৬৩। পূর্ব্বজন্ম মানতে হয়। যেমন একজন সকালে এক পাত্র মদ খেয়ে বেজায় মাতাল হল ও ঢলাঢলি আরম্ভ করলে, লোকে ত দেখেই অবাক—যে, এক পাত্র মদ খেয়ে এমন মাতাল হল কেমন করে! তখন একজন বল্লে,—না গো না, ও একপাত্রে অমন হয়নি, কাল সমস্ত রাত ও মদ খেয়েছে।

৬৬৪। দেব দেবী ও সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে তাদের মুখ দর্শন করা ভাল।

৬৬৫। শাস্ত্র, বেদান্ত, দর্শন—এ সব কিছুতেই তিনি নাই। তাঁর জন্য প্রাণ কাঁদবে—ব্যাকুল হবে—তবেই তাঁকে পাবে।

৬৬৬। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, এ কথা বল্লে আর কি হবে? যদি তাঁর দর্শন চাও, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাও, তবে সাধন কর।

৬৬৭। সাপের ভিতরে বিষ আছে, কিন্তু তাতে সাপের কোনও অনিষ্টই হয় না, যাকে কামড়ায় তারই অনিষ্ট ঘটে। এই রকম ভগবানের ভিতরে মায়া আছে, কিন্তু তাতে তাঁর কোনও অনিষ্ট হয় না—জীবই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কষ্ট ভোগ করে।

৬৬৮। হে ঈশ্বর! তুমিই সব করছ, আর তুমিই আমার একমাত্র আপনার; এ সব ঘর বাড়ী পুত্র পরিবার বন্ধু—যা কিছু সবই তোমার; এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞানই পাকা জ্ঞান।

৬৬৯। এ সংসার দুদিনের জন্য, এতে সার কিছুই নাই।

৬৭০। তাঁর প্রতি যাতে আপনার বোধ জন্মে, তাঁর প্রতি যাতে ভাল-বাসা জন্মে, তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়, এই সব কর।

৬৭১। নিক্তির দুটা কাঁটা যখন এক হয়ে যায়, তখন যোগের উপমা। কিন্তু সে রকম একাগ্র মন কয়জনের হয়! কামিনীকাঞ্চন ও বাসনার ভারে মানুষের মন সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কাজেই আর ঈশ্বরের সঙ্গে মনের যোগ হয় না। যারা এ ভার তীব্র বৈরাগ্যের জোরে ফেলে দিতে পারে, তাদেরই যোগ হয়।

৬৭২। যেখানে হাওয়া নাই, দীপ-শিখা ঠিক সিধে হয়ে জ্বলে; কিন্তু একটু হাওয়া পেলেই শিখা চঞ্চল হয়। তেমনি বাসনার লেশ যদি মনে থাকে, তবেই মন চঞ্চল হবে, সে মনে যোগ সাধন হবে না।

৬৭৩। মানুষের মন নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে এক জায়গায় কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরে দেওয়ার নামই যোগ।

৬৭৪। জীবকে সংসারে বদ্ধ করে রাখা—সে মহামায়ারই ইচ্ছা—তাঁরি লীলা। "ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।" লক্ষ জনের মধ্যে দুই এক জনের মুক্তি হয়, বাকি সব তাঁরই ইচ্ছায় নানা ভাবে, নানা রকমে বদ্ধ হয়ে রয়েছে।

৬৭৫। যে সর্ব্বত্যাগী, যার কোনও কামনা বাসনা নাই, এমন লোকের কথা মেনে নিয়ে ঈশ্বর পথে চলতে হয়; তবে ঠিক ঠিক কাজ হয়।

৬৭৬। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় 'তদাকার কারিত।' অর্থাৎ ধ্যেয় ও ধ্যাতায় কোনও ভেদ থাকে না।

৬৭৭। সংসারীর উপায়,—তাঁহার নামগুণ কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ, আর তাঁর কাছে ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করা।

৬৭৮। মাটীর নীচে ঘড়া ভরা ধন আছে, এই শুনে যদি কেউ খুঁড়তে থাকে, তখন তার দর্ দর্ করে ঘাম পড়ে, কিন্তু যখন কোদালটা ঘড়ায় লেগে ঠং করে শব্দ হয়, তখন তার কত আনন্দ! যখন ঘড়া তুলে ফেলে ধন লাভ করে, তখন আরও আনন্দ। সাধন পথেও এইরূপ।

সাধন করতে প্রথমে অনেক কষ্ট পেতে হয়, কিন্তু তাঁর সাড়া পেলে—তাঁকে লাভ করলে, আর আনন্দের সীমা থাকে না।

৬৭৯। অনেকে মনে করে যে, লেখা পড়া না শিখিলে জ্ঞান হয় না, কিন্তু সে মত ঠিক নয়। যদি কোনও বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়, তবে যেমন করেই হোক, তার বাড়ী ঢুকে তার সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা কর। আলাপ হলে তখন তার কয়খানা বাড়ী—কত ঐশ্বর্য্য—সবই ক্রমে জানতে পাবে। ভগবান লাভ হলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান—এ সব তখন আপনিই হয়।

৬৮০। আগে রাম, তারপর রামের ঐশ্বর্য্য। মূর্খ রত্নাকর 'মরা' 'মরা' জপ করে রামকে লাভ করলে। রাম লাভ হবার পর, তখন তাতে আপনিই বিদ্যার স্ফূর্ত্তি পেলে। তখন সে বাল্মীকি মুনি—অত বড় রামায়ণখানা লিখে ফেল্লে। আগে 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর 'রা' অর্থাৎ জগৎ বা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

৬৮১। যে ভগবানকে চায়, সে একেবারেই তাঁর কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। সে আর নিজের হিসেব বুদ্ধি রাখে না, বা কি খাবো, কি পরবো, কি করে দিন যাবে, এ সব কোন ভাবনা ভাবে না।

৬৮২। কুম্ভ জলে ডোবান আছে, তার ভিতর বাইরে জল, তবু তার একটা আলাদা সত্ত্বা থাকে, তেমনি ভক্ত ঈশ্বরে ডুবে আছে, তবু তাঁর একটু আমিত্ব বা পার্থক্য থাকে—এ আমিত্ব হরিরস আস্বাদ করবার জন্য। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ এ 'আমি' ছাড়বার যো নাই। প্রহ্লাদ, নারদ, শুকদেব প্রভৃতিও এ 'আমি' রেখেছিলেন।

৬৮৩। যে বাটীতে একবার রশুন গোলা হয়েছে, সে বাটী দশবার ধুয়ে ফেল্লেও তার রশুন গন্ধ ছাড়ে না, তেমনি যে একবার কামিনীকাঞ্চন রসাস্বাদ করেছে, সে যদি তা ছেড়েও দেয়, তবু মাঝে মাঝে তার মন সে দিকে আকৃষ্ট হয়। ঠিক ঠিক সে পূরো মনে ভগবানকে ডাকতে পারে না।

৬৮৪। হাঁড়ি যদি নূতন হয়, তবে তাতে দুধ রাখতে কোনও সন্দেহ হয় না, কিন্তু যদি দৈয়ের হাঁড়ি হয় তাতে দুধ রাখতে ভয় করে, পাছে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম যে মনে কামিনীকাঞ্চনের দাগ লাগে নাই; সেই মনে যে হরি সাধন হবে তাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু

যারা কামিনীকাঞ্চন ঘেটেছে, তাদের ত্যাগ এলেও তবুও ভয় হয়। পাছে আবার টানে!

৬৮৫। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ আধার না হলে ঠিক ঠিক শুদ্ধাভক্তি লাভ হয় না। মন যদি নানাদিকে ছড়ান রইল তবে একলক্ষ্য হবে কি করে!

৬৮৬। ঘরে যদি বাজ পড়ে তবে যা সমস্ত ভারি জিনিস—সে গুলি নড়ে না, কিন্তু সারসির জানলাগুলো খট্ খট্ করে ওঠে, তেমনি যারা রজো ও তমোগুণী তারা হৈ চৈ সহ্য করতে পারে—হৈ চৈ ভালবাসে, কিন্তু সত্ত্বগুণীর হৈ চৈ সহ্য হয় না—তারা হৈ চৈ করা ভালবাসে না।

৬৮৭। জুতা পায়ে পরে যদি কাঁটাবনে চল, তবে পায়ে কাঁটা ফোঁটবার ভয় নাই, তেমনি যদি ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করে সংসার কর, সংসারে ভয় নাই।

(ক্রমশঃ)

—০—

রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য।

উপাসনার স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা বলিতে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বুঝি না। যাঁহার যাহা ভাল লাগে এবং যিনি যে বিষয়ে অধিকারী, তিনি সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা স্বাধীনতা বলি। আবার উপাসনার স্বাধীনতা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যিনি যে উপায়ে—কর্ম্মে, জ্ঞানে বা ভক্তিতে ভগবানকে উপাসনা করিতে পারিবেন, তাঁহার পক্ষে সেই উপায় অবলম্বনীয়। বহুদিন হইতে ভারতে—ভারতে কেন, পৃথিবীর প্রায় সমগ্র দেশে একটা রব পড়িয়াছিল:—"আমি যেমন ভাবে কথা বলিতেছি, তুমিও তেমনি ভাবে কথা বল, নচেৎ তোমার ধর্ম্মসাধন হইবে না; আমি যেমন ভাবে বসিতেছি—তোমাকেও তেমনিভাবে বসিতে হইবে, আমি যেমন করিয়া বুঝিতেছি, তোমাকেও তেমনি করিয়া বুঝিতে হইবে, আমি যাঁহাকে উপাসনা করি—তুমিও তাঁহাকেই উপাসনা কর, নতুবা ধর্ম্ম করা ব্যর্থ হইবে!" এই কাল্পনিক রব যেন ভগবানের কর্ণে পড়িয়া গেল। সাধারণ ভক্ত বা সাধকের

সাধ্যাতীত বুঝিয়া ভগবান নিজে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া গোলমাল বন্ধ করিয়া দিলেন। অশান্তি পলায়ন করিল। ধর্ম্মরাজ্যে শান্তি-দেবী রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা বলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পথাবলম্বীগণ স্বেচ্ছাচারী, তাঁহাদিগকে আমার একটা কথা বলিবার আছে। যদি আপনার স্বাস্থ্যরক্ষক এবং রুচিকারক খাদ্য কেহ নিজের মনোমত আহার করিলে, আপনারা তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিতে প্রস্তুত; যদি কেহ আপনার সুরুচি সম্পন্ন পুস্তকপাঠ করিবার জন্য আপনিই পুস্তক পছন্দ করিয়া লইলে, আপনারা তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন; যদি কেহ নিজের পচ্ছন্দমত ভদ্রজনানুমোদিত বস্ত্রপরিধান করিলে, আপনারা তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিতে পারেন, এমন কি আপনি নিজে যাহা ব্যবহার না করেন বা পছন্দ না করেন, তাহা অন্য কেহ ব্যবহার করিলে বা পচ্ছন্দ করিলে, সে যদি স্বেচ্ছাচারী আখ্যায় অভিহিত হইবে, তবেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলা যাইতে পারে, নতুবা নহে।

আমরা প্রথমেই দেখি তাঁহার কাছে জাতি, দেশ, ধর্ম্ম বা পদ বিচার ছিল না। ধর্ম্ম বিষয়ে জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকেই যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উচ্চাসন দিতেন, ইহা কখনই নহে। তাঁহার নিকট অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান তো আসিতেন তবে কায়স্থ কুলোদ্ভব নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দ) না দেখিয়া এত ব্যাকুল হইতেন কেন? সুতরাং তাঁহার জাতি বিচার ছিল না। পাঠক মনে করিবেন না যে এই একটী দৃষ্টান্ত, এমন শত শত। আর একটা এখানে উল্লেখ করি। একবার নিজের প্রকোষ্ঠের পার্শ্ব দিয়া একটী মেথর চলিয়া গেলে পর রামকৃষ্ণ সেই মুহূর্ত্তে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া মেথরের পদধূলিতে নিজের মস্তক লুটাইতে লাগিলেন! কেবল সাধন—লোকশিক্ষার জন্য! 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'! এইখানে চৈতন্যদেবের একটী গানের একছত্র আপনা হইতে প্রতিধ্বনিত হয়! "কুল কুল করে মরহ কেন, কুলে কি গোবিন্দ মেলে?" আবার ধর্ম্ম অর্থাৎ যিনি যে ধর্ম্ম—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি অবলম্বন করুন না কেন, সকলেরই তাঁহার নিকট সমান অধিকার ছিল। হিন্দু ঈশ্বরচন্দ্র, ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র, খ্রীষ্টান উইলিয়াম (William) প্রভৃতিকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। আবার যিনি যে মতের—শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি হউন না কেন, সকলেরই তাঁহার নিকট অবারিত দ্বার ছিল। দেশ অর্থাৎ ভক্তের দেশ ঢাকাতেই হোক্ বা

দিল্লিতেই হোক্, বঙ্গে হোক্ বা কলিঙ্গে হোক্, ভারতে হোক বা ভারতেতর দেশেই হোক্; সে বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আজ সেইজন্য আমেরিকার অধিবাসী, ইংলণ্ডের ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, ভারতের সন্ন্যাসীবৃন্দ তাঁহার জয় নিনাদে গগন প্রদেশ নিনাদিত করিতেছেন। পদ অর্থাৎ ভক্ত পণ্ডিত হউন বা মূর্খ হউন, তিনি সহজ প্রাণ দেখিলেই কোল দিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শশধর, প্রতাপচন্দ্র, তাঁহার নিকট যে স্নেহ পাইয়াছিলেন, মূর্খরাজ লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাহার শতগুণ স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। আবার কিনা তিনি একজন ভৃত্যকে (লাটু মহারাজকে) শিষ্যত্বপদে বরণ করিয়াছিলেন! প্রথমে রামের ভৃত্য এবং তদনন্তর রামকৃষ্ণদেবের ভৃত্য লাটু আজ স্বামী অদ্ভুতানন্দ! একি অদ্ভুত কাণ্ড নহে? ধন্য প্রভু! এতদিনে বিশ্বাস করিতে শিখিলাম যে, ভগবান্ "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লংঘয়তি গিরিং।" সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জাতি ধর্ম্ম দেশ পদ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

কর্ম্ম জ্ঞান এবং ভক্তি বিষয়েও তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ গীতা যাহা বারম্বার বলিতেছেন যে, কর্ম্মে জ্ঞানে বা ভক্তিতে ভগবানকে লাভ করা যায়, তিনিও সেই বিষয়ে ভক্তদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। জ্ঞানে শঙ্কর, কর্ম্মে হনুমান এবং ভক্তিতে গোপাঙ্গনা। স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তরাজ রামচন্দ্র, প্রেমিক প্রেমানন্দ, ভক্তশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণানন্দ, কর্ম্ম ও জ্ঞানবীর অভেদানন্দ, সরলশিশুসুলভ সরল ভক্তিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি তাঁহার চরণ তলে বসিয়া আপনাদিগকে চির ধন্য করিয়াছিলেন। রাম এবং গিরিশের ভক্তি, নরেনের কর্ম্ম এবং জ্ঞান, শশীর ভক্তি এবং কর্ম্ম, মানবমাত্রেরই অনুকরণীয়। তিনি কলিকালে নারদীয়-ভক্তি প্রশস্ত বলিয়া বলিতেন বটে, কিন্তু সকলকে তাহা বলিতেন না। অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মার্গ বলিয়া দিতেন। 'নরেন দিয়ে অনেক কার্য্য হবে,' 'গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচআনা ভক্তি', 'রাম আমায় অবতার বলে', ইত্যাদি ভক্তদের বিষয় কতই বলিতেন। তাহা হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, নরেন্দ্রনাথ অমানুষী কর্ম্ম করিতে, গিরিশচন্দ্র জ্বলন্ত বিশ্বাস প্রচার করিতে এবং রামচন্দ্র রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে, ভগবানের সঙ্গে এই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি দেহ ধরিয়া থাকিতে থাকিতে ভক্তদিগের মধ্যে ভাববৈষম্য দেখিয়া

তিলমাত্র বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঠিক স্নেহময়ী জননীর মত যে কতই কথা বলিতেন, আজ সেগুলি মনে পড়িলে পাষণ্ডের চক্ষু হইতেও একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। তিনি সেই ভাব-বৈষম্য দেখিয়া যিনি যে ভাবের অধিকারী, অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহাকে সেই ভাবের উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন "যা'র যা পেটে সয়, মা তা'র জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করে। কারু জন্য ঝোল, কারু ঝাল, কারু বা অম্বল।" তাই জগজ্জননীরূপী রামকৃষ্ণ যাহার যেরূপ আধার দেখিতেন, তাহাকে তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। সুতরাং কর্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞান বিষয়ে যে তিনি মানবকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সাকার এবং নিরাকার উপসনায়ও তিনি স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। সাকার-বাদী বৈষ্ণব এবং নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদিগের উপর সমস্নেহ হইতে তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ। আমরা জানি যে, যখন শ্রীমকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তুমি সাকার মান, না নিরাকার মান' এবং যখন শ্রীম উত্তর করিলেন, 'আমার নিরাকার ভাল লাগে,' তখন তিনি কেমন শ্রীমকে সাবধান করিয়া বলিলেন "দেখ, নিরাকার মান, তা ভাল, কিন্তু সাকারবাদীকে ঘৃণা করোনা। কেননা, ভগবান সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন, আবার এ দুয়ের অতীত যদি কিছু থাকে, তাও বটেন। তিনি অনন্ত, তিনি শান্ত। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি এইটী বটেন, অন্য কিছু হইতে পারেন না—একথা বলিলে তাঁর অনন্ত শক্তিত্বের উপর সন্দেহ করা হয়।" তাহার এরূপ বলিবার অর্থ এই যে, যাঁহার যেরূপ ভাব, তাঁহার সেরূপ লাভ। কেবল পাত্র ভেদ, অধিকারী ভেদ, আধার ভেদ। পূজ্যপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের নিকট হইতে এ বিষয়ে একটা শোনা গল্প মনে পড়ে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গের একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন। একদা দুইটী ব্যক্তির ভগবান সাকার কি নিরাকার এই সন্দেহ-সাগর উথলিয়া উঠিল। পণ্ডিত যখন গঙ্গাতীরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া মুক্তি পাইবেন বলিয়া সবান্ধবে তথায় উপস্থিত এবং যখন তাঁহার শয্যার্দ্ধ জলমধ্যে নিমজ্জিত তখন সেই দুইটী বিবদমান ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তখনও সজ্ঞান দেখিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সকলে সেই প্রার্থনা শুনিয়া যুগপৎ হাস্য ও বিস্ময় রসে আপ্লুত হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কারুণিক পণ্ডিত মহোদয় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন সংশয়াকুল ব্যক্তিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল "আপনি তো চলিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশে এমন পণ্ডিত কে আছে

যে আমাদের চিরপোষিত সংশয় দূর করিবে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন,—ভগবান সাকার কি নিরাকার?" সেই শোক-হাস্য বিস্ময়-রাজ্যের মধ্যে পণ্ডিতজী জীবনের শেষে যে শেষ কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে নর-শরীর মরিল বটে, কিন্তু পণ্ডিতজী চিরদিনের মত অমর হইয়া থাকিলেন। তিনি জলদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন :—

"কেচিৎ বদন্তি সাকারং, নিরাকারস্তু কেচন,
বয়ং তু দীর্ঘ সংযোগাৎ নীরাকারং উপাস্মহে।"

অর্থাৎ ভগবানকে কেহ বা সাকার, কেহ বা নিরাকার বলেন। কিন্তু আমারা ই স্থানে ঈ সংযোগ করিয়া—অর্থাৎ নীরের মত আধার সাপেক্ষ আকার জানিয়া পূজা করি। নীর বা জলের যেমন নিজের কোনও আকার নাই, তাহাকে যে আধারে রাখা যায়, সে সেই আধারের আকার ধারণ করে; ভগবানের সেইরূপ কোনও আকার নাই। তিনি যেমন আধার পা'ন, তেমনিই আকার ধারণ করেন। তিনি সাধুর আধারে সাধু, অসাধুর আধারে অসাধু; মানবের আধারে মানব, পশুর আধারে পশু; সাকার পূজকের আধারে সাকার, নিরাকার পূজকের আধারে নিরাকাররূপে বিরাজমান। অতএব সাকার বা নিরাকার পূজায় তিনি (ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। কেবল অধিকারী ভেদ দেখিতে হইবে। তাহা গুরুই দেখিবেন। আমরা কেবল এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত হউন বা না হউন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের মহোদার মতের পোষকতা এবং অনুসরণ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক যথার্থ গুরু যে এই পন্থা অবলম্বন বা অনুসরণ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

সকল আশ্রমে যে ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়েও তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভক্ত গৃহস্থাশ্রমী হউন বা সন্ন্যাসাশ্রমী হউন, তিনি ভগবানকে লাভ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার ভক্তগণের জীবনী হইতে দেখিয়াছি। কেহ বলিতে পারেন যে নরেন, রাখাল, শশী ইত্যাদি তো তাঁহার জীবিতাবস্থা হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই, তবে যে তিনি গৃহী সন্ন্যাসীদিগকে সমান ভাল বাসিতেন বা অধিকার দিতেন, একথা কিরূপে বলা যায়? এ কথা তখনও বলা যাইতে পারিত, কারণ তাঁহার সময় হইতে যেন দুইটী দল—গৃহী এবং সন্ন্যাসী—প্রস্তুত হইয়াছিল। এই দুই দলকে তিনি যথাযোগ্য উপদেশাদি প্রদান করিতেন। হৃদয়বিহারী তিনি, সকলের হৃদয়ের

ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাহার যে ভাবটী অবলম্বনীয় তাহাকে সেই ভাবটীর অনুসরণ করিতে বলিতেন। আবার শুনিয়াছি, কেহ সন্ন্যাসাশ্রমের দিকে একটু ঝোঁক দেখাইলে, তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন। প্রভু জানিতেন, তাহার গৃহীর ধাত্। আবার কেহ সন্ন্যাসাধিকারী গৃহী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বলিতেন "তোর সে দিক নয়। তুই সংসারে পড়ে গুলিয়ে যাবি। এদিক ওদিক দুদিক্ রাখতে পার্ব্বিনে।" এমন কি, যাঁহাদের সন্ন্যাসের যোগ্যতা দেখিতেন, তাঁহাদিগকে ধুনি জ্বালিয়া ধ্যানধারণা করিতে বলিতেন এবং কতবারই না নিজের প্রকোষ্ঠে তাঁহাদিগকে ধ্যান অভ্যাস করাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য নিজেও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন! নরেন্দ্রনাথ কোথায় ওকালতী পড়িয়া কামিনীকাঞ্চনের সেবা করিবেন—না—ভগবান তাঁহাকে জগতের সেবায় নিযুক্ত করিলেন! তাঁহার জনৈক প্রথিতনামা ভক্ত সন্ন্যাসী হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই ঘুরিয়া গেল, তাঁহাকে সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইল! তিনি জানেন অধিকারী কে, অনধিকারী কে। আমাদের কেবল পাগলের মত বকাই সার। ভগবান গৃহস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম বা কোনো আশ্রম দেখিতে চাহেন না—সরল প্রাণপুষ্প দেখিলেই মধুমক্ষিকার মত ছুটিয়া আসেন। তাই বলিতেছিলাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গৃহী এবং সন্ন্যাসীর সমান স্বাধীনতা ছিল।

যাঁহার সামান্য একখানি সাদা ধুতি ব্যতীত অন্য কিছু প্রয়োজন হইত না, যিনি একখানি সাদাসিদে জামা ব্যবহার করিয়া কাল কাটাইলেন, চটী জুতা যাঁহার পদ সেবায় ব্রতী ছিল, যাঁহার বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করিলে তিনি যে সাধু তাহা আদপেই প্রথম দৃষ্টিতে অনুমিত হইত না, এমন কি যাঁহাকে একবার উদ্যানে দেখিয়া কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তার উদ্যান রক্ষক বা 'মালি' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে চেনাইবার জন্য—গৈরিকবস্ত্র বা ভস্ম-লেপ কথনও প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার যে বেশভূষা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল বা তিনি যে ভক্তদিগকে বেশভূষা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি রক্তবস্ত্র পরিধান করুন বা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করুন, কেশ বিন্যাস করুন বা নাই করুন, রেশমের জামা পরিধান করুন বা সূতার জামায় কার্য্যনির্ব্বাহ করুন, উচ্চদরের জুতা ব্যবহার করুন বা অল্পমূল্যের জুতা ব্যবহার করুন, তাহাতে বড় আইসে যায় না। যাহাতে মন চঞ্চল না হয়, সেইরূপ বেশধারণ করিলেই হইল। মনটা নিয়েই যত গণ্ড-

গোল। তাহাকেই সংযত রাখিবার জন্য ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে এবং হইতেছে। ছোট ছেলেটীর মত মনটা বড়ই অবোধ। ছোট ছেলেকে ভুলাইবার জন্য যেমন নানা কৌশল করিতে হয়, এই অবোধ মনটাকেও বুঝাইবার জন্য রাশি রাশি শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সংযতমনার পক্ষে পচ্ছন্দমত বেশভূষা গ্রহনীয়। সেইজনা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বেশভূষার উপর বড় একটা গুরুত্ব দিতেন না; অর্থাৎ সে বিষয়ে তিনি স্বাধীনতাই দিতেন।

অনেকের নিকট হইতে একটা প্রশ্ন বারম্বার শুনিতে পাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের খাদ্য বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া ছিল কিনা? আমরা তদুত্তরে বলিতে পারি যে, অন্তর্য্যামী ভগবান প্রাণময় ভগবান—সরল প্রাণই দেখিতেন, কে কি খায় না খায়, তার বড় খোঁজ রাখিতেন না। তাঁর ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে। যখন বালক রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে থাকিতেন, তখন গ্রামস্থ চিনিঋস শাঁখারী নামক জনৈক সিদ্ধব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে কোলে ধরিয়া 'ভাই কানাই', 'ভাই কানাই' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। তিনি নাকি একদিন বলিয়াছিলেন 'গদাই,* তোর সব ভাল, তবে তুই যে ওই মাছটা খাস্, ঐটা কেমন কেমন লাগে।" প্রত্যুৎপন্নমতি বালক গদাই তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন "কেন? গরুড় তো সাপ খেত, সে কেমন করে বিষ্ণুর বাহন ছিল?" সেই কথা শুনিয়া সাধকপ্রবর বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইলেন, এবং নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন। যাহা আহার করিলে সাময়িক সাধনের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তিনি তাহা আহার করিতে বারণ করিতেন। আমরা তাঁহারই জীবনে দেখিয়াছি, তিনি জীবনের প্রায় শেষ ১০ বৎসর মৎস্য আহার করিতেন না। কেহ মা কালীর ভোগ বলিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিতেন। তাঁহার এরূপ আচরণ কি তাঁহার বৈষ্ণব ভক্তদিগের জন্য? বৈষ্ণবদিগের ভিতর যে চিরদিন মা কালীর ভোগের উপর একটা অশ্রদ্ধা ছিল, বৈষ্ণবেরা যে মা কালীর ভোগ স্পর্শ করা দূরে থাক্, দেখিলেই সরিয়া পড়িতেন, প্রভু কি সেইজন্য ভক্তদিগের তরে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইতেন যে স্পর্শ না কর নাই, না খাও নাই, ঘৃণা করা অত্যন্ত অন্যায়? আমরা শুনিয়াছি, জনৈক পানাসক্ত † ভক্তের নামে অন্যান্য ভক্তগণ গিয়া বলিলে তিনি বলিলেন "তোদের এত মাথাব্যথা কেন? ওতে ওর

* রামকৃষ্ণদেবকে বাল্যাবস্থায় লোকে 'গদাই' বলিয়াই ডাকিত।

† ভক্তটী ঠাকুরের কাছে আসিবার আগে বিস্তর মদ্যপান করিতেন।

কিছু আসবে যাবে না—ক্ষতি হবে না।" আরও শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয় পরিত্যাগ এবং মদ্যপান পরিত্যাগের বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি না কি বলিয়াছিলেন—রঙ্গালয় পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহাতে লোকের অনেক উপকার হবে; পানাদি আপনি পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে, জোর করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না।" দোষদর্শী ইহাতে দোষানুসন্ধান করিবেন করুন, কিন্তু প্রশান্ত, পবিত্র, ভাবুক মানবমাত্রেই এ কথার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার শ্রীমুখের একটা কথা বলিলে ভাল হয়। তিনি বলিয়াছিলেন "জোর করিয়া কিছু করা ভাল নয়। ঘায়ের মামড়ী যখন আপনি খসিয়া পড়ে, তাই ভাল। জোর করিয়া ছাড়াইতে গেলে তাহা হইতে রক্ত পড়ে।" তিনি আরও একটী কথা বলিতেন "ভোগ না করিলে ত্যাগ হয় না।" এই সব কথা শুনিয়া, কেহ যেন না মনে করেন যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব খাদ্যাখাদ্যের বিচার রাখিতে বারণ করিতেন। যাঁহার যাহা পেটে সয়, যিনি যে খাদ্য খাইলে তাহা হইতে উপকার ব্যতীত অপকার পাইবেন না, তাহাকে সেই খাদ্য খাইতে দেখিলে কিছু বলিতেন না। আর একটা কথাও বলিয়া রাখি, তিনি বেড়ার কাঁটাগাছগুলোতে বড় বেশী জল দিতে ভাল বাসিতেন না। যাহার জন্য বেড়া, তাহারই গোড়ায় জল দিতে ভালবাসিতেন এবং জানিতেন যে, যতদিন চারাগাছ, ততদিন বেড়া, তারপর গাছ বড় হইলে বেড়া খুলিয়া গাছে হাতী বাঁধিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আমরা স্বামী বিবেকানন্দে এইরূপ একটা বৃক্ষের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। তাঁহার কোন রূপ বেড়ার প্রয়োজন ছিল না। তাই ঠাকুর নিজে তাঁহার সমস্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। যে অল্পদর্শীগণ শঙ্করোপম স্বামীর নিষ্কলঙ্ক জীবনে এই সামান্য খাওয়া দাওয়া লইয়া কলঙ্ক লাগাইতে যান, তাঁহাদিগকে আমাদের এইটুকু বক্তব্য আছে; ভাই! স্বামীজীর বন্ধন তাঁহার গুরুদেবই খুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, নরেন সূর্য্যের মত তেজোময়—সমস্ত পাপতাপ তার কাছে পুড়ে ধ্বংস হ'য়ে যাবে—একটুও তা'কে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।" সময় সময়—বহু ব্যস্তবাগীশদিগকে দেখিয়া আমার মনে হয়—তাঁহাদের মতে খাওয়া দাওয়ার বিচার লইয়া যেন ভগবান সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাঁহারা বোঝেন না যে "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন; নতু খাদ্যগ্রাহী।" আমরা বলিয়াছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের খাওয়া দাওয়ার কথা লইয়া সময়াতিপাত বড় হইত না। লোকে ভগবানকে কি করিয়া পাইবে; এই প্রশ্ন শুনিলে বড়ই আহ্লাদিত হই-

তেন এবং ভগবল্লাভের উপায় বলিয়া দিতেন। আর একটা বড়ই দুঃখের কথা এই যে, অনেক নবভক্তদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিচার সম্বন্ধে নিরতিশয় সজাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি খাদ্যাখাদ্য বিচার নিরূপণের উদ্দেশ্যে ভগবান লাভে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা সেই ব্যর্থ তর্কবিতর্কে কালহরণ করেন! ইহা হইতে আর শোচনীয়তর বিষয় কি হইতে পারে? সে যাই হোক্, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচারিতা নহে—দিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

আমরা এখানে উপাসনার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সিদ্ধ এবং সাধকের স্বাধীনতা বিভিন্ন রকমের হওয়া উচিত। সিদ্ধ যে স্বাধীনতা এবং যতদূর স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন, সাধকের পক্ষে সর্ব্বদা সে স্বাধীনতা বা ততটা অবলম্বন করা দূষনীয় হইয়া দাঁড়ায়। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণকে সেইজন্য প্রারম্ভেই বলিয়া দিয়াছি যে, ঠাকুর যতটা সমন্বয়ের ভাব দেখাইয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর বা মঙ্গলকর হইতে পারে না। তিনি ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম্ম এবং মতাবলম্বীদিগের সহিত যেরূপভাবে মিলিয়া থাকিতেন এবং তাহার মধ্যে যেরূপ ভাবে তাঁহার নিজের ভাবটী মন্দর পর্ব্বতবৎ অচল অটল হইয়া থাকিত, আমাদের পক্ষে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তিনি নবনী—জলে মিশিবার নহেন। আমরা দুগ্ধ—জলে মিশাইলে আর নিজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত থাকে না। জল—এই বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং মতাবলম্বী মানবকুল। যাঁহারা গুরু স্বাধীনতা* অনুকরণের সাতিশয় পক্ষপাতী, তাঁহারা একবার শঙ্করাচার্য্যের সেই অবোধ শিষ্যমণ্ডলীর কথা মনে করুন। গুরু গলিত তপ্ত লৌহ উদরস্থ করিলেন—কিন্তু অল্পশক্তি শিষ্যবৃন্দ তাহা করিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন! ঠাকুরের একটা কথাতেই উপরোক্ত কথাটীর মীমাংসা হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি ষোল টাং করি, এই বলে যে তোরা যদি এক টাংও করিস্।" অর্থাৎ তিনি যেখানে ষোল আনা দেখান, বা যে কর্ম্মটা ষোল আনা করেন, আমাদের সেখানে এক আনা করাই সম্ভব। অতএব কথা হইতেছে, উপাসনা করিতে যাইয়া আমরা কুসংস্কারের বা স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয়গ্রহণ করিব না, অথবা যতটা স্বাধীনতা আমাদের শক্তিবহির্ভূত, তাহার বিচার করিয়া কার্য্য করিব।

* অর্থাৎ গুরুর আচরণে যে স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ আর কি বলিব? যে স্বাধীনতা ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, যে স্বাধীনতা ব্যতীত পশুপক্ষী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়না; যে স্বাধীনতার অভাবে নিগ্রোগণ মানব হইয়াও পশুর মধ্যে গণ্য হইত; যে স্বাধীনতা গুণে পুষ্প সুগন্ধ বিতরণ করে, সূর্য্য আলোক এবং তাপ প্রদান করে, চন্দ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় প্রাণ প্রফুল্লিত করে, এবং গন্ধবহ বহুলকর্ম্ম সমাধান করে; পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা হইতে মানব পর্য্যন্ত যে স্বাধীনতার জন্য লালায়িত, ধর্ম্মজীবনে যে সেই স্বাধীনতা যারপরনাই দরকার, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই স্বাধীনতা দেখিয়া মনে হয়, তিনি সত্যসত্যই এই স্বাধীনতা প্রিয় যুগের একমাত্র সম্রাট্। তিনি যদি তেমন না হইতেন, অন্য দেশের কথা যাই হোক্, স্বাধীনতা ধ্বজাধারী, চিরস্বাধীন মার্কিণের মস্তক কথনও তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইত না। স্বাধীন ইংরাজ নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত না, কিম্বা স্বতন্ত্র অষ্ট্রেলিয়া তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইত না। আজ বিজ্ঞানালোকে আলোকিত, স্বাধীনতাপ্রিয় ভারত যুবকমণ্ডলী—কুসংস্কার চাহেন না, বন্ধন চাহেন না, উন্মুক্ত বিহঙ্গমের মত স্বাধীনতা চাহেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা চাওয়া উচিত নহে। নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক সকল বস্তুকে চলিতে হয়। তাঁহারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইবেন, তবে কৃত্রিমবন্ধন বড় বেশী সহ্য করিতে পারিবেন না। আমরা মানব-মনের এইটুকু আকাঙ্ক্ষাকে কখন দূরাকাঙ্ক্ষা বলিতে পারি না। ইহা পূর্ণ হইবারই কথা। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে, এই নব্যভারতে মানব মনে ধর্ম্মরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে গৃহীত হইয়াছেন, তাহার কারণ তিনি ধর্ম্মরাজ্যে স্বাধীনতার নিরতিশয় পক্ষপাতী। তাই রামকৃষ্ণভক্তমাত্র কেহই বাহ্য দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া, সকলে সহজ ও সরল মনের সমাদর করিতে শিখিয়াছেন। একটা কথা এখানে বলা যারপরনাই দরকার। কোন কোন দোষদর্শী বলিয়া থাকেন যে রামকৃষ্ণের ভক্তগণ দেব দেবী মানেন না, পূজা কর্ম্ম মানেন না, আচার বিচার মানেন না, একটা নূতন ধরণের ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দুই একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। যিনি লোক শিক্ষার জন্য প্রত্যহ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবা না করিয়া অন্ন স্পর্শ করিতেন না, যিনি কলিকাতা আসিলেই রাম, বলরাম ইত্যাদির বাটীতে ঠাকুর পূজা হয় বলিয়া সেইস্থানেই থাকিতে ভাল বাসিতেন, যিনি প্রত্যহ প্রদোষে প্রার্থনা করিবার সময় সমস্ত দেব দেবীকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা

সাঙ্গ করিতেন, যিনি প্রায়ই বলিতেন "লোকাচার রাখতে হয়।" যিনি—বিনষ্ট করিবার জন্য নহে, গঠন করিবার জন্য—পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নিষ্কলঙ্ক ভগবান রামকৃষ্ণে কলঙ্ক লেপন সুধীব্যক্তির কার্য্য কি? তিনি কি অধর্ম্ম বিস্তার করিতে আসিয়াছিলেন? না! না!! ওই যে তিনি গীতায় শ্রীকৃষ্ণরূপে—বারম্বার বলিতেছেন—

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

—:-০:—

সাগর ও নুনের পুতুল।

—*০*—

বিশ্বজনপূজিত, ভক্তের ভগবান, পরমহংস রামকৃষ্ণের ভুবনবিখ্যাত বিমল জ্যোতিঃ দর্শনে সকলেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত! ক্রমে সকলেই তাঁহার যশোগীতি এবং গুণ-গরিমায় আকৃষ্ট হইয়া, একবাক্যে মহাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন। আব্রাহ্মণ ভারতীয় জাতি হইতে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-যাজী সুদূর নীল সলিল পরপারস্থ খৃষ্টানগণ পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্রতার আকর্ষণে আকৃষ্ট। ধর্ম্ম-পিপাসুগণ প্রায় সকলেই এখন তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতধারা পানে পরিতৃপ্ত। নিদাঘ-তপন-তাপ-তাপিত শুষ্ক-কণ্ঠ-চাতক যেমন "ফটিক জল! ফটিক জল!!" রবে গগনমার্গ বিদারিত করে, তেমনই ধর্ম্মপিপাসুগণ "ধর্ম্ম কৈ! ধর্ম্ম কৈ!!" বলিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে তারস্বরে চীৎকার করিয়া, আসাগর-হিমাচলশৃঙ্গ প্রকম্পিত করিতেছিলেন, তখনি ভগবান রামকৃষ্ণ অভয়হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন,—"এই লও ধর্ম্ম।"

বস্তুতঃ ধর্ম্মের অভাব নাই। ধর্ম্ম অনেকই আছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে, লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া কাঁচকে কাঞ্চন করিতে পারে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম কামিনীকে জননীজ্ঞানে পূজা করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম জনসাধারণকে ভ্রাতৃ-বোধে আলিঙ্গন করিতে হস্তপ্রসারণ করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম, সেবাকে ব্রত, দানকে কর্ম্ম বলিয়া আসন প্রদান করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম ত্যাগকে লাভ বলিয়া গণ্য করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম বৈরাগ্যকে দীক্ষা সূচনা—বলিয়া মনে করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ? যে ধর্ম্ম "সকল ধর্ম্ম সমান ও সত্য" বলিয়া ঘোষণা করে, তেমন ধর্ম্ম কৈ?

আজ প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বজনের হৃদয়-বীণার ধর্ম্ম-সূত্র স্পর্শ করিয়াছেন, তাই সকলের প্রাণ এক সুরে নাচিয়া উঠিয়াছে এবং সকলেরই প্রাণে এক অভাবনীয় ঐশী শক্তির হিল্লোল খেলিতেছে; তাই আজ সকলেই তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত এবং চরণধূলায় ধূসরিত। তিনি বাক্য-সুধা দানে সকলেরই তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন, তাই আজ জগৎ নিস্পন্দ নীরব ও গম্ভীর; শুধু একান্তে বসিয়া অনন্যমনে তাঁহারই নাম-সুধা পানে বিভোর।

অগ্নি যেমন লুক্কাইত থাকে না, জ্বলিয়া ওঠেই ওঠে; সত্য যেমন গোপন থাকে না, প্রকাশ হয়ই হয়; সনাতনধর্ম্মও অপ্রচারিত থাকেনা, প্রচারিত হয়ই হয়। বর্ত্তমানে ভারতে,—ভারতে কেন সমগ্র জগতে—শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই কোন না কোন ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বমুখনিঃসৃত উপদেশাবলী পাঠ অথবা শ্রবণ গোচর করিয়াছেন। তাহারই মধ্যে একটী উপদেশে, তিনি সমাধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "সমাধি তেমন, একটী নূনের পুতুল সাগর মাপ্‌তে গেলে যেমন হয়।" মরি! মরি! এমন প্রাঞ্জল ভাষায় এমন চিত্ত-গ্রাহী, হৃদয়-দ্রবকারী, সর্ব্বসাধারণ বোধগম্য, এ হেন সুন্দর উচ্চদরের উপদেশ আর কোথাও আছে কি? এই একটী কথাই হৃদয়ে কত ভাবের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এইটী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেই, পাঠক মহাশয়গণের নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়াছি।

নূন;—আমরা অসীম, 'অনন্ত অগাধ সমুদ্র হইতে নূন পাইয়া থাকি। আমাদের আত্মাও তেমনি মানব বোধাতীত, অপরিমেয় শক্তিসম্পন্ন, করুণাধার, অনমুমেয় পরমেশ্বরের নিকট হইতে আইসে! সাগরবারি হইতে নূন পৃথক করিলেই দেখা যায়, তাহার সঙ্গে বহুবিধ বস্তু ও অবস্তু মিশ্রিত রহিয়াছে। অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে সত্য, কিন্তু নূনটুকু নূনই থাকে, তাহার কোনও বিকার হয় না। পরিষ্কার করিলেই, শরীর রক্ষক খাদ্যোপযোগী নূন। এই জীবাত্মাও তেমনি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জড়জগতে আসিয়া, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ, কাম ক্রোধ ইত্যাদি পার্থিব ধর্ম্মাধর্ম্মের সহ জড়াইয়া পড়ে; কিন্তু 'আত্মা' সেই আত্মাই থাকে, তাহার কোনও বিবর্ত্তন হয় না।

সেই নূন বাছিয়া লইলেই প্রকৃত নূন, কিন্তু পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইলেই কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন এবং আয়াস ব্যয়িতব্য। আত্মাও তেমনি ধ্যান, ধারণা, কর্ম্ম ও পবিত্রতা দ্বারা ঐ সকল জাগতিক গুণাগুণ হইতে বিভক্ত রাখিলেই, প্রকৃত—জীবাত্মা।

পুতুল—নূন ছাঁচে ফেলিয়া কিম্বা হাতে গড়িয়া পুতুল করা হয়। আত্মাও তেমনি পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহ ছাঁচে ফেলিয়া মানব নামে অভিহিত হয়। নূনটুকু বাদ দিলে পুতুলের যেমন অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ জীবদেহে 'আত্মা' না থাকিলে, মানবের মানবত্ব থাকে না, তখন শবত্ব প্রাপ্ত হয়।

সাগর মাপা!—সাগর—ঈশ্বর; মাপা—ধারণা করা! নূনের পুতুল সাগর জলে অবতরণ করিবামাত্রই গলিয়া সাগরজলে মিশিয়া যায়, তখন আর তাহার অস্তিত্ব সেই পুতুলরূপে সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন সে নয়নের অগোচর, অসীম, অনন্ত; তাহার এতটুকু দেহ, সেই অত বড় দেহের তন্ত্রে তন্ত্রে মিশ্রিত। তাহাকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাইনা বলিয়া, সে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিতে পারি না; কারণ সাগরের একবিন্দু জল আস্বাদ করিয়া দেখি, তাহাতে নূনের সত্বা বর্ত্তমান, অপরাপর প্রক্রিয়াদ্বারাও সাগরের প্রত্যেক বিন্দুতে নূনের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তখন আর সে পুতুল নহে, তখন সেই পুতুল, দৃশ্যমান জগতের সীমানা পার হইয়া অনুভূতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। যে সাগর হইতে আসিয়াছিল, সেই সাগরেই পুনরায় মিশিয়া গিয়াছে।

ঠিক সেইরূপ, মানব পরমেশ্বরের অলৌকিক পরম্পরা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানে চিন্তানিমগ্ন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইল; সমাধিস্থ হইবামাত্রই তাঁহার রূপ-জ্যোতিঃ দর্শনে বিমুগ্ধ এবং তাঁহার অনন্ত শক্তিতে মানবীয় ক্ষুদ্রশক্তি মিশ্রিত হইল; তখন আর সে মানব নহে; তখন আর তাহার পৃথক কোনও সত্বা রহিল না, তখন সে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে বিলীন। এখন তাহার অস্তিত্ব সেই ঈশ্বরে; সেই ক্ষুদ্র জড়দেহে এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এখন তাহার ভিন্ন সত্বা রহিল না। এখন তাহার সত্বা বিশ্ব জগতে,—প্রতি পাতায়, প্রতি লতায়, প্রতি মানবে, প্রতি প্রাণীতে প্রতি অণুতে, প্রতি পরমাণুতে। সংক্ষেপতঃ,—

যথাগতং তথা গতঃ।

শ্রীসতীশ দেব।

ভূমি।

তুমি অনাদি, অনন্ত, অজ্ঞেয় সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষ। হে লীলাময়! তোমার লীলা তুমি ভিন্ন কে বুঝিবে? শুনিয়াছি, যখন এই ত্রিজগতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, যখন সকলই কেবল মহাশূন্যগর্ভে নিহিত ছিল, তখন সেই

অনন্তশূন্য মাঝে তোমারই স্বচ্ছ সৌম্য "ওঁকার" মূর্ত্তিটী বিরাজ করিতেছিল। তাহার পর হে ইচ্ছাময়! বিশ্ব সৃজন অভিপ্রায় করিয়া যখন তুমি ক্ষীরোদ বক্ষে অনন্ত নাগ-শয্যায় শয়ন করিয়া সুপ্তিমগ্ন হইলে, তখন তোমারই মহদিচ্ছায় তোমারই নাভিপদ্ম হইতে বিরিঞ্চি সমুদ্ভূত হইয়া, তোমারই অভিপ্রেত-কার্য্য সম্পাদন করিতে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন। সৃষ্টি রক্ষার জন্য আবশ্যক বোধে, তুমিই অংশরূপে যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্যে উদ্ভূত হইয়াছিলে। আবার ঐ সকলের যথাবিধি তত্ত্বাবধান বা রক্ষার জন্য তুমিই বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলে। তোমারই অপূর্ব্ব লাবণ্যময় জ্যোতিকণা লাভ করিয়া ভাস্কর জগতের তমঃ নাশ করিলেন। তুমিই শশাঙ্করূপে তোমার বিরাট দেহের সুস্নিগ্ধ কিরণমালা ঢালিয়া সর্ব্বাগ্রে ধরণীবক্ষঃ সুশীতল করিয়াছিলে। তুমিই বরুণ বেশে ধরিত্রীর উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করিয়াছিলে। তোমা হইতে উদ্ভূত—তোমারই শিল্পচাতুর্য্যের অতুলনীয় নিদর্শন, পদ্ম-পারিজাতাদি বিবিধ কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া, তোমারই অভয় চরণারবৃন্দে আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রথমে উদ্ধমুখ হইয়া চাহিয়াছিল। ঋতুরাজ বসন্তের প্রিয়সখা মলয়ানিল, প্রথমে তোমারই কমনকান্ত জ্যোতির্ম্ময় দেহে ব্যজন করিয়া এত মনোরম হইয়াছিল। বিচিত্র বিহঙ্গকুল জন্মগ্রহণ করিয়া প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমারই বন্দনা-গীতি গাহিয়াছিল। তুমি শ্রেষ্ঠ-জীব মানবের অন্তরে জ্ঞান ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, মমতা, পুণ্য ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণরাজির সমাবেশ করিয়া, তাহাকে যথার্থ "মানব" নামের উপযোগী করিয়াছিলে। আবার অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, অহংজ্ঞানপরিপূর্ণ মানব-সমাজ যখন তোমার নিরূপিত ন্যায়-পথে চলিতে বিরত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে যথেচ্ছাচার ব্যবহারে ধরাবক্ষঃ কলঙ্কিত করিতে লাগিল, যখন এই মানবনিবাস পৃথিবী, নিরয়নিবাসে পরিণত হইতে চলিল, তখন তুমিই আপন বিকট দশন ও লোলজিহ্বা সমন্বিত ভয়ঙ্কর বদন ব্যাদান করিয়া রুদ্ররূপে সংহার কার্য্য আরম্ভ করিলে। তোমার সেই ত্রিলোক-ত্রাসক সর্ব্বগ্রাসী বদন হইতে অহরহঃ "মৃত্যু" "মৃত্যু" শব্দ উচ্চারিত হইয়া জগতের নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করিয়া, পাপীর হৃদয়ে ভীষণ আতঙ্কের উদ্রেক করিয়াছিল। তাহার পর কৃপাবিষ্ট হইয়া করধৃত বিষাণবাদনপূর্ব্বক, হে আশুতোষ! তুমিই আবার জগতে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলে।

জগতের যাহা কিছু তুচ্ছ, তাহাই তোমার আনন্দপ্রদ; যাহা কিছু ঘৃণ্য, তাহাই তোমার প্রিয় সহচর; সাগর মন্থন করিয়া কমলা, ঐরাবত ও মৃত-

সঞ্জীবনী সুধা প্রভৃতি উত্থিত হইবামাত্র দেবতারা বিভাগ করিতে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু পরিশেষে যখন গরল উত্থিত হইল, তখন তুমিই সেই পাপরূপ উৎকট হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ সাজিয়াছ।

তুমি অতুল বৈভবশালিনী জগজ্জননী শ্যামামায়ের স্বামী, অগাধ অক্ষয় ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও হে যোগীন্দ্র! অর্থলোলুপ, মায়াজড়িত, সংসারলিপ্ত মানবকে নির্লিপ্ত সংসারী ও নিষ্কাম বৈষ্ণব হইতে শিক্ষা দিয়াছ।

হে সর্ব্বব্যাপী "সত্যং শিবং সুন্দরং" তুমি কোথায় না আছ? পাপীর কাছে তুমি পতিতপাবন, অনাথ আতুরের কাছে অনাথনাথ, শোকার্ত্তের অশ্রুজল মুছাইতে মিত্র, সত্যের সাক্ষ্য জন্য সাক্ষীগোপাল, তুমিই রোগীর অসহ্য রোগ যন্ত্রণা উপশম নিমিত্ত দিবারাত্র তাহার রোগশয্যা শিয়রে বসিয়া বৈদ্যনাথরূপে সান্ত্বনা দিতেছ।

তোমার শ্রীমুখ নিঃসৃত—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন জন্য, তুমিই অতীত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও বর্ত্তমান কলিযুগে যথাক্রমে মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ক্ষত্রিয়শূর নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ও পরশুরাম, গীতা নাট্যের সম্পূর্ণ অভিনয় প্রদর্শন অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনসখা কৃষ্ণ ও বলভদ্র সাজিয়া এই ভব নাট্যশালায় প্রকটিত হইয়াছিলে। তৎপরে 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' প্রচারার্থে বুদ্ধরূপধারণ করিয়াছিলে। আবার যখন সৌগতগণ মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বৈদিকী ক্রিয়াকলাপের বিলোপ সাধন করেন, তখন মহাযোগী শঙ্করাচার্য্যরূপে তুমিই অবতীর্ণ হইয়াছিলে। এ যুগেও হে শ্রীপতি! বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—"জীবে দয়া, নামে রুচি, সাধু, গুরু বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি—প্রচারকল্পে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য নামে, হরিগুণ গানে সমগ্র বঙ্গকে এক অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে মাতাইয়াছিলে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করণ অভিলাষে তুমি আবার রামকৃষ্ণরূপে নশ্বরদেহধারণ করিয়াছিলে। শুনিয়াছি, আবার তুমি নূতন সৃজন মানসে আপন প্রলয়কারী কল্কী মূর্ত্তিতে, দ্রুতগ তুরঙ্গপরে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে অবতীর্ণ হইয়া এই জীবরঙ্গ ভূমিতে আসিবে। সেই মহাপ্রলয় দিনে এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ আবার পঞ্চভূতে লীন হইবে, তখন হে একমেবাদ্বিতীয়ং—তোমার কণ্ঠোচ্চারিত জলদ-গম্ভীর "বম্" "বম্" শব্দ উত্থিত হইয়া সীমাশূন্য অনন্ত ব্যোমে লীন হইবে।

শ্রীক্ষীরোদনাথ চৌধুরী।

হৃদয়ে বরণ।

(কীর্ত্তন।)

হে অভীষ্ট দেবতা আমার!
মোরে দেখে প্রাণ কাঁদে, তাই বুঝি নানা ছাঁদে,
ঘুরে ফিরে ডাক অনিবার ॥
কত যে ডেকেছ মোরে, দিবানিশি সমাদরে,
সুপ্ত মন নাহি দিলে সাড়া।
কর্ম্মফল। কর্ম্মফল। বিধি বিধানে বিকল
তাই আজ হেন লক্ষ্মীছাড়া ॥
(যদি) ডাক্ শুনে ছুটে যাই, প্রাণ করে আই ঢাই,
লক্ষ্যহীন হইয়াছি মূলে।
নিজ বলে হবে নাত, দয়া ক'রে প্রাণনাথ,
শক্তি দাও যাই তব কূলে ॥
(ফেরতা।)
আজ নূতন করিয়া, শ্রবণে শকতি দিয়া,
স্বরগ জ্যোতিতে খুল আঁখি।
মধু ডাকটী শুনায়ে, দিব্য রূপটী দেখায়ে,
দাঁড়াতে হবে গো কল্পশাখি।
(আমি) হৃদে বরণ করিয়া রাখি ॥

সেবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কল্পতরু-উৎসব।

—:০:—

বিগত ১লা জানুয়ারী ১৭ই পৌষ, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তগণ সমস্ত দিন নাম কীর্ত্তনে বিভোর ছিলেন। ঐ দিন কটক-রামকৃষ্ণ-কুটীরেও মহা সমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। তথায় কবিতা ও সংগীত জনে জনে বিতরিত হয়। কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(কবিতা)

সুন্দর মৃগী নাচিছে কাননে
সুন্দর তার আঁখি,
সুন্দর তার চাহনি খানি গো
সুন্দর-রূপ-সাখী।
সুন্দর পাখী উড়িয়া বেড়ায়
সুন্দর গান তার,
সুন্দর তার উড়িবার ছটা
সুন্দর হেন কার?
সুন্দর ফল ধরেছে তরুতে
সুন্দর স্বাদ তার,
সুন্দর আহা দুলিছে তথায়
সুন্দর তরু-ভার।
সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠেছে
সুন্দর তার গন্ধ,
সুন্দর দুলে সমীর লহরে
সুন্দর মৃদু মন্দ।

সুন্দর নর বিভুর ধিয়ানে
সুন্দর নিজে রত,
সুন্দর গাহে তাঁহারি মহিমা
সুন্দর মাতে কত।
সুন্দর নারী রূপের লাবণ্য
সুন্দর তার গান,
সুন্দর তার মায়ের খেলাটি
সুন্দর তার প্রাণ।
সুন্দর এত রয়েছে তবুতো
সুন্দর সবে চায়,
সুন্দর সেই রামকৃষ্ণ লাগি
সুন্দর প্রাণ ধায়।
সুন্দর আজ কল্পতরু বেশ
সুন্দর রূপখানি,
সুন্দর হেন হেরিলে এ ভবে
সুন্দর (কি) আর গণি?

—০—

সান্ত্বনা।

কত ক'রে বুঝাই মনেরে!
বিদেশে সুখের লাগি,
বাঁধিয়াছ যেই ঘর,
হেম-সিংহদ্বারে তার,—উড়ায়েছ—
যে বিচিত্র বিজয় পতাকা—
অবিদ্যা তিমিরে ঢাকা এ সৃষ্টি রচনা,
বুকে করি রাখিয়াছ বিফল সাধনা।

কত ক'রে বুঝাই মনেরে!
সুখ শান্তি, পাগলের কথা—
মিলেনা হেথায় কভু।
রণবাদ্য বাজিছে চৌদিকে,
অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব কোলাহল,
তুমি বীর, বীর সজ্জা করহ গ্রহণ,
ভেবে দেখ কিছু নয় জনম মরণ।

কত ক'রে বুঝাই মনেরে!
ধন, জন, জীবন যৌবন,
অস্থির চঞ্চল এরা,
বিদায় সায়াহ্ন কালে, বিচ্ছেদের—
যাতনায় হইবে কাতর,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার ঘোরে তুমি অচেতন,
পথভ্রান্ত দিশাহারা পথিক যেমন।

কত ক'রে বুঝাই মনেরে!
রাজার দুলাল তুমি;
ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার তব
লুটিয়া নিয়াছে হায়! পুত্র মিত্র যারা,
তোমারে দিয়াছে ফাঁকি,
উঠ, জাগ, কর জীবন-সংগ্রাম,
তুমি দিব্যধামবাসী অমৃত সন্তান।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

নিঃস্বহিতৈষিণী সভা।

—•:•—

অনাথ আশ্রম।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই সভা ২৩ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলিকাতায়, স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় উদারচেতা পরদুঃখ-কাতর ধর্ম্মাত্মা মহোদয়গণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং সভ্য। সভার উদ্দেশ্য:—(১) পিতৃ মাতৃহীন বা অসহায় অভিভাবক শূন্য, নিঃস্ব বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা ও ভরণ পোষণের ব্যয় বহন করা এবং তাহাদের উন্নতি বিধানে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা, (২) ভদ্রবংশীয়া স্বামী পুত্রবিহীনা, সহায় সম্পত্তিশূন্যা বিধবাগণের ভরণপোষণ উপযোগী সাহায্য দান।

এই দুইটী উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বোধ হয়, সাধারণকে এখন আর বিশেষ ভাবে বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

উপস্থিত সভা ছয়টি বালককে কলিকাতায় রাখিয়া তাহাদের সকল প্রকার ব্যয় বহন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন; এবং এগারটী ভদ্রবংশীয়া অনাথা বিধবাকে চাউল, বস্ত্র, ও অর্থ সাহায্য দান করিতেছেন।

যাঁহারা পর-দুঃখ আপনার দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করেন, অনাথ-বালক ও অসহায় বিধবার দুঃখে যাঁহাদের চক্ষে জল আসে, তাঁহাদের সকরুণ হৃদয়ের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা এই সভায় যথাসাধ্য-সাহায্য করুন। সামর্থ্যানুযায়ী দান অল্প হইলেও উহা সাদরে গৃহীত হয়। সহস্র সহস্র জল-বিন্দু একত্রিত হইলে তাহা পরিণামে সিন্ধুতে পরিণত হয়।

নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় পত্রাদি ও সাহায্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

অবৈতনিক সম্পাদক,—নিঃস্বহিতৈষিণী সভা।
২৩ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
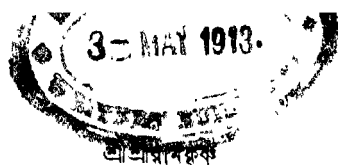
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

মাঘ, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, দশম সংখ্যা।

কল্পতরু সংগীত।

কে নিবিরে আয়!

সেই প্রেমময় আজ প্রেম বিলায়ে যায়।

দীন দুঃখী আতুরগণে ডাকে উভরায়॥

প্রভু ছল ছল আঁখি, প্রেমের অঞ্জন মাখি,

প্রেমে হাসে, প্রেমে ভাসে, প্রেমে ডুবে যায়॥

...র দেখে তারে বলে, "তোরা সবে আয় চলে,

আজ প্রেমধনে জনে জনে বিলাব ধরায়॥

বল শিব, কালী, কৃষ্ণ, হয় যেবা যার ইষ্ট,

প্রাণ খুলে নাম নিলে প্রেম উপজায়॥"

...নী-কাঞ্চনে মাতি, গেল চলি দিবা রাতি,

এলে শমন প্রাণঘাতী, কি বলিবি তায়॥

...য়া দুর্দ্দশা হরি, কল্পতরু-রূপ ধরি,

...রাভয় দিয়া সবে (আজ) প্রেমেতে মাতায়॥

...পীযূষ-পানে, ছুটে যত ভক্তগণে,

"জয় রামকৃষ্ণ" নামে, সবে নাচে গায়॥

অবতারবাদ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

অবতারবাদ লইয়া বহুকালাবধি মত ভেদ চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র অবতার সম্বন্ধে কত মীমাংসাই করিয়া গিয়াছেন, তাহা একত্র সন্নিবেশিত করিলে, অবতার কি ?—তাহার প্রয়োজন এবং কোন্ মহাজনই বা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। অবতার বলিলে, দেবতার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি বুঝায় না। কেহ কেহ বলিবেন, হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা আছেন, আবার আর একটী অবতার রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন কি ? সেই তেত্রিশ কোটীর ভিতর মনোমত একটী দেবতা বাছিয়া লইলে কি চলে না ? তাঁহাদের বুদ্ধি এবিষয়ে অনিশ্চয়াত্মিকামাত্র। অবতার একটী দেবতা বিশেষ নহে এবং তাঁহাদের অবতরণে দেবতার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে না। যে সমস্ত দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন, অবতার তাঁহাদেরই অন্তর্ভূত। হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্মই "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সেই এক হইতে বহুভাবই হিন্দুর ধর্ম্ম বিস্তার; এবং বহু হইতে একভাবই অদ্বৈতজ্ঞান। সুতরাং অবতার বলিতে গেলে, হিন্দুর দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নহে। যেমন নারায়ণের বিরাটমূর্ত্তি ও তাঁহার সূক্ষ্ম নিরাকার মূর্ত্তি; দুইই এক এবং একই দুই, কেবল ভাব সমাবেশ মাত্র। জগতে ভগবানের ভাব প্রকটিত করিবার জন্যই অবতারগণ সেই বিরাটমূর্ত্তির অংশে প্রকটভাবে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পূর্ণসত্ত্বা প্রকাশ করেন মাত্র। ভগবানের ইচ্ছামতে অবতারগণ অসংখ্যবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক দেশকাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। জগতে ধর্ম্ম চিরকালই সমভাবে জীব-হৃদয়ে প্রবাহিত। যখনই কোনও কারণে সেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদিচ্ছায় অবতার অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে ;—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

"হে দ্বিজাঃ! সত্ত্বস্য প্রাদুর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য হরেঃ অবতারাঃ হি অসংখ্যেয়াঃ, যথা অবদাসিনঃ উপক্ষয় শূন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ সহস্রশঃ কুল্যাঃ ক্ষুদ্রপ্রবাহাঃ নির্গচ্ছন্তি তথা।

যেমন কোন বৃহৎ ও অক্ষয় জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ

নির্গত হয়, তদ্রূপ হরি হইতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এখানে অবদাসিনঃ বাক্য প্রয়োগে প্রহ্লাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগত্রয়ে ভগবান আপনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ তিন যুগের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের পালন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই কলিযুগে এই সমস্ত কার্য্য প্রচ্ছন্নভাবে সমাধান করিতেছেন; অর্থাৎ এ যুগে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও কেহ অবতারকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তাই কলিযুগে রামকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গকে কেহ অবতার বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। শঙ্করকে স্বয়ং শঙ্কর জানিয়াও মোহবশতঃ তাঁহাকে অনেকে চিনিতে পারেন নাই।

প্রহ্লাদের কথার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা কহিয়াছেন তাহা কথিত হইল :—

> ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
> এবং রূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

হে কুরুপ্রবীর। ভক্তিব্যতিরেকে বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ দান এবং ক্রিয়া ও উগ্রতপস্যা সকল দ্বারা আমাকে এইরূপে তোমা ভিন্ন আর কেহ মনুষ্য লোকে দর্শন করিতে পারে না।

উক্ত বিষয়ের ভাব সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সাধু মহাজনদিগকে তাহাদের নিকটস্থ লোকেরা অথবা আত্মীয়েরা চিনিতে পারে না, যেমন লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে কিন্তু দূরে আলো পড়ে; এবং বজ্র বাঁটুলের বীচি গাছের তলায় পড়ে না, ছিট্‌কে দূরে পড়ে ও সেইখানে গাছ হয়।"

তাই শাস্ত্রের মীমাংসা ও অবতারের উপদেশ এক ভাবাপন্ন। অদ্যাপি কলিযুগে কেহ অবতারকে সহজে চিনিতে পারেন না।

কৌরবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য পরিদর্শন করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কেবল ভীষ্ম ও বিদুর মহতী ভক্তিবশতঃ ও তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিয়াছিলেন। জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম জানিয়াও মায়ামোহে সময়ে সময়ে ভুল করিয়া ফেলিতেন, এবং কখন কখন দিব্যচক্ষে তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া জানিতে পারিতেন। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম জানিয়াও ঘোর মায়ায়

মুগ্ধ হইয়া স্বীয় অন্তককে ব্রহ্মবোধে ভ্রম করিতেন, ইহাই তাঁহার কর্ম্মফল। শ্রীকৃষ্ণে অব্যাহতভাবে ব্রহ্মজ্ঞান আরোপিত থাকিলে, তাঁহার মৃত্যু ঘটে কোথায়?

পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সখাভাবে দেখিতেন ও সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিতেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা চিনিতে পারিয়া আপনার হৃদ্ভিতে আপনার করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহার পরামর্শ লইতেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করিয়া কোন কার্য্যই পাণ্ডবগণ কখন করেন নাই। কি আনন্দোৎসবে, কি ঘোর বিপদে, সখা ও ভগ্নতরীর নাবিকের ন্যায় পাণ্ডবেরা তাঁহার সাহায্য প্রার্থী ছিলেন। তজ্জন্য ভীষণ কুরুক্ষেত্র সমরে সমরবিজয়ী হইয়া সমগ্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারিয়াছিলেন, এবং রাজসূয়যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া প্রভূত বিত্ত অর্জ্জন করেন।

ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্র ঋষি, রামচন্দ্রকে স্বয়ং ব্রহ্ম জানিয়া রাক্ষস নিধনের জন্য পুণ্যশীল দশরথের নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক শ্রীরামচন্দ্রকে যাচঞা করিয়া রাক্ষস নিধন দ্বারা স্বীয় ও অপরাপর ঋষিগণের যজ্ঞবিঘ্ন নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে যুগে কেবলমাত্র ছয়জন ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণাবতার বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য ঋষিগণ যোগবলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও মোহবশতঃ বলিতেন "আমরা তোমাকে দশরথপুত্র বলিয়া জানি এবং সেই ভাবেই দেখিব।"

সেইরূপ প্রত্যেক অবতারের সমসাময়িক লোকের মধ্যে অতি অল্প লোকই অবতারগণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

শঙ্করের গভীর গবেষণা ও অদ্ভুত কার্য্যে মুগ্ধ হইয়াও অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। গৌরাঙ্গ যখন হরিপ্রেমে নদীয়া টলমল করাইয়া, সন্ন্যাসাবলম্বনে তীর্থ পর্য্যটনে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তাঁহাকে কয়জন অবতার বলিয়া জানিতে পারেন? এখনও অনেকেই ভ্রমান্ধকারেই ভ্রাম্যমান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি আত্মীয়, কি ভক্ত, কেহই জানিয়াও জানিতে পারেন নাই। মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া কুয়াষায় যেরূপ নিকটস্থ দ্রব্যের উপর দৃষ্টি অবরুদ্ধ থাকে, সেইরূপ তাঁহার মহতী ক্ষমতা দর্শনে ও শাস্ত্রের কূট মীমাংসা সহজে প্রতিপন্ন করিতে দেখিয়াও, তাঁহাকে সে সময়ে অনেকে জানিতে পারেন নাই। তবে তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া ধরা দিয়াছেন ও যাঁহার চির-পোষিত মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে **পরব্রহ্ম বা স্বয়ং মা**

ভবতারিণী বলিয়া জানিতে পারিয়া আপনার জীবজন্ম সার্থক করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সে সৌভাগ্য বিরল। স্বগ্রামবাসী বা যাহাদের সহিত একত্র সহবাস করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা দূরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অগ্রে চিনিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন। পরমভক্ত মথুর তাঁহাকে চিনিতেন; কিন্তু মানবসুলভ স্বার্থের ব্যাঘাত ভয়ে প্রচার না করিয়া অতি গোপনে তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেন। জ্ঞানী ও ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাকে জানিতে পারিয়াও সময়ে ভ্রম করিয়া ফেলিতেন।

ধর্ম্মগ্লানি নিবারকরণের জন্য যে অবতারগণ ধরণীতে অবতীর্ণ হন, সেইমত পোষণ করিবার জন্য গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন;—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।"

হে ভারত, যখনই ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি আপনাকে প্রকট করি।

আবার অন্য স্থানে বলিয়াছেন:—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুরাচারদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

ঐ মত সমর্থন করিবার জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের উপদেশ শ্রবণ করুন।

"তোদের জন্যই আমার আসা; আবার একবার আমায় আসতে হবে।"

এই সাদা কথার অর্থ অতীব গূঢ়। "তোদের জন্য আমার আসা" অর্থাৎ কলিজীব বিষম পাপে মগ্ন। মুক্তির উপায় অসংখ্য; তাহা বাছিয়া লইতে গেলে, এই কলির জীবের পরমায়ুতে কুলায় না, তাই সুপথ প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার আগমন।

কোথায় সুদূর জাহানাবাদস্থ আরামবাগ মহকুমা, আর কোথায় কলিকাতা। আবার ঠাকুরের প্রধান আড্ডাই বাগবাজার। কলিকাতার মধ্যে বাগবাজার নেশায়, বাবুগিরীতে ও বিলাসিতাতে বিখ্যাত। ঠাকুর আমাদের সেই বাগবাজারের আড্ডাধারী হইয়া ভগবৎ-প্রেম বিলাইয়া কতই জগাই মাধাই উদ্ধারিলেন। হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে অনবরত হরিনামের রোল উঠাইলেন।

বিলাসী ও মাদকোন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত যুবকের চঞ্চলচিত্তের ঘোরান্ধকার সচ্চিদানন্দের বিমল কিরণে অনন্তকালের জন্য আলোকিত করিয়া দিলেন। হাবভাবসম্পন্না বারনারীর চেলাঞ্চলকটাক্ষ যাহাদের ইহজীবনের আলোক স্বরূপ; পর-রমণীর মধুরালাপ যাহাদের চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপায়; পুরযোষিদ্‌বৃন্দের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিরেখা, যাহাদের পক্ষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ স্বরূপ ছিল, তাহারা তোমারই অমৃতময়ী পরশে সর্ব্বপাপ বিধৌত হইয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিয়া, আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় বিবেচনায়, তোমারই পদপ্রান্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সত্যযুগে দেব ও দৈত্য উভয় শ্রেণীই ভগবদ্ভক্ত ছিল। কেবল দৈত্যগণ অসূয়াপরবশ থাকায় দেবদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই ধর্ম্মগ্লানি সঞ্জাত হয়, এবং ভগবান স্বহস্তে সেই সেই প্রবল দৈত্যাসুর বধ করিয়া চিরশান্তি সংস্থাপন করেন।

ত্রেতাযুগে যজ্ঞবিঘ্নকর রাক্ষসদল সমুদ্‌ভূত হইয়া ঋষিগণের যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রয়াসী হইলে রামরূপে সেই সেই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া জগতে ঋষিপ্রণোদিত ধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া অপ্রতিহতভাবে রক্ষা করেন। সেই বিমল ত্রেতাযুগে জগতে অধর্ম্মাধিকার একপাদ মাত্র ছিল।

দ্বাপরে দুইপাদ অধর্ম্মাধিকারে ধরা ভারাক্রান্ত হইলে ভূভার হরণের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের ভীষণ রণানল প্রজ্বলিত করিয়া রণোন্মত্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়েন ও পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপন করেন।

প্রথম যুগে প্রেমা বৃদ্ধি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে ভীষণ রণোন্মাদে প্রজা ক্ষয় দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে দেখা যায়। চতুর্থ অর্থাৎ কলিযুগে রাজা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী, প্রজাগণ উন্মার্গপ্রথিত, সুতরাং ধর্ম্মবিপর্য্যস্ত, লোকসমূহ বিপথগামী, সত্যপরাভূত, বেদবিহিত কর্ম্ম সমুদয় সুদূরপরাহত। সত্যযুগে দেবতা সাক্ষাৎকার হইতেন; ত্রেতা ও দ্বাপরে মানবের অন্তরে দেবতা ধ্যান মাত্রেই উপলব্ধিত হইতেন; কিন্তু কলিতে দেবতার নাম মাত্র অবস্থিত। মুক্তির রাজ্য পরাভূত, বিদ্বেষ ও অসূয়া অন্তরে অন্তরে প্রজ্বলিত। সত্যযুগে তপস্যা লইয়া ধর্ম্ম; ত্রেতা ও দ্বাপরে কর্ম্ম লইয়া ধর্ম্ম, এবং কলিযুগে ভাব লইয়া ধর্ম্ম। এখন মনের পাপ—পাপ নহে, পাপ-কার্য্যে পাপ সঞ্জাত হয়। প্রবল কলিযুগ ভাবের রাজ্য—ঐ যুগে প্রতিপাদ বিক্ষেপেই ঘোর পাপ সঞ্জাত হয়; সেই বিষম ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই অবতারগণকে এত ঘন ঘন অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়।

হিমাচল প্রভৃতি মহোচ্চ গিরিকন্দর হইতে অসংখ্য অসংখ্য নদী সমুৎপন্ন হইয়া স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করতঃ সাগরে সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু পূততোয়া গঙ্গাই একমাত্র জীব-কলুষ-নাশিনী। প্রতিমুহূর্ত্তে শত শত জীব মাতৃকুক্ষি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ধরণীতে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু কয়জন পূর্ণদীপ্তিতে দীপ্যমান? কয়জন পূর্ণ সত্যের অবতার! কয়জন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য বিবর্জ্জিত? কয়জনের হৃদয় পরদুঃখে কাতর? জীব ক্লেশে কয়জন দহ্যমান? জীব-মুক্তির জন্য কয়জনকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া উন্মত্তের ন্যায় জগতে ভ্রাম্যমাণ হইতে দেখা যায়? কয়জনের জীবাত্মা সতত পরমাত্মায় সংলীন? জগতের কোলাহল হইতে কয়জন চিরশান্তিময়ের সহিত সংমিলিত হইতে পারে? কে সতত ভগবদ্ভাবে বিভোর? ভগবৎ নাম মাত্রে কে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে? সাধারণ মানব পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, কেবল উৎকর্ষবলে ইন্দ্রিয়গণকে সবলে রাখিতে শিখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক প্রাবল্য ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। যে বিজ্ঞানবিৎ পঞ্চভূতের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদের প্রকৃতি অবগত হইয়াছেন, তিনিও উহাদের স্বাভাবিক বিকৃতিভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। যিনি সন্তরণ শিক্ষা দ্বারা মহোদধি পারেও সুপটু, তিনি বীচিমালা-বিক্ষোভিত প্রবলবাত্যা-বিচালিত উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে নিপতিত হইলে, আপনাকে সকল সময়ে রক্ষা করিতে অসমর্থ।

যখন প্রবল প্রলয় সমুপস্থিত হয়, তখন জীব, জন্তু, সাধক, মহাপুরুষ, সকলেই পঞ্চভূতের বিক্ষোভে জীবন হারাইয়া ফেলেন। তখন একমাত্র পঞ্চভূতের নিয়ন্তাই কেবল সেই বিক্ষোভ অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। তাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভে কি সাধু, কি মহাপুরুষ, কি পাপী, কি মহাজন সকলেই বিধ্বস্ত ও পরাভূত হন। তাই বলি, এই ইন্দ্রিয়-ব্যভিচার কালে, কাম কাঞ্চনের প্রবল কুহক হইতে কে আপনাকে উচ্চে রাখিতে পারিয়াছে, কেহ কি বলিতে পারেন?

পৃথিবী ও জীব জন্তু তরু-গুল্মাদি পঞ্চ-মহাভূতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেহী মাত্রেই সেই পঞ্চমহাভূতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ভূতের পৃথক্ পৃথক্ গুণ আছে; ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত প্রত্যেকে স্বীয় গুণবিশিষ্ট। ক্ষিতি বা ভূমি; শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট। অপ্ বা জল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণবিশিষ্ট। তেজঃ বা অগ্নি;

শব্দ স্পর্শ ও রস এই ত্রিবিধ গুণবিশিষ্ট এবং মরুৎ বা বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ এই দ্বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ, কেবলমাত্র শব্দগুণবিশিষ্ট। অতএব এই পঞ্চ-মহাভূত পঞ্চদশ গুণবিশিষ্ট।

প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম যে ইহারা কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, সকলেই পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া থাকে, পরন্তু যখন চরাচর ভূতবর্গ বিষম ভাব আচরণ করে, তখন কালানুসারে দেহী—এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করে। জীব সকল আনুবর্ত্তীক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যে যে পদার্থদ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তৎসমুদায়েতেই পাঞ্চভৌতিক ধাতু সকল দৃশ্যমান হয়। শব্দাদি পঞ্চগুণ ব্যতীত ষষ্ঠগুণের নাম চেতনা, যাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সপ্তম গুণের নাম বুদ্ধি, অষ্টম অহঙ্কার, পঞ্চইন্দ্রিয়, আত্মা, সত্ত্ব রজঃ ও তম সমুদায়ে এই সপ্তদশসংখ্যক রাশি অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

এই সপ্তদশ এবং বুদ্ধি গুহা বিলীন ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চ, বোদ্ধব্য ও মন্তব্য সমুদায়ে এই চতুর্বিংশতি সংখ্যক ব্যক্তাব্যক্তময় গুণ।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব সর্ব্বথা অজেয়, ইহাই মহাভূতাত্মক ব্রহ্ম, এবং এই বিশ্ব যখন সক্রিয় তখনই মহতী প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি।

যতকাল দেহী উক্ত শব্দাদি বিষয় সকলের মধ্যে স্বীয় স্বীয় বিষয়ের গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীতকরতঃ তপশ্চরণ অর্থাৎ আত্মালোচনা করিতে থাকেন, তখন তিনি লোকমধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে লোক সমস্ত পরিব্যাপ্ত দেখেন, কিন্তু জীব আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইলেও যদি প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে আত্মায় মায়া-বিজড়িত অবস্থা হেতু কেবল ভূত সমস্তই দেখেন। অর্থাৎ সাধক বা মহাজন, মায়া বা আদ্যাশক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া, আবার জগতে থাকিতে পারেন না। কিন্তু এখানে দেখা যায়, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াও লোকশিক্ষার্থে দেহধারী হইয়া জীবিত ছিলেন। ঐরূপ অবস্থা সাধকের নহে, তাহা কেবল অবতারেই সম্ভব।' তাই বলি,—

ঠাকুর আমাদের অবতার।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়।

হেলাতে কি মেলে রতন?

যত গণা দিনের অবসান হইয়া আসিতেছে, যতই বুঝিতেছি,—বৃথা কাজে, রঙ্গরসে অনেকদিন কাটিয়া গেল; যতই জ্ঞান আসিতেছে—জীবনের কতকাল বহিয়া গেল; যেন অন্তরে অন্তরে কি যেন কাহার মধুর-স্মৃতি জাগিতেছে। তাই প্রশ্ন আসিতেছে—এমন মানবজন্ম পাইয়া দেহে প্রাণধারণ করিয়া, প্রাণনাথের চিন্তা আসিল কৈ? কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া কত যোনি ভ্রমণ করতঃ এমন দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিলাম। এ হেন আনন্দময় মধুময় জন্ম লাভ করিয়া উদ্দেশ্য ঠিক্ আজও হইল না। এই মহা অর্থপূর্ণ মানবজন্ম লাভ করিতে, এমন কি দেবতারাও কামনা করিয়া থাকেন। ভাগবৎ একথার স্পষ্টই প্রমাণ দিয়াছেন:—

স্বর্গিণোপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িনস্তথা। (১১ স্কন্ধ, ২০ অঃ ১২।)

এ হেন জন্ম আমরা বিফলে কাটাইতে বসিয়াছি? এই জন্মে আমরা আত্মার উন্নতিসাধন করিব, এইটী ভগবানের ইচ্ছা। এই উন্নতিসাধনে উত্তরোত্তর উত্তমগতি প্রাপ্ত হইব কোথায়, না বিপরীত বুদ্ধি আমাদিগকে উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট করিতেছে। দিবারাত্র সংসার চিন্তায়, অনিত্য সুখ চিন্তায় কাল অতিবাহিত করিয়া; পুনরায় নীচ-যোনি ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব, এখন সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। আত্মার উন্নতি যাহাতে করিতে পারি, সে চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এই—এই মনুষ্য জন্মে যেমন যেমন কার্য্য করিয়া যাইব, সেই সেই মত ভবিষ্যৎ জন্মের জন্য যাতনা বা সুখ-সম্ভোগ সঞ্চিত হইবে। আত্মার উন্নতিসাধনই এই জন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য। একারণ ভাগবৎও বলিতেছেন:—

"লব্ধাসুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদ মনিত্য মপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবনিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

(একাদশ স্কন্ধে ৯অঃ, ২৯।)

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর এই সুদুর্লভ অনিত্য (কিন্তু) অর্থদ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ নিজ মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবে, কারণ বিষয় ভোগ ত সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হইতে পারে।

এই মধুময় মনুষ্য-জীবন নিজেদের কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমরাই বিষময় করিয়া তুলিতেছি। সৎচিন্তা যদি একমাত্র উপায় ভাবিয়া জীবন-ভোর লক্ষ্য

স্থির রাখিয়া যাইতে পারি, মৃত্যুকালেও ঐ সৎচিন্তা মানসপটে জাগিবে ও দেহ ত্যাগের সময় প্রাণপতি, আত্মার সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তরে এই চিন্তাই জাগাইয়া তুলিবেন ও ক্রমশ উৎকর্ষের দ্বারা অবশেষে জন্ম হইতে জন্মান্তর কাটাইয়া আর মনুষ্য জন্ম লইতে হইবে না। ঐ শুন শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"যং যং চাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥"

(পঞ্চদশী ধ্যানদীপঃ ১৩৭।)

আত্মার উন্নতিসাধন করিতে অগ্রসর হইলে এক্ষণে প্রয়োজন কি? সাধনা। কথাটী নূতন নহে। চিরদিন এই একই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। তবে মাঝে মাঝে টহলদারের মত দ্বারে দ্বারে আবৃত্তি করিয়া বেড়াইলে, আমাদের নিদ্রাভিভূত মনকে জাগাইয়া তুলিতে পারি। এই সাধনার প্রথম প্রয়োজন বৈরাগ্য সাধন। এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ লইয়া উহার সাজপাটে ব্যস্ত থাকিয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিলে আর চলিবে না। ডাক আসিয়াছে—আমাদের উঠিতে হইবে—মোহ নিদ্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া অলস শয্যায় শুইয়া, যাই যাই করিয়া আড়মোড়া খাইলে আর চলিবে না। শুধু আহার নিদ্রায় জীবন কাটাইলে কি আর চলিবে? আহার নিদ্রা ত সকল প্রাণীরই স্বভাবগত ধর্ম্ম। অতএব পশু, পক্ষীও উক্ত ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে। পশুতে এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীতে ও মনুষ্যে তবে পার্থক্য কি? "চিত্তানুশাসনে" দৃষ্ট হয় :—

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মে হন্তি কিং গ্রামে পশবেঽপরে॥

অর্থাৎ কেবল জীবনধারণ করা মনুষ্যের আয়ুর ফল নহে, তজ্জন্য কহিতেছেন যে, তরু সকল কি জীবনধারণ করে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস পরিত্যাগ করে না? অন্যান্য পশুতে কি খায় না? তাহারা কি স্ত্রীসঙ্গ করে না? ইহা দ্বারা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে যে, ভগবৎ আলোচনাশূন্য মনুষ্যজীবন পশুর জীবন, অর্থাৎ ভগবানের নাম গান সাধনাশূন্য হইয়া, নরাকারে পশুনাম ধারণ করিতেছি—আমরাই। প্রকৃতপক্ষে এই দেহটাতে এত আত্মবোধ আসিয়াছে যে, দেহটাই "আমি" বা সার বলিয়া ধরিয়াছি। একটু মৃত্যুচিন্তা লইয়া কিছুক্ষণ আমরা অতিবাহিত করিলে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও এই স্থূল-দেহটা যে এত আরাধনার বস্তু নহে, বেশ বুঝিতে পারি। পূজনীয় কবি তাই সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেছেন :—

"এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই ;
এতে ভাল জিনিষ একটু নাই।
পদ্ম চক্ষু, নাসা তিলের ফুল ;
কুন্দ-দন্ত, বিম্ব-অধর, মেঘের মতন চুল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা উরু,
রং সোণা, কও আর কি চাই ?
(এটা ত) অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ ?
এটা পুঁতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে,
(না হয়) অগ্নি ফেলে দেয়রে ভাই।
(এর আবার) দু'টা একটা নয় ত সরঞ্জাম ;
মোজা, জুতা, চসমা, সাবান, কত বলবো নাম ?
প্রয়োজনের নাইক সীমা, জুটলো অসংখ্য বালাই !
কান্ত বলে, একটুখানি ভাব,—
এই মিছের জন্যে সত্যি গেল, এইত হলো লাভ !
সার যেটা তার সার ভাবনা, সার ভাব এই শরীরটাই !"

—রজনীকান্ত।

এই পৃথিবীতে যে কোন কার্য্য করিতে যাইনা কেন, বিনা কষ্টে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি না। আর বিবেক বৈরাগ্য সাধন দ্বারা যে মহাতত্ত্ব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব আসিবে, সেটী কি কেবল বিনা কষ্টে আমরা লাভ করিব ? একারণ কতদিন হইতে ধর্ম্ম-শিথিল হিন্দুকে আমাদের মহাপুরুষগণ উচ্চৈস্বরে কেবল বলিতেছেন—আলোকে যাইবে ত বৈরাগ্য চাই—মুক্ত হইবে ত সাধনা চাই। অতএব এই অমূল্য মনুষ্যজন্মের প্রথম সাধনাই—বৈরাগ্য সাধন। বৈরাগ্যসাধন বলিতে আমরা মরকট-বৈরাগ্য-ভাব ধারণ বুঝিব না। ভেকধারণ করিয়া বড় বড় কেশ রাখিলে বৈরাগ্যসাধন হইল, তাহা কথনই নহে। উক্ত চিহ্নধারণ করিয়া গৈরিকবসন যদি পরিধান করি—যাঁর জন্য এতটী নিশানা করা—যদি তিনিই জীবনের একমাত্র চিন্তার ও সাধনার কারণ না হইলেন—তবে সে লোক-দেখান বৈরাগ্য—বৈরাগ্যের বাহ্যিক চিহ্নমাত্র ধারণ। আর ইহাই হইল, মরকট-বৈরাগ্য। ঠিক ঠিক বলিতে বুঝিব—এই স্থূল দেহ যাহাকে আমরা এত আপনার বলিয়া বুঝি-

য়াছি, সেটী হ'ল হাড়মাসের পিঞ্জরমাত্র—ইহা প্রকৃত 'আমি' নহে। ইহা একটী আবরণ মাত্র। মন্দির ও তদভ্যন্তরস্থিত বিগ্রহমূর্ত্তির সহিত যেমন পরস্পর সম্বন্ধ, তদ্রূপ দেহ ও আত্মার সহিত সম্বন্ধ। ভগবান যেমন সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বস্থানে উপস্থিত অথচ মন্দিরেও আছেন, সেইরূপ আত্মা বা পরমাত্মা উর্দ্ধে নীচে অন্তর্মধ্যস্থায়ী এবং দেহরূপ হাড়মাসের খাঁচাতেও বর্ত্তমান। অতএব এই দেহটীকে 'আমি' বলিয়া ভ্রম না করিয়া, দেবতার মন্দির বলিলে ঠিক সঙ্গত হইল। এ কারণ দেবতার মন্দির-জ্ঞানে দেহটীকে যত্ন ও শ্রদ্ধার জিনিষ বলিয়া ধারণা রাখিতে হইবে। তাই কবি বলিতেছেন :—

"হেন অবসরে।
কেমনে ঘুমাল জীব,
ভুলি জ্ঞানময় শিব,
মানস-মুকুরখানি মলামাখা ক'রে।
(তাই) হেরি দেহ আপনার,
ভাবে রূপ (এ) আমার,
স্বরূপ লুকায়ে 'আমি' আছে অন্তঃপুরে ;
আনন্দে ভাসিবে জ্ঞানে, মলা গেলে সরে'—
দর্পণের পরে।"

এক্ষণে এই দেহটী আপনার বস্তু নহে—কেবলমাত্র শ্রীহরি আপনার ও নিত্য, আর সকলই অনিত্য। এই যেখানে আসিয়াছি, ইহা চিরদিনের বাসস্থান নহে—শীঘ্রই আপন দেশে ফিরিতে হইবে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আত্মাই একমাত্র 'আমি'—এই জ্ঞানই বৈরাগ্যপূর্ণ জ্ঞান। এ জ্ঞান্ না আসিলে দেহকে 'আমি' ভ্রমে শোক, তাপ, জ্বালার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইব ও এই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া জন্মান্তরে পুনরায় ভুগিবার সূচনা করিয়া রাখিব। এই যে দেহকে 'আমি,' 'আমি' করিয়া এত মহামায়ার সৃষ্টি করিতেছি, এত ভাগ বিভাগ, ঝগড়া, জ্বালা, যন্ত্রণার আয়োজন করিতেছি, দিবানিশি—উহার অন্তরালে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সাধনার দ্বারায় দেখিতে পারিলে, কবির সঙ্গে আমরাও একদিন বলিতে সক্ষম হইব :—

"দেখরে সাধনে—
"বিরাজিত ব্রহ্ম সনাতন॥

হৃদ্‌পদ্ম শয্যাপরে, দীপ্তিমান জ্ঞান করে,

খুলিতেছে এ অন্ধ নয়ন।

পঞ্চকোষ মাঝে এইটী চরম,

জ্যোতির্ম্ময় হৃদে বিদ্যুতের সম,

'হিরণ্ময়' বলি, কতযুগ আগে ঋষিতে করিল গান।

ব্রহ্মই নিষ্কল দিবানিশি যথায় নিত্য বিরাজমান॥"

ভগবানের কৃপা হইলে কবির সুরে তান মিলাইয়া উপলব্ধির দ্বারা গাহিতে সক্ষম হইব :—

"এই ব্রহ্মপুরে

বিরাজিত অন্তর আকাশ।

শঙ্কর বলেন যায়, একদীপ্ত ব্রহ্ম ভায়

স্বর্গ, মর্ত্ত, অগ্নি, চন্দ্রভাস্—

নক্ষত্র নিকর, প্রভা বিদ্যুতের,

পেয়েছে তাঁহাতে আশ্রয় যাদের ;

যা কিছু আছে, যা কিছু নাই, সকলের তাঁহাতে আবাস,

সেই জ্ঞানময় নিখিল কারণ, এই বিশ্ব যাঁহার আভাস।"

এক্ষণে এই "আমি" প্রশ্ন,—অর্থাৎ 'আমি কে ?' 'কেন আমি কর্ম্ম করিব ?' এবং "কিরূপে কর্ম্ম করিব ?"

"দিনচর্য্যাতে" গ্রন্থকার সবলভাবে বৈরাগ্য সাধনার সহায় উদ্দেশে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সাধারণের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) আমি কে ? (আমাদের এই) আমি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দ-নিলয় অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ অব্যক্ত পরমাত্মার অংশ বিশেষ। পরমাত্মা বিভু, তিনি নিজ মহিমায় মহিমান্বিত ; আমি দুর্ব্বল, শোক-মোহে মুহ্যমান ক্ষুদ্র জীব ; তথাপি তাঁহারই মহিমা আমাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। শরীর আমি নহি, শরীর আমার একটা আবরণ মাত্র ; শরীরের সুখ, দুঃখ, আমার আত্মাকে স্পর্শ করে না ; সংসার আমার চিরন্তন গৃহ নহে, ইহা আমার কর্ম্মক্ষেত্র। আমার গৃহ পরমাত্মায়, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(২) 'কেন আমি কর্ম্ম করিব ? * * * সেই—অপাপবিদ্ধ শুদ্ধধামে, ভগবৎ পদলাঞ্ছিত জ্যোতির্ম্ময়-লোকে আমাকে ফি[illegible]

হইবে। কিন্তু আমার ইহজীবনের শুভাশুভ কর্ম্মই আমাকে ত্বরায় বা বিলম্বে তথায় লইয়া যাইবে। সুতরাং পরোপকারাদি শুভকর্ম্মের দ্বারা আমাদের নিজেরই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। শুভ ও পুণ্যকর্ম্ম আমাদের বুদ্ধিকে পরমার্জ্জিত করে, হৃদয়কে প্রশস্ত করে; তাহাতেই আমরা ব্রহ্মের শুভ্র দিব্য-জ্যোতির সন্ধান পাই এবং এই কর্ম্মদ্বারাই আমরা জন্ম-জন্মার্জ্জিত সংস্কার সকল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই। এই আনন্দই আমাদের মুক্তি।

(৩) **কিরূপে কর্ম্ম করিব?** প্রবাহবৎ কর্ম্ম করিয়া যাইব। লক্ষ্য থাকিবে—পরমাত্মাকে লাভ করা, তাঁহাতে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া চলিব। কর্ম্মের সুখ, দুঃখ, যেন আমার চিত্তকে হৃষ্ট বা ব্যথিত না করে। কর্ম্মের কোন বিপাকই যেন আমার চিত্তের শান্তিকে চঞ্চল না করে। নিজের সুখ বা আরাম চাহিব না, যেখানে তাঁহার আহ্বান, সেইখানেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিব। বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিব। তিনি আমার জন্য যাহা বিধান করিবেন, তাহা সুখকর হউক বা কঠোর হউক, প্রসন্নমুখে তাহার অভিনন্দন করিব। এই বিশ্ববাসী সমস্ত জীবই যে তাঁহার সন্তান, এই বোধে সকলের সহিত মৈত্রীভাব রাখিব। নিজের জন্য ভাবিব না।

এই যে আত্ম ও অনাত্ম স্থির করিবার একমাত্র উপায় বৈরাগ্য সাধন,—এই সাধনই আমাদের উত্তরোত্তর অগ্রসর করাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। সাধনপথে এই সর্ব্বপ্রাথমিক সাধনাই একমাত্র অটুট সুবর্ণ ভিত্তিস্বরূপ—পতনের আশঙ্কা সহজে নাই। এই সাধনাই আমাদের এখন একমাত্র ভরসা। মহর্ষিগণ বহুদিন হইতে এই বৈরাগ্য-অনল ধরাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের এ জমাট্-ঘুম সহজে ভাঙ্গিবার নহে—কঠিন শাস্তির স্বরূপ এই আরামলোলুপ দেহকে ঠিক্ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণ সংযম ভাব ধারণ করিবে। দেহেতে আত্মবোধই আমাদের একমাত্র এ সাধনপথের অন্তরায় ও সর্ব্বনাশের কারণ। এই বৈরাগ্য জ্ঞানই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব ভাবে জাগরিত করিতে উদ্দীপনা দান করে। এ কারণ—আরম্ভ হইতে এই অমোঘ-অস্ত্র বৈরাগ্য সাধন সহায় করিয়া, শ্রীহরির নাম লইয়া সাধনার জলে ঝাঁপ দিতে হইবে।

এমন মানব জনম পাইয়া জিহ্বায় 'মধুর নাম দিবানিশি উচ্চারণ করিতে পারিলাম না—কর্ণকুহর সেই চিদ্ঘন সত্যসুন্দরের গুণগানে পূর্ণ করিতে

পারিলাম না, বৃথাই জন্ম আমাদের। এ কারণ কবি আমাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম——
পরমেশ পূজা যেই
না করে কথন
হায়! না করে কথন।

* * * * * *

বৃথাহি জনম তার
বৃথাহি জনম——
পর দুঃখে নাহি যার
অশ্রু বিসর্জ্জন
হায়! অশ্রু বিসর্জ্জন।

* * * * * *

বৃথা হি জনম তার
বৃথাহি জনম——
যেই কভু নাহি করে
রিপুর সংযম
হায়! রিপুর সংযম।

* * * * *

"চিত্তানুশাসনে" অন্য স্থলে দৃষ্ট হয় :—

"বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সুত ন যোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥"

অর্থাৎ হে সুত! যে ব্যক্তির কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে, তাহার দুইটী কর্ণছিদ্র বৃথা দুইটী ছিদ্র মাত্র, আর যাহার জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গাথা না গান করে, তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেক জিহ্বার ন্যায়।

"ভার পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেৎ মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চনকাঞ্চনৌ বা॥"

অর্থাৎ যে মস্তক পট্টকিরীট দ্বারা শোভিত হইয়াও মুকুন্দকে নমস্কার না

করে, তাহা কেবল ভারমাত্র, আর যে হস্ত শ্রীকৃষ্ণের সপর্য্যা না করে, তাহা কাঞ্চন ও কাঞ্চন দ্বারা শোভিত হইলেও মৃত ব্যক্তির করের তুল্য।

পুনশ্চ :—

"জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেনুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধম্॥"

অর্থাৎ যে মনুষ্য কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শবের মত, আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্ন তুলসীর গন্ধ লইয়া না আনন্দলাভ করিয়াছে, সে যদিও শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও মৃত শরীর তুল্য।

ভগবান আরও বলিতেছেন :—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈ হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারোনেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ॥"

অর্থাৎ হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে, ও বিকার হইলেও যদি চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, সে পাষাণ তুল্য কঠিন।

উপরোক্ত দেব-বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আমরা কোথায় মোহের কোলে নিদ্রা যাইতেছি। জাগিবার সময় আসিলেও উঠিতেছি না। হে ভগবান! আমাদিগকে, বৈরাগ্য-সাধনার সূচনা করিয়া দাও। আমরা যেন সংসাররূপ রাঙাফলে ভুলিয়া আর তোমার কথা ভুলিয়া না থাকি। আমাদিগকে বৈরাগ্য ভিক্ষা দান কর। আর কতকাল মায়ার মোহন জালে আবদ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকিব। আর কতদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকিব—

"কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে;—
(তব) শান্তি-সৌধ-মঙ্গল-কেতু,—আর দেখিনে,—
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ-প্রবাস-যামিনী, আমারে ডুবায়ে রাখিল তিমিরে;
(আর) প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিলনা মিহিরে হে;—
কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি,
কোথা আসিয়াছি,

(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া ;
(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি,
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে ;
যদি, জাগিতেছ, প্রভু, দেখিতেছ,—
তবে ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া ॥

—রজনীকান্ত।

নিম্নলিখিত মহাবাণী বিবেক-বৈরাগ্য সাধনায় সহায়-স্বরূপ বিবেচনায় আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম—

১। দেহই আমি, অথবা দেহ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু আমি ? মৃত দেহ আমিও বলেনা এবং কোন কার্য্য করেনা। তবে কি প্রকারে বলিব দেহই আমি ?

২। অনাত্মা শরীরের সঙ্গে অশরীর আত্মার এরূপ ঘনিষ্ট যোগ যে, সেই অনাত্মা শরীরে আত্মবোধ হইতেছে। সেই অনাত্মায় আত্মজ্ঞান নিবন্ধন এরূপ অজ্ঞানে থাকিতে হইয়াছে। অনাত্মাকে আত্মবোধ করা কত বড় অজ্ঞান। আত্মা ব্যতীত সমস্তই অনাত্মার নানা অংশ।

৩। অস্থি, মাংস, শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি এই জড় দেহ। ঐ সকল ব্যতীত উহা আর একটা কিছু নহে। দশেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহ। ঐ সকল ব্যতীত সূক্ষ্মদেহ অপর আর একটা কিছু নহে। জড়দেহে অস্থি মাংস প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম মন প্রভৃতি।

৪। তোমার অনেক সন্তান সন্ততি ছিল। এখন তাহাদের কেহই নাই। তাহাদের সকলেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। এখন তাহাদের একবার দেখিবারও উপায় নাই। তাহাদের প্রতি তোমার বিশেষ স্নেহ মমতা থাকায়, তাহাদের অভাবে তোমার বিশেষ মনোকষ্ট ও দারুণ শোক বোধ হইতেছে। তবে আবার অন্যের সন্তান সন্ততির প্রতি যে সকল কার্য্য করিলে স্নেহ মমতা হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কার্য্য কর কেন ? বারে বারে স্নেহ মমতায় এত শোক, দুঃখ পাইয়াও অন্যের সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা করিয়া অভিনব শোক দুঃখের বীজ রপন করিতেছ কেন ?

৫। বিবেক থেকে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। বিবেক, বৈরাগ্য-প্রসবিনী। অধিক বিবেক যাহার, তাঁহার অধিক বৈরাগ্য। অল্প যাহার, তাঁহার অল্প।

৬। তোমাকে যে অধিক যত্ন করে, তোমাকে যে অধিক স্নেহ করে,

তোমার প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ আছে, সে তোমার পরম শত্রু। তোমার প্রতি তাহার স্নেহ যত্ন অনুরাগে, তোমারও তাহার প্রতি স্নেহ যত্ন অনুরাগ হইতে পারে। তাহার প্রতি তোমার স্নেহ অনুরাগ যত্ন হইলেই তুমি বদ্ধ হইবে। তাহার প্রতি তোমার স্নেহ যত্ন অনুরাগ হইলেই ভগবানের প্রতি তোমার যে স্নেহ যত্ন অনুরাগ আছে, তাহা কমিবে।

৭। প্রবল ঝটিকার সময়, তটে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ নদীতে বহু আরোহীর সহিত বহু নৌকা জলমগ্ন হইতে দেখিলে, তাহার নৌকাতে আরোহণ করা উচিত নহে। ভব সমুদ্রে অনেক তরঙ্গ। সংসার তরীতে নির্ভর করিয়া মন! আরোহী হইওনা। ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া এই ভবসমুদ্রে অনেক মনরূপ আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে। দেখ, ঐ এখনও পর্য্যন্ত অনেকে হাবুডুবু খাইতেছে; দেখ ঐ অনেকে তলিয়ে গেল। মন সাবধান! তুমি যেন বিপদগ্রস্ত হইওনা।

৮। নিজ দেহে পর্য্যন্ত যাঁহার মমতা নাই, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। বৈরাগীর কোন বন্ধন নাই। কিঞ্চিৎ মমতা থাকিতে পূর্ণ বৈরাগী হওয়া যায় না। বৈরাগীর সমস্তই তুচ্ছ হইয়াছে।

৯। একেবারে মমতাশূন্য যিনি হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। মমতা যাঁহার নাই, তাঁহার কোন বস্তুতে কিম্বা কোন বিষয়ে অনুরাগ নাই। মমতা হইতে শোক, দুঃখ, এবং মোহ আসে।

এস ভাই, এস ভগ্নি! যেখানে যে আছো, সত্যপথ তাকাইয়া আমরা অলসতা ত্যাগ করি। বৃথা বাক্যব্যয়ে আর চলিবে না। ধর্ম্মকে আর ভাসা ভাসা রাখিলে চলিবে না। বৈরাগ্যসাধন সহায় করিয়া সংসার জলে নামি—তাঁহার কৃপায় ইন্দ্রিয়াদি হাঙ্গর কুমীর আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে—আমরা মুক্তিপথ পাইয়া তাহাদিগের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিব। আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে তাঁর চরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁরই উপর নির্ভর করিয়া চল, অগ্রসর হই, ও শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সেই মহাবাণী হৃদয়ে ধারণা করি। "ভগবান নীচে দাঁড়াইয়ে আছেন, আমাকে রক্ষা করবেন—এই বিশ্বাসে যে হাত পা ছেড়ে আনন্দ মনে তাল গাছ থেকে লাফ দিতে পারে, সেই সন্ন্যাসী হবার উপযুক্ত পাত্র।"—তখন বুঝিতে সক্ষম হইব যে, এই একান্ত নির্ভরতাই—এই [illegible]সাধনের উপায় হইতেছে। হরয়ে ওঁ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

শ্রীমুখে বলিলে আসি—তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ গুণাতীত গুণধাম॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া,
লীলা হেতু নর-কায়া,
নব যুগে অবতীর্ণ—ধরি রামকৃষ্ণ নাম।
নিরক্ষর ছদ্মবেশ—সদানন্দ আত্মারাম॥

(২)

যুগধর্ম্ম স্থাপিবারে, দিতে জীবে নিরবাণ।
প্রেম, শুদ্ধাভক্তি, ত্যাগ, সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান॥
ধরাধামে আগমন,
সহ সাঙ্গপাঙ্গগণ,
কামিনী-কাঞ্চন মুগ্ধ জীবগণে পরিত্রাণ॥
অর্পিতে উদয় দেব কল্পতরু ভগবান॥

(৩)

বিগ্রহ মূরতি-ধর, সহজ সুন্দর কায়।
বারেক দর্শন লাভে জীবত্ব ঘুচিয়া যায়॥
ভক্তপ্রাণ বিমোহন,
অকলঙ্ক অতুলন,
হৃদয়রঞ্জন রূপ দীপ্ত জ্ঞান-গরিমায়।
প্রেম ভক্তি বিলুণ্ঠিত, অতুল রাতুল পায়॥

(৪)

মূর্ত্তিমান বেদশাস্ত্র বিধি ধর্ম্ম-সনাতন।
সর্ব্ব অবতার করি একাধারে সম্মিলন॥
সর্ব্ব ভাব রক্ষা তরে,
এবার অবনী পরে,
নিত্যানন্দ-নিত্য-দেহে শ্রীচৈতন্য আগমন॥
রামকৃষ্ণরূপে পুন প্রেমভক্তি বিতরণ॥

(৫)

শ্রবণ মঙ্গল পূত—"রামকৃষ্ণ" মহামন্ত্রে।
নাচিয়া উঠিল বিশ্ব নীরব হৃদয় তন্ত্রে ॥
বাজিয়া উঠিল নাম,
রামকৃষ্ণ অবিরাম,
গাইল অপূর্ব্ব গীতি আচণ্ডাল "এক যন্ত্রে"।
দীক্ষিত এ ধরা আজ রামকৃষ্ণ "এক তন্ত্রে" ॥

(৬)

এ শুভ মুহূর্ত্তে যদি জনম লভেছ ভবে।
গাও রামকৃষ্ণ নাম, কি হেতু নীরব রবে!
বল রামকৃষ্ণ জয়,
ত্যজ ঘৃণা লজ্জা ভয়,
সর্ব্বস্ব অর্পণ কর, এ জীবন ধন্য হবে।
রামকৃষ্ণপদে মন মত্ত হবি আর কবে?

দীনহীন—
শ্রীসুরেন্দ্রকান্ত সরকার।

কে তুমি!

(১)

কে তুমি এ বিশ্বে কর নানা অভিনয়,
দুদিনের তরে! ত্যজি হেম নিকেতন,
সুবিমল সুখ শান্তি প্রেম পুণ্যচয়;
ত্রিদিবের নিত্যানন্দ দিয়া বিসর্জ্জন ॥

(২)

কে তুমি! জনমে তব সুখী কত জন
নগর মাঝারে উঠে আনন্দের ধ্বনি,
কুতূহলে দিশেহারা পুরবাসিগণ,
উৎসব উল্লাসে ভাসে দিবস রজনী ॥

(৩)

কে তুমি! হে দিগম্বর হাসিমাখা মুখ,
নধর অধরে ক্ষরে আধ সুধাধারা ;
জননীর কোলে বসি ভুঞ্জ নানা সুখ।
সোহাগে আমোদ ভরে সবে মাতোয়ারা ॥

(৪)

কে তুমি! কিসের তরে হাসি হাসি ভাষে,
সুগোল সুঠাম ধরি মোহন মূরতি,
কি খেলা খেলিতে ভবে কাহার আশ্বাসে।
ভ্রমিছ আমোদে মত্ত হয়ে দিবারাতি ॥

(৫)

কে তুমি হে, শশীকলা বাড়য়ে যেমন
দিনে দিনে দেহ পুষ্ট সুখের আকর,
বাঁধিলে শৈশব খেলা ধূলি নিকেতন।
সত্য ভ্রমে, কর তাহে, কতই আদর ॥

(৬)

কে তুমি! বাঁধিছ নিত্য নব খেলাঘর,
দারাসুত আদি এবে খেলার সম্ভার
মায়া মোহ পাশে বদ্ধ রত নিরন্তর,
ভেবেছ কি, কেবা তুমি, ওহে নরবর ?

(৭)

কে তুমি? অনিত্য সুখে আছ নিমগন,
কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন তরণী,
ত্রিতাপে তাপিত তনু বিষণ্ণ বদন।
বাল্য যুবা গত এবে আকুল পরাণী ॥

(৮)

কে তুমি! জানিতে তত্ত্ব চাহ মতিমান ?
নিরুপাধি, নিত্য, সত্য, তুমি আত্মময়।
সর্ব্বভূতে তব আত্মা তুমি বিশ্ব প্রাণ।
তোমারি কটাক্ষে হয় সৃষ্টিস্থিতি লয় ॥

(৯)

কে তুমি! ইহার মর্ম্ম পাবে কার ঠাঁই,
অচিন্ত্য চিনিলে তবে চিনিবে তোমায়,
চিনিতে চিন্ময়ে ত্বরা ধর হে গোঁসাই।
যাঁহার কৃপায় পাবে আত্ম-পরিচয়॥

(১০)

কে তুমি, না চিনাইলে চিনে কোন জন,
'ক' 'খ' হতে নিত্য চিনি নূতন নূতন,
বহুমূল্য মণি যেবা না চিনে কখন।
অবশ্য ধরিতে হবে শ্রীগুরু-চরণ॥

(১১)

কে তুমি! এ চিন্তা যবে হইবে উদয়,
গুরুবাক্যে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হয়,
চকিতে এ দশদিশি হেরে জ্যোতির্ম্ময়।
গুরু বিনা অন্য গতি নাহিক নিশ্চয়॥

(১২)

কে তুমি! ভুলেছ শিব-স্বরূপ তোমার,
নির্গুণ হইয়া বাস ত্রিগুণ আধারে,
বিফলে হারাও দিন লইয়া অসার।
কামিনী কাঞ্চন মোহে মত্ত চরাচরে॥

(১৩)

কে তুমি! স্বরগ-শশী ভূতলে আসীন,
নিত্য ছাড়ি লীলাছলে রচনা সংসার,
মরতে খেলার ঘর করেছ সৃজন।
দ্বন্দ্বাতীত গুণাতীত তুমি ব্যোমচর॥

(১৪)

কে তুমি! অনন্তে মিশে অনন্ত স্বরূপ।
অহং জ্ঞানেতে শুধু লীলা প্রকটন—
বলে দাও, দেখা দাও, হেরি তব রূপ।
অন্ধকারে কতকাল রাখিবে গোপন॥

(১৫)

কে তুমি! বা, আমি বা কে, নাহি গুরু চেলা,
আনন্দ উথলে সদা আনন্দেরি মেলা,
প্রেমাবেশে প্রেমাধারে হচ্ছে প্রেম-লীলা।
আনন্দে যাও রে ভেসে ছাড়ি ধূল-খেলা॥

(১৬)

কে তুমি! হে বিশ্বপতি ত্যজ ছদ্মবেশ,
তুমি আমি দ্বৈত ভাব কর সম্বরণ।
জ্ঞান আঁখি খুলে দাও ওহে পরমেশ,
তব সত্বা তোমাতেই হোক্ সম্মিলন॥

শ্রীমন্মথনাথ পি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

২০শে মাঘ, রবিবার, বেলুড়-রামকৃষ্ণমঠে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের জন্ম মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার বিশেষ ভাবে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহুভক্তও সমবেত হইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন।

২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার, বেলিয়াঘাটানিবাসী সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র দাস মহাশয়ের রামকৃষ্ণ-কুটীরে মহা সমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঐ দিবস ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। মজিলপুরনিবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের "কর্ণধার কুটীরে" ঐই দিবস রামকৃষ্ণ-সারস্বত-সম্মিলন উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। ঢাকা রামকৃষ্ণ-মিশনের সমাগত ভক্ত শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, মহোদয়দ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি উৎসবে উপস্থিত হইয়া সকলকে পরম উৎসাহ এবং প্রীতিদান করিয়াছিলেন। বহড়ু ও জয়নগর হরিসভার সভ্যগণ উৎসবে উপস্থিত হইয়া হরিনামকীর্ত্তনে পরম আনন্দ রোল ও জয়ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে একটী বাউলকীর্ত্তন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(বাউল-কীর্ত্তন—একতালা।)

রামকৃষ্ণ-নামের ভেলা ভেসেছে।

তোরা কে পারে যাবি আয় হেসে॥

এমন সুযোগ হবে নারে আর, সাধন ভজন পূজন নিয়ম নাই কোন প্রকার,

কেবল কাঁদতে মাত্র পাল্লেই হ'লো, স্ম'রে তাঁরি উদ্দেশে॥

(জয় রামকৃষ্ণ ব'লে, কোথা কাঙ্গাল-ঠাকুর ব'লে)

পতিতপাবন, অধমতারণ, এমন আররে কে,

কোন্ অবতারে, এসেছেরে, এমন নজীর দে,

যা খুসী তুই ক'রিস্ কিন্তু, ভাবিস আছেন একজন সঙ্গে মিশে॥

(সে রাম রহিম বা যীশু হোন্‌রে, শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণচন্দ্র হোন যেরে)

আমার মাতৃরূপে রণ তিনি, সদাই রে আশে পাশে॥

— —

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক রেঙ্গুণ ৪৪ নং ষ্ট্রীটস্থ ৬নং সমিতি গৃহে রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী৺ শ্যামাপূজার দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব হইয়াছিল। উৎসবস্থলে সমবেত সেবকমণ্ডলী মৃদঙ্গ ও খরতালীসহ উচ্চ রামকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সর্ব্ব শেষে প্রসাদ বিতরণসহ 'জয় রামকৃষ্ণের জয়' 'জয় গুরুমহারাজের জয়' ধ্বনিতে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল।

গত ১৫ই মাঘ চট্টগ্রামের গোঁসাইরডাঙ্গা গ্রামস্থ ধর্ম্মাশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা এবং ২০শে মাঘ মহোৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই মহোৎসবে বহু লোক যোগদান করিয়া ঠাকুরের নাম গুণ গান করিয়াছেন, প্রায় ৮০০।৯০০ শত কাঙ্গাল নারায়ণকে প্রচুর পরিমাণে ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল, চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জ্যোতি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, স্বামীজির জীবনী সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দানে উপস্থিত মণ্ডলীর হৃদয়ে বিমল আনন্দ ও শান্তিবিধান করিয়াছেন।

আগামী ২৬শে ফাল্গুন, সোমবার কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও রাজভোগ হইবে।

আগামী ৩রা চৈত্র রবিবার, বেলুড়—রামকৃষ্ণমঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবে, এই উৎসবে সাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।
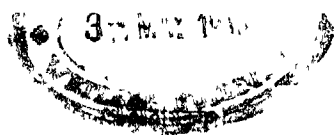
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ফাল্গুন, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্।

লীলার্থমাচ্ছাদিত নিত্যমূর্ত্তি
র্যুগে যুগেঽভূদ্ ভুবি যোঽবতীর্ণঃ।
কামারথাতে ক্ষুদিরামধাম্নি
পশ্যন্তু তং বালকমদ্যজাতম্॥ ১॥

শীতত্যতৌ শুক্লকলাযুগস্থে
দিক্ষু প্রসন্নাসু চ সৌম্যবারে।
রসাশুগাদ্রীন্দুমিতে শকাব্দে
যঃ প্রাদুরাসী জ্জয়ন্তীশ্বরোঽসৌ॥ ২॥

হিত্বা মহৈশ্বর্য্যমুদগ্রলীলং
মাধুর্য্য সান্দ্রং শ্রিত আত্মভাবন্।
কৈবল্যরত্নং বিতরন্ সমন্তা
জ্জাতস্ত্বিদানীং ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ৩

রামস্য কৃষ্ণস্য চ বিগ্রহো যো
বাল্যে স্বকেলী রুচিরং ননর্ত্ত।
প্রাগ্‌জন্মসংসিদ্ধ বিরাগবৃত্তি
র্নামানুরক্তো বিষয়েষ্বরক্তঃ॥ ৪॥

সসোদরঃ প্রাপ্য চ দক্ষিণেশ্বরং
লোকানুশিক্ষাব্রতমাস্থিতো মুদা।
মুক্তিপ্রসাদাং ভবতারিণীং হিতা
মুদ্বোধয়ামাস জগদ্ধিতেচ্ছয়া॥ ৫

ত্যক্ত্বাতি দূরং কনকঞ্চকামিনীং
ররাজ যোঽসাবকলঙ্ক চন্দ্রবৎ।
লীলাং সমাগম্য চ নাকলোকত
শ্চকার ভূধর্ম্ম সমন্বয়ায় বৈ॥ ৬॥

সঞ্চার্য্য শক্তিং নিজ সেবকেষু
চাপাঙ্গ ভঙ্গ্যা ভবতাপহারী।
যঃ প্রেরয়ামাস বিধূতপাপান্
সিংহোপমেয়ান্ দশদিক্ষু শিষ্যান্॥ ৭

স্থিরাসনং যস্য শ্রীদক্ষিণেশ্বরঃ
প্রসাদধন্যঞ্চ বেলুড় মন্দিরম।
বেদান্ত সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মতত্ত্বকং
হস্তেস্থিতং চামলকং নু যস্য ভোঃ॥ ৮

তদ্রামকৃষ্ণস্য শুভাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে
ভক্তদ্বিরেফোন্মদমত্তঝঙ্কৃতে।
গীর্ব্বাণ গন্ধর্ব্বগণেন্দ্র সেবিতে
অহৈতুকীং ভক্তিময়ঞ্চ যাচতে॥ ৯

শ্রীরামকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি শুভাব্জয়োর্ম্মে
ভৃঙ্গায়তাং চিন্ মকরন্দলিপ্সু।
স যচ্ছতূদ্যান্ ভবভীমসিন্ধোঃ
সুধানিধিঃ শান্তিসুধাং সদেন্দুম্॥ ১০

ইতি শ্রীমদ্ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দস্বামীপাদ শিষ্যেণ শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণা বিরচিতমেতৎ জন্মোৎসবস্তোত্রং সমাপ্তম।

অবতারবাদ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১৪ পৃষ্ঠার পর।)

প্রত্যেক অবতারের বাল্যলীলা পর্য্যালোচনা করিলে, উহা কেবল তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনের ছায়ামাত্র বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার পূর্ণজীবনটা পূর্ণত্যাগের শিক্ষামাত্র।

বিদ্যাভ্যাসের পর যৌবনে রামচন্দ্রের দারুণ ঔদাসীন্য সমুপস্থিত হইয়া সংসারে পূর্ণ বীতরাগ আনাইল। সংসার যেন ভীষণ অরণ্য বলিয়া প্রতীত হইল। রাজ্যসুখ কণ্টকবিদ্ধ করিতে লাগিল। সুখের জীবনের সম্মুখে অসুখের ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। দারুণ ঔদাসীন্যে রামচন্দ্রের মানসে বিচার আনিল। যাহাকে সংসারে সুখ বলে, তাহা তাঁহার নিকট চির অশান্তির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সংসারে বীতরাগ হইল এবং সন্ন্যাসাবলম্বনে তপস্যাই জীবনের চরমসুখ বলিয়া স্থির করিলেন। রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্রের চিত্তবৈকল্যদর্শনে চিন্তিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ মুনিকে আনাইয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের উপশম করিতে উদ্যত হইলেন। বশিষ্ঠের উপদেশে রামচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চল্য কথঞ্চিৎ উপশমিত হইল এবং সেই সময় বিশ্বামিত্র ঋষি রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস বধের জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে যাচ্ঞা করিলেন। রামচন্দ্র রাক্ষসবধ দ্বারা ঋষিগণের যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিয়া পরম যশস্বী হইলেন, এবং সেই সময় হরধনু ভঙ্গে জানকীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া সংসারী হইলেন। রাজা বার্দ্ধক্য-বশতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অভি-ষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি রাজ্যসুখরূপ মোহে কিরূপে আচ্ছন্ন থাকিতে পারেন? তাই ঘটনাচক্রে রাজ্যলাভের পরিবর্ত্তে বনবাসী হইয়া সীতাহরণ ব্যপদেশে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া ভারতে পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন। সামান্য মানব-জীবনে রাজ্যলাভ ও বনবাস সমান নহে। একটীতে সুখের পরাকাষ্ঠা, অপরটীতে মানসিক ও কায়িক ক্লেশের চূড়ান্ত। একটী মানসিক উত্তেজনা, অপরটী দারুণ অবসাদ। এই দুইয়ের মধ্যে রামচন্দ্র অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াও হাস্যবদন। রাজপরিচ্ছদ ও বহুমূল্য রত্নাদি খচিত উষ্ণীষের অপেক্ষাও চির-বল্কলবাস তাঁহার নিকট বহু সমাদৃত হইল। অবস্থার বিসদৃশ পরিবর্ত্তনেও তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য না আনাইয়া বরং চিত্তপ্রসাদ সমাবর্ত্তন করিল। সহাস্যবদনে

পিতৃসত্যপালনার্থ সস্ত্রীক অনুজসহ বনগমন করিলেন। বাল্যের সেই ঔদাসীন্য তাহার যৌবনে বনবাসে পর্য্যবসিত হইল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—কি কি মহৎকার্য্য সম্পাদনার্থে শ্রীরামচন্দ্র অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

১ম। সনাতন ধর্ম্মরক্ষা এবং তজ্জন্য ধর্ম্মদ্বেষী যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসকুল নির্ম্মূলকরণ।

২য়। সত্যপালন। পিতৃসত্য পালন হেতু চতুর্দ্দশবৎসর বনগমন এবং রাজ্যপালন হেতু গুণবতী সাধ্বী ভার্য্যাকে বনবাস দান। ও সত্যপালনের জন্য প্রাণসম প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণবর্জ্জন।

৩য়। পূর্ণজীবনে ত্যাগ শিক্ষাদান। প্রাপ্যরাজ্য ত্যাগ করিয়া ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জগতে চিরদিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

৪র্থ। পাপীর উদ্ধার। অহল্যা ও শম্বুকের শাপ বিমোচন—তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

৫। ভক্তের ভগবান। তাহার দৃষ্টান্ত, হনুমানের উপর অপার কৃপা এবং ঘৃণিত চণ্ডাল গুহককে মিত্রতা দান।

রামাবতার অতি মধুর অবতার। ইহাকে সৌম্যাবতার অভিধানে অভিহিত করা যাইতে পারে। রামনাম মাত্রেই যেন মানবহৃদয়ে এক সৌম্যমূর্ত্তির বিকাশ হয়। যেন অজস্র দুঃখভার সহ্য করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম। সসাগরা পৃথিবীশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র কেবলমাত্র পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁহাকে জটাবল্কলধারণে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া বনবাসের দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। পিতৃসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে অনুজ ভরতকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনবাসী হইলেন। যাঁহার মন্ত্রণায় তাঁহার ঈদৃশী অবস্থান্তর হইল, প্রথমে সেই সপত্নীমাতা কৈকেয়ীর নিকটেই বিদায় লইবার জন্য তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন ও ভরতকে মাতুলালয় হইতে সত্বর আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্নেহময়ী জননী তাঁহার সহিত বনগমনে উদ্যতা হইলে, নানা কারণ দর্শাইয়া স্বামীসেবায় বিরত থাকিবার জন্য সেই অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তি করাইলেন। প্রজারঞ্জনার্থ পূর্ণগর্ব্ভা সর্ব্বগুণ বিভূষিতা সর্ব্বলোক-সমাদৃতা মহিষী জানকীকে বনবাস দিলেন। সত্যপালনের জন্য বীরাগ্রগণ্য সতত অনুগত ও আশ্রিত প্রাণপ্রতিম অনুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন। অতএব রামচরিত্র অনুশীলনে জীবের কতই না

মঙ্গল সম্পাদিত হয়। তাই রামাবতার ভারতে অতি পবিত্র অবতার। রামবনবাস অদৃষ্টবাদের একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। এই ঘটনাবলম্বনে পূর্ব্বতন কোন মনীষী, একটী শ্লোক রচনা করিয়া যেন শ্রীরামচন্দ্রের মুখ হইতে কথিত হইতেছে বলিয়া, উহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যন্মনসা ন গণিতং তদভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী,
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"

অর্থাৎ রাম বলিতেছেন—যাহা মনে চিন্তা করা যায়, তাহা দূরে যায়, কিন্তু যে বিষয় কখনও চিন্তা করা যায় নাই, তাহাই সম্পাদিত হয়। কোথায় আমি রজনী প্রভাতে রাজা হইব, না চিরজটাধারণ করিয়া তপস্বীবেশে বনগমন করিতেছি।

যখন বিমাতা কৈকেয়ীর মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার পিতা দশরথ নিজ সত্যপালনের জন্য কৈকয়ীকে যে দুটী বর দিয়াছিলেন, তাহার একটা বরে কৈকেয়ী রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও এক বরে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিয়াছেন; তখনই রামচন্দ্র পিতৃমুখ হইতে তাহা শ্রবণ না করিয়াও পিতার সত্যচ্যুতি ভয়ে বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা কহিলেন, যাহা বিধিবদ্ধ তাহা সংঘটিত হইবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং রামচন্দ্র অবতার হইলেও যখন দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দেহীর ভোগ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তাহাতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

অবতার যখনই জন্মগ্রহণ করিবেন, তখনই দেহধারণবশতঃ কর্ম্মের অধীন হইবেন এবং পুনরাবর্ত্তনে সেই কর্ম্মের ভোগ আপনি আসিবেই আসিবে। তবে তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মের ছায়া লাগিবে না। শতবার অবতীর্ণ হইলেও কর্ম্মবশতঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কেবল জন্মান্তরে কর্ম্মের ছায়া প্রকাশ হয় মাত্র।

কল-ঘরে থাকিলে যেরূপ কলের ধূমে সর্ব্বাঙ্গ কালিমা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহী কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া কর্ম্মফলরূপ কালিমায় সর্ব্বাঙ্গ কালিমাবর্ণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অবতারগণের কর্ম্ম-নিবন্ধন জন্মলাভ হয় না, তবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ

হইলে পূর্ব্বকর্ম্ম-নিবন্ধন ছায়াপাত হয় মাত্র। ত্রেতায় রামাবতারে তৎকর্ত্তৃক বালিবধ সম্পাদিত হওয়ায় দ্বাপরে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ বিনষ্ট হয়। ইহাতে দেখা যায়—অবতারে পূর্ব্বকর্ম্মের ছায়াপাত হয় মাত্র। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালিবধ সম্পাদিত হওয়ায় দ্বাপরে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্ত্তৃক তাঁহার বধ সম্পাদিত হইয়া পূর্ব্ব কর্ম্মের ছায়াপাত মাত্র করিতে দেখা গেল। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হইলে, তাঁহার পূর্ব্ব অবতারের কর্ম্ম সে অবতারে দৃষ্ট হইত না। কিন্তু দেহী-জীবের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। তাঁহাদের জন্ম কর্ম্মবশানুগ। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে কহে জীব তিন প্রকার, নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। কিন্তু অবতারগণ কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহারা পূর্ণ জলাশয় হইতে উদ্ভূত স্রোতস্বিনী স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও ভূভার হরণের জন্য তাঁহার অবতরণ। বাল্যে তাঁহার জীবনে যে লীলা সম্পাদিত হয়, পরজীবনে তাহারই বিকাশ দেখা যায়। বৃন্দাবনরূপ শান্তিময় আশ্রমে পূতনাদি রাক্ষসী বধ দ্বারা যেরূপ আশ্রমের অশান্তি নিবারিত হইয়াছিল, সেইরূপ যৌবনে ও প্রৌঢ়ে রাজ্যমধ্যে কংশ, শিশুপাল ও দুর্য্যোধনাদি বধ দ্বারা জগতে চির-অশান্তি নিবারিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে গোপ বালকবালিকা মধ্যে যে প্রেম ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দ্বারা বৃন্দাবনকে ধরামাঝে স্বর্গধাম করিয়া তুলিয়াছিলেন, যৌবনে পাণ্ডবগণের মধ্যে সেই সার্ব্বজনীন প্রেম সঞ্চার করাইয়া বনবাসেও স্বর্গসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অসংখ্য নর বধ দ্বারা ভূভার হরণ করিয়া ভারতে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ প্রেমের অবতার, তাই শান্তি তাহার অমৃত ফল। জরাসন্ধ নৃপতির বধ দ্বারা বিজিত অসংখ্য নৃপতিগণের স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া ধরণীতে শান্তি স্থাপন করেন। যে যদুকুল স্বল্পকালের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বারকাপুরী সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অমানুষী কৌশলে সত্বর সেই বহুল পরিবর্দ্ধিত যদুকুল সমূলে উৎসারিত করিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়াও ধর্ম্মবীজ রক্ষার্থে পরীক্ষিৎরূপ অঙ্কুরকে গর্ভে রক্ষা করিয়া পরম যশোভাজন হইয়াছিলেন।

বুদ্ধাবতারে বাল্যে নির্জ্জনবাস প্রীতিকর ছিল বলিয়া শেষ জীবনে নির্জ্জন বনপ্রদেশে শালতরুতলে জীবন-নাটকের শেষাঙ্ক অভিনীত হইল। যৌবনে মানবের দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া নরদুঃখ মোচনের জন্য নির্ব্বাণ পথ উদ্ভাবন করিয়া নরদুঃখ নিবারণ করিলেন। রাজপুত্র হইয়া লোকশিক্ষার্থে ভিক্ষু

বেশে নগরে নগরে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবও ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজভোগ ত্যাগ করিয়া সংসারবন্ধন ছেদন করতঃ পরম শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে পরম বস্তু লাভ হয় না—তজ্জন্য স্বয়ং ভিক্ষু অবস্থা ধারণ করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিলেন। সুন্দরী যুবতীর ক্রোড় হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কামিনী ত্যাগ শিক্ষা দিলেন। প্রাণিবধ হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখিয়া, অহিংসা পরমোধর্ম্ম শিক্ষা প্রচার করিলেন। শেষে পরম বোধে আত্মা সংলগ্ন করতঃ মহাবোধিত্ব লাভ করতঃ বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইলেন। যে যুগে কাপালিকগণের আচরিত ধর্ম্মে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইতেছিল, যে যুগে তান্ত্রিকগণের ব্যভিচারে ও অভিসারে হীন-বল মানবগণ উৎপীড়িত হইতেছিল, যখন সাধকের ভগবান লাভ সুদুর-পরাহত, সেই যুগে—ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া ভারতের দুর্দ্দিন ঘুচাইয়া দুর্দ্দৈব মেঘজাল অপসারিত করিয়া দিয়া, সত্যের বিমল জ্যোতি বিকীরিত করিয়াছিলেন। বাল্যে প্রবল মাতৃ অনুরাগ, যৌবনে প্রগাঢ় মাতৃ ভক্তিতে পরিণত হইয়া অশক্ত্যা মাতার স্নানার্থ-নর্ম্মদার তীব্র বেগ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বাল্যে শাস্ত্রাধ্যায়নের অবিরাম অধ্যবসায় যৌবনে শাস্ত্রের ভ্রম ব্যাখ্যা সংশোধনের জিগীষা শঙ্করকে স্বয়ং শাঙ্করত্ব প্রদান করিয়াছিল। অবতার ব্যতীত কোন ধী-সম্পন্ন মনীষি সেই যুগে প্রবল যুগবেগ ফিরাইতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেন। মানবশক্তির আয়ত্বাধীন কর্ম্ম মানবের দ্বারা সাধিত হয়। প্রকৃতির চিরপারচালিত কর্ম্মের বাধা অতিক্রম করাইয়া ধীসম্পন্ন মানব সেই অসম্পন্ন কর্ম্ম সম্পাদন করাইতে পারেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের ব্যত্যয় অবতারেই সম্ভব। স্রোতস্বিনী নর্ম্মদা নিজ গন্তব্য পথেই নিয়মিত প্রধাবিতা। কিন্তু জননীর সুবিধার জন্য স্রোতস্বিনীর বেগ ফিরাইতে কি মানবের সাধ্য? শাদা ফুলের গাছে শাদা ফুলই ফোটে কিন্তু প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের বিপর্য্যয়ে শাদা ফুলের বৃক্ষে কি রক্তফুল প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? শঙ্কর যেমন নর্ম্মদার বেগ ফিরাইলেন, ঠাকুর আমাদের তেমনি রক্তজবা বৃক্ষে শ্বেতজবা ফুটাইয়া মথুরের হৃদয়ে চিরদিনের তরে অহৈতুকি ভক্তিফুল ফুটাইয়া দিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় ও তাঁহার ভালবাসা।

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় জগৎ বড় ভালবাসিতেন। তিনি আশৈশব জগৎবাসিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি ছিলনা, সুতরাং তিনি মন প্রাণ দিয়া জগৎ ভালবাসিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার সুধাধবলপুত জীবন নাটকের শেষ এক অঙ্ক দেখিয়াছি। তাঁহার বাল্য বন্ধু আজ কাল আর বড় দেখা যায় না। যে ভাগ্যবান নরনারী তাঁহাকে কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহারা আর এ মরজগতে নাই, কাজে কাজেই তাঁহার অমানুষিক প্রেমময় জীবনের সম্যক আলোচনা সুদূর পরাহত। তথাপি তাঁহার দেশবাসি জনগণ তাঁহার মধুময় জীবনীর আলোচনা করেন, তাঁহার ববণ্য সার্ব্বভৌমিক ভালবাসা মূর্ত্তি বিরলে বসিয়া পূজা করেন, ও ভক্তিভরে নিজ মস্তক নত করেন।

সকলেরই শত্রু ও মিত্র থাকে, কেহ তাহাদের নিন্দা করে, কেহ শ্রুতি সুখকর প্রসংশা করে, কিন্তু নাগ মহাশয়ের শত্রু দেখিতে পাই নাই। যে কোন ব্যাক্তি তাঁহার বিনয়াবনত সুমধুর বাক্য শুনিতে পাইত, তাঁহার প্রাণ মন মাতোয়ারা মৃদুমন্দ হাসিমাখা মুখ কখন দেখিত, তাঁহার বালক সুলভ সরলতাপূর্ণ ব্যবহার অবলোকন করিত, তাঁহার জীব-সেবা ব্রত, অসাধারণ সুখস্পৃহা বিরহিত কার্য্যাবলী আলোচনা করিত, সে অমনি বলিয়া উঠিত—এমন লোক দেখি নাই; ইনি সাধারণ লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

অতি শৈশবকালে যখন ভালরূপ কথা বলিতে পারিতেন না, তখন প্রদোষ কালে চাঁদের আলোতে যখন বৃক্ষরাজি বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া বিশ্বকর্ত্তার বিশ্ব-ব্যাপী সুমধুর সঙ্গীতের তালে নৃত্য করিত, তিনিও তাহাদের অনুকরণ করিতেন, যেন তিনি তাহাদিগকে কত ভালবাসেন, যেন তাহারা তাঁহার কত আত্মীয়, কত আদরের সামগ্রী। মধ্যে মধ্যে তিনি চাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আপনা আপনি বলিতে থাকিতেন,—এস আমরা ওখানে চলিয়া যাই, ও বড় সুন্দর।

যখন তাঁহার ১১।১২ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কোনও এক দোল যাত্রার দিন, তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণ হোলি খেলিতে ছিলেন, তিনি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি কখনও লোকের সহিত দৌড়াদৌড়ি কিম্বা হুড়াহুড়ি করিতে ভালবাসিতেন না, চিরকালই নির্জ্জনতার এক কোণে চুপ করিয়া থাকিতে পছন্দ করিতেন। বালকগণ খুব আমোদ করিতেছে এবং নাগ মহাশয় এক ধারে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। তাহারা হোলি খেলিতে খেলিতে এক

মত্ত হইয়াছিলেন যে, একে অন্যকে আবির দিয়া তৃপ্ত না হইয়া, সকলে মিলিয়া নাগ-মহাশয়কে আবির দিতে আরম্ভ করিল। ৭।৮ জন বালক এক সঙ্গে এক জনকে আবির দিলে তাহার কি দশা হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; সুতরাং নাগ-মহাশয় তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না এবং নিকটস্থিত কাঁটা বনে পড়িয়া গেলেন। তৎপর বালকগণ আবির দিতে ক্ষান্ত হইয়া, সেই ধারাল বাঁদার পাতার উপর দিয়া তাঁহাকে টানিতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল এবং রক্ত পড়িতে লাগিল। তাঁহার শরীরে রক্ত দেখিতে পাইয়া, তাহারা চমকিয়া উঠিল, এবং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দৌড়াইয়া নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে পর নাগমহাশয় উঠিলেন এবং স্বীয় পরিধেয় বসন দ্বারা শরীর পুছিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। বালকেরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাহারা কি অপকর্ম্মই না করিয়াছে, তজ্জন্য কতই না ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে। নাগমহাশয়দের বাড়ীতে সকল রকম অত্যাচার চলিত, সেস্থানে যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহা করিতে পারিত। কেহ তাহাতে বাধা দিতেন না, ঘর-দার ভাঙ্গিলেও কেহ বড় মানা করিতেন না। অতএব ঐ বাড়ী বালকদিগের এক বৃহৎ আড্ডা ছিল। অবসরমত সকলেই সেখানে থাকিত এবং বালক জনোচিত চপলতাব্যঞ্জক কাজ করিত। যেদিন নাগমহাশয়ের শরীরের রক্তপাত হয়, তাহার পরদিন কেহ আর সে বাড়ীতে যাইতে পারিতেছে না, সকলেই মনে করিয়াছিল, নাগমহাশয় তাঁহার পালিকা, মাতৃস্থান অধিকারিণী পিসিমাতাকে তাহাদের অত্যাচারের কথা বলিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার শরীরের রক্ত দেখাইয়াছেন। অবশেষে একটী বালক অতিশয় সম্রভাবে—যেন কিছুই জানেনা, এমত ভাবে তাঁহার বাড়ীতে গেল, এবং দেখিতে পাইল, পিসিমাতা নাগমহাশয়কে মুড়ি খাইতে দিয়াছেন। নাগমহাশয় তাহাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া তাহার কাছে গেলেন, এবং তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন, যেন তিনি আর তাহার দোষের কথা মনে রাখেন নাই, সকল অত্যাচারই ভুলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে নিজের মুড়ি তাহাকে খাইতে দিয়া নাগমহাশয় কতই যে আনন্দিত হইলেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সে বালকটীও তাঁহার আদরে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া নাগমহাশয়ের প্রদত্ত মুড়ি উদরস্থ করিল। নাগমহাশয়ের আর খাওয়া হইল না। এ রকম করিয়া নাগমহাশয় তাহাকে প্রতিদিন নিজ প্রাতঃভোজন খাওয়াইতেন, পরের মুখে সুখ মিশাইয়া নিজে সুখী হইতেন। আজও তদানিন্তন যুবকেরা বীতিত

আছেন। তিনি এই কথা বলিয়া 'হায় হায়' করেন ও বলেন একদিনও বুঝিতে পারিলাম না যে, তিনি তাঁহার খাদ্য আমাকে খাওয়াইয়া শুধু মুখে বসিয়া আছেন। পাঠক, ইহা কি সামান্য ভালবাসা! এরূপ ভালবাসা আমাদের মধ্যে কি সম্ভবে? শিশু নাগমহাশয় বালক কালোচিত অসামান্য ভোজন-লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া পরের সুখে আত্মপ্রীতি লাভ করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, আর অপর একটী বালক নিজের খাদ্য খাইতেছে !!

যখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়, তখন তিনি বালক ছিলেন। বিবাহের সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছে, খাদ্য সামগ্রী ঘর ভরিয়া গিয়াছে। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী বিড়াল অতিশয় দুঃস্থ অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছে, যেন আর চলিতে পারে না, কি জানি কি এত ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া নাগমহাশয় ঘরে ঢুকিয়া এক হাঁড়ী ক্ষীর বাহির করিয়া আনিলেন এবং ঐ বিড়ালটীর শরীরে তাহা মাখিয়া দিয়া নিকটস্থিত এক ঝোপের ভিতরে রাখিয়া আসিলেন, আত্মীয়ের বাধা বিঘ্ন, গালাগালি, কিছুই শুনিলেন না, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বিড়ালের শরীরে অপর্য্যাপ্ত ক্ষীর দেখিতে পাইয়া অন্যান্য অনেক বিড়াল তথায় আসিয়া জুটিল এবং তাহাকে চাটিতে লাগিল। বিড়ালগুলি ঐ ক্ষীর চাটিয়া খাইয়া ফেলিলে দেখা গেল, রুগ্ন বিড়ালটী অল্প সময় পরে অনেকটা সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিতেছে; যেন পরদুঃখকাতর নাগমহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিতে। নাগমহাশয়ও তাহাকে সুস্থ দেখিতে পাইয়া অতিশয় সুখী হইলেন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

নাগমহাশয় যাচককে শুধু হাতে ফিরিয়া যাইতে দিতেন না। তাঁহার যে অবস্থা ছিল, তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াও কখনও যাচককে কিছু না দিয়া ফিরাইয়া দিতেন না। যাচকের প্রার্থিত ধন সম্পূর্ণরূপে না দিতে পারিলেও যথাসাধ্য ধন দিয়া এমন সুমিষ্ট কথা বলিতেন যে, সে তাহার ক্ষোভ ভুলিয়া যাইত এবং প্রসন্নমনে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইত। নাগমহাশয় যখন ডাক্তারী করিতেন, তখন তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কালে অনেক যাচক তাহার বাসায় বসিয়া থাকিত এবং তাঁহার উপার্জ্জিত শেষ মুদ্রাটী পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। তাহারা এত নির্লজ্জ ছিল যে, তাঁহার শেষ মুদ্রাটী লইতে লইতে বলিত "তোমার ভাবনা কি, ঈশ্বর তোমাকে দিবেন।" তাহাদের ঘৃণিত স্বার্থপরতায় ফলে নাগমহাশয়কে অনেক দিন অনাহারে, কখন বা দুই এক পয়সার মুড়ি মুড়কি

খাইয়া দিন কাটাইতে হইত, কিন্তু তথাপি তিনি কখনও ক্ষুণ্ণমন হন নাই, সর্ব্বদা হাসিমুখে যাচকদিগকে শেষ মুদ্রাটী পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন। ইহা কি সামান্য ভালবাসা! পরের প্রীতির জন্য আত্মবলিদান কি সাধারণ ভালবাসার বিকাশ!!

তাহারা কেবল অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, সময় সময় বলিত, তুমি এই সকল জিনিস কিনিয়া আনিয়া দাও। তাঁহারই অর্থ দ্বারা তাঁহাকেই হাতে করিয়া জিনিস কিনিয়া আনিয়া দিতে হইত, নিজে উপবাস করিতেন। নিষ্ঠুর পরপীড়ন প্রিয় মানব, ধন্য তোমার নির্ম্মম ব্যবহার, আর ধন্য সেই ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি, সদা পরসুখপ্রদানকারী, দেহাত্মবুদ্ধি বিবর্জ্জিত নাগ মহাশয়!

জীবকে নাগমহাশয় অতিশয় ভালবাসিতেন। তাহাদের দুঃখ দৈন্য দেখিলে তিনি সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। ডাক্তারী করার সময় রোগীকে ঔষধ দিতে গিয়া পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিতেন, এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতে না পারিলে কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় ফিরিয়া আসিতেন—যেন রোগী তাঁহার আত্মীয়, রোগীর বিরহ যেন তাঁহার অসহনীয়। একদিন এক রোগীর পাশে যাইয়া দেখিতে পান, তাহার গায় দিবার কিছু নাই, শীতে কষ্ট পাইতেছে, তিনি অমনি নিজ শীতবস্ত্রখানি শরীর হইতে খুলিয়া রোগীর গায় দিলেন। রোগীর শত আপত্তি, তাহার আত্মীয়ের শত অনিচ্ছা প্রকাশও তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা অতিশয় পীড়াপীড়ি করায় তিনি তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন, কিছুতেই তাহা পুনঃ গ্রহণ করিলেন না।

একদিন এক রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, রোগী মাটিতে শুইয়া আছে, তাহার তক্তপোষ কিম্বা খাটুলী নাই। ভূমিতে শুইয়া থাকিলে রোগীর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং নিজের যে একখানামাত্র তক্তপোষ ছিল, তাহা রোগীকে দিয়া আসিলেন। রোগী তক্তপোষে শুইতে লাগিল, কিন্তু তিনি আর তক্তপোষে শুইতেন না, ভূমিশয্যা তাঁহার চির সহচর হইল। পরের সুখের জন্য তিনি না পারিতেন এমন কোন কাজ ছিল না।

সর্ব্বজীবে তাঁহার সমান ভালবাসা ছিল। একদিন শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উৎসব হইতেছিল, কোথা হইতে এক বিষধর নাগশিশু আসিয়া উপস্থিত।

সমবেত জনগণ হৈ হে করিয়া উঠিলেন, নাগমহাশয় কোথায় ছিলেন, তাঁহাদের গোলমাল শুনিতে পাইয়া সত্বর তথায় আসিলেন, এবং নির্ভয়চিত্তে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন, যেন নাগশিশু তাঁহার কত আত্মীয়, যেন কত ভালবাসার জন, যেন কতদিনের চেনা।

আমি তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি দেওভোগে দেখিয়াছি। অতিশয় প্রত্যূষে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন ও মুখাদি প্রক্ষালন করিতেন। তৎপর বারান্দায় আসিয়া বসিলে পর কোথা হইতে দুইটী শালিখ (পাখী বিশেষ) আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহাদিগকে সমুপস্থিত দেখিলেই তিনি বলিতেন, অতিথি আসিয়াছে, এবং কতকটা চাউল লইয়া হাত বাড়াইলেই শালিখদ্বয় নিকটে আসিত ও তাঁহার হাত হইতে খাইতে আরম্ভ করিত, যেন তাঁহা হইতে তাহাদের কোন ভয় নাই, যেন তিনি তাহাদিগকে কত ভালবাসেন ও আত্মীয়। আমরা তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিলেও ঐ শালিখদ্বয় তাহা ভ্রূক্ষেপ করিত না, নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার প্রদত্ত তণ্ডুলকণা তাঁহারই হাত হইতে খাইত।

একদিন প্রায় ৩।৪ হাত পরিমিত এক বিষধর সেঁকো (Cobra) তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছে। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। সাপ তাঁহার ঘরে ঢুকিতে ছিল, সুতরাং সকলেই বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু সাপ তাহা মানিতেছে না। সে প্রায় ঘরে ঢুকিবে, এমন সময় নাগমহাশয় আসিলেন এবং সুমধুর স্বরে "ঠাকুর, এদিকে আসুন, 'এদিকে আসুন" বলায় সাপটী অন্যদিকে চলিয়া গেল। তাঁহার বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বরে সাপটী কি যে মাধুর্য্য অনুভব করিল, সেই জানে। অন্যের শতভীতি প্রদর্শক ব্যবহার তাহার যে চিত্ত-আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না, তাহা নাগমহাশয়ের ভালবাসা জয় করিল, পরমাত্মীয়ের উপদেশ বাক্যের মত তাঁহার অনুরোধ পালিত হইল। তাঁহার বাড়ীর চারিদিকেই অনেক সাপ বাস করিত, তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না। আমাদের বিশেষ ভয় না হইলেও, চিরকালাভ্যস্ত ঝিভিঝিকা ত্যাগ করিতে পারি নাই, সামান্য ভয় হইতই হইত।

তাহার বাড়ীতে একটী কুকুর থাকিত। সকলের প্রদত্ত অন্নাদি আহার করিয়া পুষ্ট কলেবর হইয়াছিল। নাগ মহাশয়ের বাড়ীতেই দিন কাটাইত। অন্য কোথাও গেলে শীঘ্র ফিরিয়া আসিত, অন্যস্থানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না। একদিন সেই কুকুরটীর, কি এক ভাব হইল, সে নাগমহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিল। তিনি যেখানে যান, কুকুরও সেখানে যায়।

বর্ষাকালে, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর চারিদিকে জল, কোথাও এক পা বাড়াইবার স্থান নাই। কোথাও যাইতে হইলে নৌকায় চড়িয়া যাইতে হয়। অতিথি বাড়ীতে আছে, বাজারের সময় হইল। তিনি নৌকায় উঠিবামাত্র, কুকুরটী "থেউ থেউ" করিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং নৌকা চালাইবামাত্র, সে জলে নাবিল, যেন সে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাঁহার পিছু ছাড়া হইতেছে না। অবশেষে তাহার ক্রন্দন না শুনিয়া নাগমহাশয় তাড়াতাড়ি নৌকা চালাইলেন, কুকুরটী অনেক ডাকিল, তিনি কিছুতেই থামিলেন না। সে যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, জলে নাবিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং তিনি অদৃশ্য হওয়ামাত্র সে সাঁতার দিল। কুকুরটীকে সাঁতার দিতে দেখিয়া নাগমহাশয় আর কি করিবেন, ফিরিয়া আসিলেন, ও বাড়ীতে উঠিলেন। তৎপর বাড়ীর এ পথ ওপথে ঘুরিয়া কুকুরটীর চক্ষুর আড়াল হইলে পর তিনি আবার নৌকায় উঠিলেন, এবং অতিশয় সাবধানতার সহিত তাহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ধন্য কুকুর, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণ এত অধৈর্য্য হইয়াছিল।

তাঁহার পুকুরে দুইটী সিঙ্গিমাছ বাস করিত। তিনি খাইয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতে পুকুরের ঘাটে যাইতেন। বাড়ীতে জল দিলেও তিনি তাহা কখনও ব্যবহার করিতেন না। তিনি ঘাটে গেলেই সেই সিঙ্গি মৎস্যদ্বয় ঘাটের নিকট আসিত ও দৌড়াদৌড়ি করিত। নাগ মহাশয় তাহাদের জন্য ভাত লইয়া যাইতেন এবং তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। তাহারা তাঁহাকে একবারেই ভয় করিত না, পরমাত্মীয়ের মত তাঁহার হাত ঠোকরাইত, ও হাতের মধ্যে আসিত, যেন তাহারা তাঁহাকে কত ভালবাসিত, তাঁহার হাতের মধ্যে আসিয়া কত শান্তি পাইত, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ঘাটে গেলেই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইত, কি করিয়া যে বুঝিত—তাহা জানিতে পারা যায় না।

বৃক্ষলতাদিও তাঁহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত ছিল না। তাঁহার বড় ঘরের পিছনে বাঁশের ঝোপ আছে। এক সময়ে একটী বাঁশ সেই ঘরের মধ্যে ঢোকে। বাঁশটীকে ঘরের মধ্যে আসিতে দেখিয়া তিনি বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহা কাটিতে চাহিলে বলিতেন, যখন তিনি দয়া করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন, তিনি এমতাবস্থাতেই থাকুন। কাহাকেও সেই বাঁশটী কাটিতে দিলেন না।

নাগমহাশয়ের বাড়ীর বৃক্ষের একটী পাতাও কেহ ছিঁড়িতে পারিত না। তাহাদের পাতা ছিড়া দূরে থাকুক, কেহ তাহা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলে তিনি কষ্ট পাইতেন। একদা তদ্দেশবাসী জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ী জঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরিষ্কার করিবার মানসে কয়েকজন লোক লইয়া তথায় আসেন, এবং তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন। কিন্তু নাগ মহাশয় তাহার বাসনা পূরণ করিলেন না, তিনি একটী দূর্ব্বাও তোলাইতে পারিলেন না, একটী গাছের পাতাও ছিড়াইতে পারিলেন না। অনেক অনুরোধ করিলেও সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিলেন না। তাঁহার সময়ে, সুপক্ক ফল পাড়া হইত না, পাকিয়া পড়িলে পর তাহা সংগ্রহ করা হইত। তিনি আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই ভালবাসিতেন, সকলকেই সমাদর করিতেন। সকলের প্রীতি সমভাবে উৎপাদন করিতেন।

যদি কেহ তাঁহার অতিথি হইয়া থাকেন, তিনি বলিতে পারেন, নাগ মহাশয় জীবকে কত ভালবাসিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট কথা, মন প্রাণ খোলা আদর, আহার্য্য বস্তু সংগ্রহে ঐকান্তিক যত্ন, অতিথি সৎকারে সর্ব্বস্বপণ দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতিথির প্রতি যত্ন দেখিলে মনে হইত যেন তাহারা তাঁহার কত চেনা, কত আত্মীয়, কত আপনার জন। অতিথিগণ রওনা হইলেও তাঁহার ভালবাসায় তাহাদিগকে আরও চারি দণ্ড তথায় থাকিতে হইত, তাঁহার ভালবাসা-মাখা কথা শুনিতে হইত। তাঁহার সুমধুর আশ্বাস বাণীতে অনেক পাপী তাপীর দগ্ধহৃদয়ে আশার সুবিমল উৎস খুলিয়া যাইত, তাঁহার ভালবাসায় অনেক সংসারদগ্ধ জীব শান্তি পাইত, এবং মন প্রাণ হারাইয়া তাঁহার সুবিমল মুখপানে তাকাইয়া থাকিত।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র।

—০—

পরিবর্ত্তন।

'পরিবর্ত্তনের' নাম শ্রবণমাত্রই বিশ্বজগতের জনসাধারণ বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে বিস্ফারিতনেত্রে ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া শিহরিয়া ওঠে! কিন্তু তাহারা জানে না যে 'পরিবর্ত্তন' কত মধুর।

পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মুহূর্ত্তকালও তাহার স্থায়িত্ব সংরক্ষণে সক্ষম হয় না। এই বিশ্বজগতাদি যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু আছে, তাহা সকলই পরিবর্ত্তনশীল! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে

সমষ্টিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। পরিবর্ত্তনকে বাদ দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণা করা অসম্ভব। জগতে যিনি পরিবর্ত্তনের মাহাত্ম্য ধারণা করিতে পারিয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই ব্রহ্মাণ্ডকে চিনিয়াছেন, তিনি ইহার শক্তিদর্শনে মোহিত হইয়াছেন। তিনি সাদরে পরিবর্ত্তনকে ডাকিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিতেছেন। পরিবর্ত্তনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; পরিবর্ত্তনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা, পরিবর্ত্তনই দৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু সব।

পরিবর্ত্তন না হইলে, তুমি কোথায় থাকিতে? আমি কোথায় থাকিতাম? এই মুনিমনোহারী, দেবমানব-সেব্য পুষ্প-পত্র-পল্লব সমন্বিত পাদপ শ্রেণী কোথায় থাকিত? এই সুশ্যামল পৃথিবী আস্তরণ, কোমল নব দূর্ব্বাদল কোথায় থাকিত? আমরা ও অন্যান্য যাহা কিছু, সকলই পরিবর্ত্তনের নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান। শক্তির পরিবর্ত্তন তেজ; তেজের পরিবর্ত্তন শৈত্য, শৈত্যের রূপান্তর বাষ্প, বাষ্পের বিকার জল, জলের পরিবর্ত্তন মৃত্তিকা এবং এই মৃত্তিকা হইতেই জাগতিক বৃক্ষলতা, জীবজন্তু সকলই।

জগতের সৃষ্টি যেমন পরিবর্ত্তন দ্বারা, ইহার অস্তিত্বও তেমনি পরিবর্ত্তনের উপর। সূর্য্যালোকরশ্মি তাপরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাগরস্থ জলকে বাষ্পরূপে পরিবর্ত্তিত করে। সেই বাষ্প অত্যুচ্চে আরোহণ করিয়া মেঘরূপ ধারণ করে। সেই মেঘমালা শূন্যপথে বিচরণ করিতে করিতে বৃষ্টিধারারূপে বর্ষিত হইয়া তপ্তধরাবক্ষ সিক্ত করে, এবং তাহারই ফলে বসুন্ধরা নানাবিধ সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য প্রসব করিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের জীবনরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করে।

হে পাঠক! ঐ দেখ, এই মাত্র যে গভীর তমসাপূর্ণ নিশার আঁধারে পড়িয়া আপনাকে কত দুর্ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছিলে, দেখিতে দেখিতে সেই ঘনান্ধকার কাটিয়া গেল, সুচারু মোহিনী উষা আসিয়া সমুপস্থিত! তাহার শুভাগমনে, আলো ফুটিল, পাখী ডাকিল, কুসুম হাসিল, সৌরভ ছুটিল, বাতাস বহিল, প্রকৃতি নবসাজে সাজিয়া তোমার সম্মুখে সুঠামে দাঁড়াইল। এখন একবার ভাবিয়া বল—পরিবর্ত্তন সুখের কি দুঃখের?

উষা আর নাই, তৎপরিবর্ত্তে প্রভাত আসিয়াছে। ঐ পূরব আকাশে নব রক্তিমরাগে দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া স্বর্ণকান্তি সূর্য্য উঠিয়াছে। প্রভাত শিশির-স্নাত পাদপদল গলিত কনকোজ্জ্বলকান্তি গায়ে মাখিয়া নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে ধ্যান নিমগ্ন রহিয়াছে। বিহগকুল কল-কোলাহলে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিভুগুণ গাথা কীর্ত্তন করিতেছে। ভ্রমরকুল আনন্দে আকুল হইয়া গুণ গুণ

রবে কানন ঝঙ্কারিত করিয়া, পুষ্পমধু পান করিতেছে। এখন একবার বল—পরিবর্ত্তন চাও কি না?

আবার দেখ, মধ্যাহ্ন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত কৃষক ও পান্থ, সুশীতল সান্ধ্য-সমীরে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। অস্তাচলশিখর সমাসীন শ্রান্ত ক্লান্ত রবির কিরণোদ্ভাসিত মেঘগুলি মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে। এখন বল—পরিবর্ত্তন মধুর কি না?

পরিবর্ত্তন চায় সকলেই। চায়না শুধু জগতের মায়ামুগ্ধ মানবমণ্ডলী। কিন্তু তাহারা না চাহিলেও 'পরিবর্ত্তন' তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। সে চলিতেছে; অবারিত ধারায় দিক দেশ কাল বিচার না করিয়া শুধু চলিতেছে. কখন্ তাহার গতি থামিবে, কেহ জানেনা। কখনও থাকিবে কিনা তাহাও জানেনা। কোথায় পরিবর্ত্তনের শেষ, কোথায় ইহার কুল কিনারা কেহ জানেনা, কুল কিনারা আছে কিনা, তাহাও জানে না। কখন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও কেহ জানে না। মানব শুধু দেখে, পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, একটার পর একটা, তারপর আর একটা, ক্রমাগত অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। শৈশব আসিল, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল, বাল্য আসিল; তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল, যৌবন আসিল—সে চলিয়া গেল, প্রৌঢ়ত্ব আসিল, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল, আবার বৃদ্ধত্ব আসিয়া উপস্থিত! তখনই জীবনের মহাবর্ত্তনেরকাল নিকটবর্ত্তী। এতকাল পরিবর্ত্তনগুলিকে আনন্দে ভোগ করিয়া আসিতে ছিল, এখন মহাবর্ত্তন সম্মুখে দেখিয়া তাহারা বিকলচিত্ত এবং ভয়ে বিহ্বল। এখন আর মহাবর্ত্তন সম্ভোগে সম্মত নহে।

পরিবর্ত্তন দুই প্রকার—সুখদ ও দুঃখদ।

সুখদ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া জগতে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়, তাই মানব তাহার বড় পক্ষপাতী; তাই মানব তাহাকে সমাদরে আহ্বান ও আগমনে আলিঙ্গন করে।

দুঃখদ পরিবর্ত্তন আসিয়া জগতে বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দেয়, এবং অশান্তির আগুন প্রজ্জলিত করে। তাই মানব তাহার উপর বড় রুষ্ট এবং তাহার আগমনে বড়ই নারাজ। কিন্তু শুন, শঙ্কর কি বলিতেছেন:—

যাবৎ জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী জঠরে শয়নং।
মায়াময়মিদ মখিলং হিত্বা
জ্ঞানমর্ত্ত্যুসর সম্যক বিদিত্বা।

যখন পরিবর্ত্তনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তাহার অনুশাসনে মৃত্যু সুনিশ্চয়, ভীত বা দুঃখিত হইওনা, আবার জন্ম হইবে। যদি সুখদ পরিবর্ত্তন চাও, তাহা হইলে এই মায়া পরিপূর্ণ জগতে আর আসিও না; সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া জ্ঞানমার্গ অনুসরণ কর। মোহে মুগ্ধ হইও না।

সুখমাপতিতং সেব্য দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ॥

সুখদ পরিবর্ত্তন ঘটে, বেশ আপত্তি নাই, সুখ ভোগ করিব। দুঃখদ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাও বেশ, দুঃখ কি? দুঃখ ভোগ করিব। সুখ দুঃখ উভয়ই সমান। উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা মনের বিকার বা পরিবর্ত্তন মাত্র। কোনও এক বস্তু বা অবস্থার সহিত তুলনাদ্বারা সুখ দুঃখের উৎপত্তি। যদি তুলনা না করি, তবে আর সুখ দুঃখ কি? আর যদিই বা তুলনা করিয়া নিজকে অপেক্ষাকৃত সুখী বা দুঃখী অনুভব করি, তাহাতেই বা বিষণ্ণ হইব কেন? দুঃখ ও সুখ একটী চক্রের দুই দিকে বদ্ধ রহিয়াছে; উহার ঘূর্ণনে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে একবার উপরে আবার নিম্নে আসিবেই আসিবে। অতএব সুখ দুঃখ নামে স্থায়ী কিছুই নাই। কোনও অবস্থায় ভয় করিও না, তোমার জন্য ঈশ্বর আছেন।

তুমি যে মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া জড়সড়ভাবে বিষণ্ণমনে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছ; একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ! ঐ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সুধাকর, অমৃতভুক্ বিকট রাহুর গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, শত শত হস্তে অগণিত অস্ত্রধারণ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে, সেও উহার করাল কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। এই পরাভব রাহুর বলাধিক্য এবং চন্দ্রের কাপুরুষতাবশতঃ সঙ্ঘটিত নহে। এই পরাভব কালের পরিবর্ত্তন-ফল প্রকাশক। কালচক্রে আজ চন্দ্র, রাহু কর্ত্তৃক কবলিত হইবে; ইহা শত চেষ্টায়ও নিবারিত হইবার নহে।

পরিবর্ত্তনের শক্তি অসীম। ইহার শক্তির তুলনায় মানুষের শক্তি, হস্তীর শক্তির তুলনায় পিপীলিকাশক্তির সমতুল্য বা তদপেক্ষাও হীন। যাহা সহস্র সহস্র মানব মিলিয়া শত শত বর্ষের পরিশ্রমের ফলে প্রস্তুত করিয়াছে, কালক্রমে পরিবর্ত্তন আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ফুৎকারে শূন্যে মিশাইয়া ফেলিল। তাহার একটী ধূলিকণাও আর তথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এত বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফল শুধু স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল। আজ যাহা যে ভাবে দেখি-

লাম, কাল—কাল কেন, মুহূর্ত্তপরে দেখি তাহা আর ঠিক সেই ভাবে নাই, এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সেখানে পরিবর্ত্তন তাহার হস্তক্ষেপ করিয়াছে। আজ যে শিশুটীকে সরলতার আধার, হাসির উৎস, আনন্দের সাগর, শান্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে দেখিলাম, দশবৎসর পরে দেখি ঠিক সেই শিশুটীই বালকত্বে পরিণত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত। এখন তাহাতে শৈশবের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় অবস্থা। কি আশ্চর্য্য! কি পরিবর্ত্তন!! কবি বলিতেছেন—ক্ষোভ করিওনা, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে; ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর।

জগতে পরিবর্ত্তন চলিবেই। তাহার অনিবার্য্য গতি কেহই প্রশমিত করিতে পারিবে না। হে মানব! যদি নিজের এবং জগতের মঙ্গল চাও, তবে পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, নিজকে এবং আত্মাকে প্রস্তুত কর। উহার ভীষণ বেগ রুদ্ধ করিতে, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইওনা; কোনই ফল হইবে না, মত্তমাতঙ্গ ঐরাবতের ন্যায় লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত হইবে মাত্র। দূর হইতে "পরিবর্ত্তনের" ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, শঙ্কিত হৃদয়ে কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিওনা। সাহসে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হও, দেখিবে সেই মূর্ত্তি তোমার মনের বিভীষিকামাত্র, তৎপরিবর্ত্তে উহার সাম্য-মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইবে।

উচ্চহতে, উচ্চতর, পর্ব্বত শিখরে,
অকম্পিত, ধীর-পদে কর আরোহণ।
বিভীষিকা নেশা, ভাঙ্গিবে স্বপন॥
মিলিবে প্রচুর অমূল্য রতন॥
সাহসে বাঁধহ বুক, আশীর্ব্বাদ শিরে,
জীবনের ব্রত সবে কর উদ্যাপন॥

সতীশ।

—•—

জননী নির্ব্বাণ।

মহামায়ার খেলায় জগৎ। নরনারী মায়ায় খেলায় ভোর। বাল্যে ধুলা খেলা, করিয়াছি, কিশোর অবস্থা হইতে মন কল্পনায় মিশিয়া খেলে, মালা গাঁথে। আমার এই বহু অসম্বদ্ধ অস্ফুট খেলার মালা কি বিশ্বজন গ্রহণ করিবেন? আমার মালা কি দীনা ভারতললনার কষ্ট আক্ষেপ দূর করিতে পারিবে? আমার মালার মূল্য নাই, ইহা কেবল দয়ায় গ্রহণ করিবার।

কিন্তু আমি বিশ্বের সংসারী, আমার স্বার্থময় জীবন, আমি স্বার্থেই হার গাঁথিয়াছি; প্রতিদান প্রার্থনা। ইহার প্রতিদান—দয়া, উদ্যম, কার্য্য।

ভারতবাসী বয়ঃজ্যেষ্ঠগণ আমার পিতা বয়ঃকনিষ্ঠগণ আমার পুত্র, তোমরা জননী নির্ম্মাণ কর—চেষ্টা কর। নিজে পবিত্র হইয়া, বালিকা—কুসুম তুল্য হৃদয়া বাছনীকে পবিত্রতা শিক্ষা দাও, ধার্ম্মিকা কর। তাহার বাহ্যিক কলেবরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে যে অর্থ ব্যয় কর, তাহার ভিতরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে তেমনি যত্নবান হও। ভোগের দিক শিথিল করিয়া কিছু যোগের শিক্ষা—অমৃত আস্বাদ করাও। চেষ্টায় বনের পাখী পোষ মানে, মানবের মত বুলি ধরে, রাধাকৃষ্ণ বলিয়া বলিয়া তার কণ্ঠ মধুর হয়। তবে মানব কি না পারে? চেষ্টায় মানব কি না পারে? সাধ কর, চেষ্টা কর, অবশ্য ইচ্ছাময় তোমার সৎ ইচ্ছায় তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা মিশাইবেন।

আলস্য ঔদাস্য ত্যাগ কর, জননী নির্ম্মাণে প্রাণ উৎসর্গ কর। আজ দশম বর্ষিয়া নৃত্যশীলা বোধহীনা সোহাগিনী মুহুর্মুহুঃ ভোজনরতা, নিত্য নূতন ফ্যাসানের ফ্রক জেকেট বসন শোভিতা, অবিদ্যারূপিণী বামাঝির পালিতা, দেবতা-ভক্তিবঞ্চিতা কন্যার সমারোহে পরিণয়, কাল হয়ত সে কালের গতি ও অদৃষ্টচক্রে কঠোর বৈধব্যের কোলে পড়িয়া গেল। সেখানে বৈধব্যপদে দশমবর্ষিয়া বালিকা হোলেও, যার যোগিনী হইবার প্রথা, সে এরূপ পতনে হটাৎ কেমন করিয়া উন্নতি করিবে? হটাৎ ত্যাগিনী হইতে হয় ত সে চূর্ণ হইবে, নয় শুধু জ্বালায় জ্বলিয়া শেষে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদিন পরে দাঁড়াইতে শিখিবে। তার অজ্ঞানতাঅশ্রু যদি ধরিবার জিনিস হইত, তবে গঙ্গা যমুনা সৃজন হইত। কিন্তু হায় সে "অশ্রু যমুনা"র ভ্রাতা যে "যম"। আবার সুভদ্রার ভ্রাতা "শ্রীকৃষ্ণ"। দুই ভাগ—সবই আছে। সমাজ আলোচনায় আমায় শক্তির অভাব তাই একটী কথা বলি—জননী নির্ম্মাণ কর। ভারতসন্তান! নিজ নিজ জননী নির্ম্মাণে সচেষ্ট হও। শকুন্তলার মত জননী নির্ম্মাণ কর, সুনীতির মত জননী নির্ম্মাণ কর, জনার মত জননী নির্ম্মাণ কর, রাণী দুর্গাবতীর ন্যায় জননী কর, তোমরা শিক্ষিত, অনেক পুস্তক ইতিহাস পঠিত, অনেক তত্ত্ব জান। কিন্তু তোমরা কালের গতিতে অতি অলস, কেবল আত্মসুখে রত। সাংসারিক সুখ সমস্তই জননীতে নিহিত। সংসারে যদি শান্তির আশা কর, তবে জননী নির্ম্মাণ কর।

তোমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর। বহু দোষযুক্ত পুরুষ শুধু বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, সে সমাজে সকলের সম্মান ভাজন হয়। হয়ত অন্তর নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি

বহু দোষপূর্ণ। আর কন্যা অশিক্ষিতা "মেনি"—যে ভর্ৎসনা নিষ্ঠুরতা পাইবার যোগ্য নয়, সে যদি অশিক্ষায় মহাভুলের ধারায় একটী ভুল করে, তবে সে ফেলিয়া দিবার যোগ্যা হয়! তাহার বাল্য হইতে আদরে ভিতরে ভিতরে ধর্ম্মের ভাব জাগাও, নিজ চরিত্র পবিত্র করিয়া পবিত্রতা শিক্ষা দাও, তার বেশী শিক্ষার আবশ্যক, সে যে জননী,—সে যে ভগিনী,—সে যে অর্দ্ধাঙ্গিনী। তাহা হইতেই যে কন্যা গৌরী-বাছনী লাভ। আগে তাহাকে শিবত্ব শিখাও, তখন বিষ খাইয়াও সে বাঁচিবে। এ ভোগরাজ্যে ক্ষুধাই অধিক। ক্ষুধা আছে বলিয়া কি বিষ খাইবে? সে অমৃত আস্বাদের পথ চিনিলেই তৃপ্ত হইবে। বিষের ভিতরই অমৃত লভিবে।

জননী নির্ম্মাণে উদ্যম জাগাও, দয়াবান হও, আবার বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা পূতসলিলা আবশ্যকমত অন্নদা অভাবশূন্যা শান্তিতৃপ্তিপূর্ণা হইবে। নারী জাতির প্রতি সমস্ত ভারতবাসীর দয়া চাই, লক্ষ্য চাই, তাহাদের অন্তর-বেদনা অনুভব করা চাই। তাহাতে তোমাদের কাপুরুষতা নাই, তাহাতে তোমাদের পাপ নাই, তাহাতে তোমাদের অপমান নাই, তাহাতে তোমাদের অমঙ্গল নাই, আবার তাহাতে তোমাদের আত্ম-গৌরবও নাই, ইহাই তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাতে তোমাদের লাভ অশেষ। তোমাদের দুএকটী প্রাণ কাঁদিলে, তাহাদের দুএকটী প্রাণ জুড়াইবে, কিন্তু অপর সমভাগ্যা সমজাতির দুঃখ থাকিতে তাহারা শান্তি লাভে অক্ষম। জগদম্বার অংশভূতা সমস্ত নারীর অশ্রু মুছিবে না। ভারতবাসী! দয়াবান হও, মলিন জননীকে দয়াদানে উজ্জ্বল কর, তবে বিশ্বজননীর কৃপা লাভ করিবে। আপন জননীতেই বিশ্বজননীর স্নেহ জ্ঞান উৎসারিত দেখিয়া শান্তি লাভ করিবে।

শরীরের প্রতি অবজ্ঞা বিদ্রূপ ভুলিয়া দয়াবান হও। শিক্ষিতা করা দোষের কথা—অপকার হইবে—এ সমস্ত নিতান্ত ছার-কথা ভুলিয়া অতীতের প্রতি চাও, শিক্ষা—সৎশিক্ষা ব্যতীত সুন্দরতা দেখিবে না। শকুন্তলা, ঋষিবর কণ্ব কর্ত্তৃক উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মধুময়ী হইয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে সংসারের আবশ্যকীয় গুণে ভূষিতা করিয়া, অপরদিকে ধার্ম্মিকা করিয়া কি মধুর গড়িয়া ছিলেন। বনের লতা পাতা পশু পক্ষী সকলই তাঁর প্রিয় বস্তু জ্ঞান ছিল। স্বামীর প্রত্যাখ্যানে তাঁর সহিষ্ণুতা অনুভবের জিনিস। সেই সহিষ্ণুতা পরিণামে—ভবিষ্যতে মধুর সুখ শান্তিদান করিল। কিন্তু এখনকার আমাদের কন্যা-শকুন্তলা, বা জননী শকুন্তলা—কয়জন এমন শিক্ষিতা, সহিষ্ণুতাময়ী ধীরা? এখন-কার স্বামীর প্রত্যাখ্যানে তৎক্ষণাৎ বিষ খাইয়া বসে," পরিণাম কেহ দেখে না,

ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে না। ইহা শিক্ষার দোষ—অজ্ঞানতা। কঠোর অভিমান জ্বালাময় অসহ্য ভাবে দাঁড়ায়। এ প্রবন্ধ-লেখিকা রমণী—তাহা না দেখিয়া, পক্ষপাতী না ভাবিয়া, আমার লেখার ভাবটুকু শুধু আপনারা দেখুন ও চিন্তা করুন। আমার অশিক্ষিত কয়স্থ প্রবন্ধে ঠিক মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছিনা, যদি ঠিক মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতাম, তবে বোধ হয় সর্ব্ব চিত্তই বুঝিত ও গলিত। দু একজনে সমগ্র ভারতের দুঃখ ঘুচাইতে পারিবে না। সকলেই মহেই দয়াবান ও ঔদাস্যশূন্য হও। ঘরে ঘরে জননী নির্ম্মাণ কর। বাল্যকাল হইতেই কন্যাকে ত্যাগিনী কর, মধুর ঐশ্বর্য্য—মধুর স্বামী ভোগের পথ চেনাও।

অসারে আসক্তি করাইওনা। চেষ্টা কর, তবে কন্যা সংসারে প্রেমিকা পরমপবিত্রা করুণাময়ী অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া ত্রিতাপভরা সংসার স্বর্ণ বারাণসী করিয়া তুলিবে। পিতার পদে দাঁড়াইলেই মস্তকে গুরুভার লইতে হয়। যদি ভার লইতে কাতর হও, ভারতবাসী! কন্যার পিতা হইও না, ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া বনে চলিয়া যাও। কতক অভাগিনীর অংশ কমিবে। তোমার কন্যা সিঁদুর-লোহ-শোভিনী বলিয়া নির্ভাবনায় আছ, অপর রমণী কি তোমার কন্যা নয়? এক ব্রহ্ম হইতেইত বহু মূর্ত্তি, কে আপন কন্যা, কে পর? কেবল দয়াময় শ্রীভগবান এক একজনকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, একা সব ভার পারিবে কেন! তা বলিয়া বিদ্রূপ নিন্দা নিষ্ঠুরতা, অপর কন্যাস্থানীয়াকে করিতে বলেন নাই। তোমারই বা কন্যার সিন্দুর লৌহের স্থায়িত্ব স্থিরতা কোথায়? খসিতে মুছিতে কতক্ষণ? আজ বহু বিলাসিতা প্রগল্‌ভা, কাল মস্তকমুণ্ডিতা থান পরিহিতা গুম্ভিতা হইয়া বৈধব্যে দাঁড়াইল। অজ্ঞানে অল্পবয়সে ত্যাগ, তাহার অন্তরগত না হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হইবে। ইহাই স্বাভাবিক কথা। যে বালিকা স্বামী চেনেনা, সে যোগিনী ত্যাগিনী, পতির সমাধিমন্দিররূপিণী পবিত্রা মলিনসৌন্দর্য্যময়ী হটাৎ হওয়া, কি অসম্ভব ঠেকেনা? বালিকার পোষা ময়নাপাখী যদি মরিয়া যায়, সে তখন কাঁদে, জীবন ভোর স্মরণও থাকে, কিন্তু তার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী যোগিনী কোথায় কে হইয়াছে? প্রেম ব্যতীত নৈরাশ্য কোথায়? জ্ঞানে ও উন্নত বয়সে যে স্বামী চিনিয়া হারাইয়া ফেলিল, সে সৌভাগ্যবতী, সে সংসারে কাজ করিবে। সে ধার্ম্মিকা পতিধ্যানমগ্না হইয়া বিশ্বপতিতেই পতিকে মিলাইয়া, সোজা সুবিধা করিয়া যোগে মধু শান্তি ভোগে সুখিনী হইবে। তাই বলিয়া দশম-বর্ষিয়া খুকীর সেইরূপ আপনা হইতে হওয়া অসম্ভব। হয়ত বহু সংশিক্ষার মধ্যে বিলম্বে সে মধুরা হইবে।

তাই বলি যে সমাজের প্রথা এত কঠিন, সেখানে রমণীও তেমনি গঠন কর। বালিকাকে যোগিনী কর, কি জানি কবে তার কি অবস্থা দাঁড়ায়!

ভিতরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে পিতা মাতা চেষ্টা কর—যত্ন কর। বাহিরের সৌন্দর্য্য চিতার ভস্মরাশি হইবে, ভিতরের সৌন্দর্য্য সংসারে শান্তিদান করিয়া, বহু জীবনে মধুর শান্তিদান করিয়া, আত্মার সহিত অনন্তধামে স্থান পাইবে।

আমি বলিতেছি না—কন্যাকে জটা বল্কল পরাও, ফল খাওয়াও। আমি বলি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মধ্যম সজ্জা, শুদ্ধ আহার করাও। আজকাল বাহ্যিক বিলাসিতা অতি অধিক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেরই চাক্ষুস বিরাজিত। যদিও অনেকে মধুর হইয়া মধুর সংসার করিয়াছেন, একথা সত্য; তবুও অনেক অভাব। অনেক অভাগিনী কাঁদিতেছে।

তাই বলি—আগে ঘরের কাজ ভারতরমণীর অশ্রু মুছাইয়া, ভগবানের মঙ্গল আশীষ শিরে লইয়া অন্য কর্ম্মে অগ্রসর হও।

বিশ্বজন-শ্রীচরণ-প্রণতা, দীনা—শ্রীসুশীলমালতী।

—০—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তব।

(১)

ধর্ম্মলাভ হেতু যিনি দ্বাদশ বৎসর
করিলেন নানাবিধ কঠোর সাধনা;
না হেরিয়া আত্মাশক্তি—শক্তির আকর—
কাঁদিতেন যিনি পেয়ে মরম-বেদনা;
ধর্ম্মের ভিখারী হেন রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি॥

(২)

সুমধুর "মা মা" ধ্বনি মুখে শুনি যাঁর,
পাষাণ গ'লত কত পুণ্য-করুণায়;
উপদেশ-অনুকূল-পবনে যাহার,
যুগ-জীবনের-তরী ধর্ম্ম-পথে ধায়।
হেন শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি॥

(৩)

ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিসম্বাদ—অশান্তি ভীষণ—
পলাইল শুনি যার ধর্ম্ম-সমন্বয়,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম রক্ষা হেতু যাঁর আগমন,
যাঁর কাছে তৃপ্তি পায় সবার হৃদয়;
এ হেন উদার-শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি॥

(৪)

কাকবিষ্টাবৎ যিনি কামিনী-কাঞ্চন,
লোক-শিক্ষা হেতু শুধু করিলেন ত্যাগ,
জীব-হিতে শুধু যাঁর শরীর ধারণ,
বাঞ্ছা যাঁ'র শুদ্ধা ভক্তি—অন্যতে বিরাগ ;
হেন ত্যাগী যোগীশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥

(৫)

অবিশ্বাসী, কুতার্কিক, কত না মানবে,
দেবত্ব লভিলা বসি যাঁর পদতলে ;
"কল্পতরু" হ'য়ে যিনি ধর্ম্ম দিলা সবে,
পাত্রাপত্র না বাছিয়া জীব-দুঃখে গ'লে ;
এহেন কাঙ্গাল-গুরু রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥

(৬)

মার কাছে না চাহিয়া সিদ্ধাই-শকতি,
চাহিতেন যিনি জ্ঞান, ভক্তি নিরমল ;
ঊনবিংশ শতাব্দিতে যাহার উকতি,
"ভগবান সত্য আর অসত্য সকল'।
হেন পথ-প্রদর্শক রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥

(৭)

নরেন্দ্র, অভেদানন্দ সন্ন্যাসী সকল,
যাঁর কাছে লাভ করি দিব্যজ্ঞান-ধনে,
ভ্রমিলা পৃথিবী-বক্ষে লয়ে সিংহবল,
স্তব্ধ করি নর নারী বেদান্ত-গর্জ্জনে ;
হেন মহাশক্তিধর রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥

(৮)

সর্ব্বশেষে এ অধম কৃপাবলে যাঁর,
দুর্ল্লভ বিশ্বাস-রত্ন লভিলা জীবনে,
সন্দেহ কুয়াসা-রাশি কাটিল যাঁহার,
উপদেশ তপনের প্রখর কিরণে।
এ হেন সাক্ষাৎগুরু রামকৃষ্ণে আমি,
করি কোটী নমস্কার ভগবান জানি ॥

(জনৈক কাঙ্গাল)।

মন-মিলন।

(১)
ভুবন গগন বল বল আজ
খুলিয়া নীরব ভান,
কোথায়? কোথায়? পরম সুন্দর
কোথায় প্রাণের প্রাণ?

(২)
নিভাও পরাণে মরম তাপ—
আর না দহিও মোরে,
কে আছে আমার? কারে চাই আমি
দাওরে আমার কোরে।

(৩)
ফুরায়ে আসিল এ মম জীবন
আর না কাঁদাও মোরে,
মিলাইয়া দাও সাধের স্বজন,
বসিব চরণ ধোরে।

(৪)
কি মহা অভাব, কি মহা পিপাসা
কি সাধে পাগল হই?
অন্তর্য্যামী যদি শ্রীহরি আমার—
তাঁহারে বুঝিনু কই?

(৫)
অন্তরে নিভৃত কক্ষে আমার
গুপ্তমণি করে বাস,
রাজরাজেশ্বর হৃদয়ে থাকিতে
দীনা কাঁদি বারমাস।

(৬)
আমি সাধন ভজন করিতে নারিব
শুষ্ক হৃদয় মনে,
(আমি) স্বরূপ দেখিয়ে প্রসন্ন হইয়ে
পূজিব হৃদয় ধনে।

(৭)
এস হে সুন্দর শুভ্র বিমল
রমণীয় ভাতি হেরি,
তুমি দয়াময় বিশ্ব প্রাণারাম
কোরনা তিলেক দেরি।

(৮)
(যদি) দেখা নাহি দাও, মোর মাথা খাও,
নামের দোহাই লাগে,
সত্য সনাতন, অধমতারণ
দাঁড়াও আমার আগে।

(৯)
দেখিয়া তোমায় পূজিতে শিখিব
ধরিব রাতুল পায়,
আমি বহিব অভয় শ্রীরাঙাচরণ
সানন্দে তুলি মাথায়।

(১০)
দয়াল শ্রীহরি দেখা কি দিবেনা?
দহিব, দেখিবে বসি,
দাও নাথ দাও মানস নয়ন
নেহারি হৃদয়-শশী।

(১১)
জয় শ্রীমাধব, শ্রীপতি সুন্দর,
নমঃ নারায়ণ হরি,
জয় শ্রীমাধব, দাঁড়াও দলিয়ে
রিপু-অহি শির'পরি।

(১২)
জয় শ্রীমাধব মালতীমোহন
মধুর মন্দহাস,
জয় শ্রীমাধব, প্রভু রামকৃষ্ণ
মিটাও আমার আশ।

(১৩)
গুঞ্জর অলি, কুকার কোকিল,
ছুটেছে মলয় বায়,
কুঞ্জ ভরিয়া ফুটেছে কুসুম,
হাস শশী নভ গায়।

(১৪)
জয় শ্রীমাধব, সুনীল সুন্দর
বিশ্ব মন-চোর হরি।
নমঃ নারায়ণ, মালতী বাঞ্ছিত
দাঁড়াও স্বরূপ ধরি।

(১৫)
পূর্ণ মনস্কাম, হে দীন দয়াল,
অনন্ত সুন্দরনাথ—
কায়মন মনে তব শ্রীচরণে
শত শত প্রণিপাত।

"মন-বুলবুল" রচয়িত্রী।
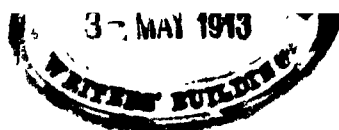
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

চৈত্র, সন ১৩১৯ সাল।

ষোড়শ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

পূজার ফুল।

(প্রাপ্ত)।

কয়েক দিন হইল আধ্যাত্মিক তত্ত্বরসে পূর্ণ একখানি পুস্তক পাঠ করিলাম।* পুস্তকের নামটী প্রাণ আকর্ষণ করিল, এ কারণ একটু ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইলাম। এ হেন জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমমিশ্রিত ধর্ম্ম-নীতিপূর্ণ পুস্তকের যে বর্ত্তমান ধর্ম্মদরিদ্র হিন্দুর অত্যন্ত প্রয়োজন, এইটী জনসাধারণের জ্ঞাপন করিতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। গ্রন্থকারের জীবন যে ধর্ম্ম-জীবন,—পুস্তকের ছত্রে ছত্রে যেন স্পষ্টই অঙ্কিত হইতেছে। পুস্তকের মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ভগবৎ শ্রীচরণ পূজায় পুষ্প একটী প্রধান উপকরণ। পুষ্পের সুবাসে পূজ্য ও পূজক উভয়েরই প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে, অবশেষে দুটী-প্রাণ এক হইয়া পরস্পর বিভোর থাকেন, পূজকের প্রাণ পূজ্যে বিলীন হয়, চিত্ত তাঁহাতে সমাহিত হয়, ইহাই—'তদ্গাতরন্তরাত্মা।" প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে

* সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার প্রণীত, ভক্তি-প্রেম-বিমিশ্রিত আধ্যাত্মিক প্রবন্ধাবলীতে পরিপূর্ণ অমূল্য পুস্তক। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র। *তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার সত্যই মনের ভাবটী কাড়িয়া লইয়া এইরূপ মধুর ভাব পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পুস্তকের নামটীতে কত অর্থ, কত অমূল্য সারগর্ভ ভাব লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার যেন এ জগতে পুষ্প সৃজনের উদ্দেশ্য স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়া ধীরে ধীরে স্রষ্টার অনুসন্ধান পাইয়াছেন। এখানকার উদ্যানের পুষ্প-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মানস উদ্যানের ফুলটী যে ফুটাইতে পারিয়াছেন, তাঁর প্রবন্ধ পাঠে সেটীও বেশ প্রতীয়মান হয়। তাই স্থানান্তরে মুখবন্ধে কেমন লুকান ভাবটী জাগাইয়া তুলিয়াছেন।—"জড়জগতের অনিত্য পুষ্প, যাহা এবেলা ওবেলা শুকাইয়া যায়—একদিন পরে ঝরিয়া পড়ে, তাহার যদি এতটা যোগ্যতা ও অধিকার থাকে, তবে মানসোদ্যানের সদ্‌গুণ-সৌরভ-মণ্ডিত, নিত্য প্রেম-কুসুম কি তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহে?" বস্তুতঃ এই কয়টী পংক্তি পাঠ করিলে প্রাণে আধ্যাত্মিকতার তরঙ্গ উথলিয়া উঠে—সৃজন হইতে স্রষ্টার দিকে, পূজা হইতে পূজ্যের দিকে এক দৃষ্টে, এক ভাবে, অবিচলিত মনে নিরীক্ষণ করিতে আমাদিগকে যেন গ্রন্থকার শিখাইয়া দিতেছেন মনে হয়। ধন্য তাঁহার রচনা-কৌশল—ধন্য তাঁহার ভাব বিন্যাসের পারিপাট্য। সমস্ত সাধন তত্ত্বটী যেন এই পুস্তকে সন্নিবেশিত ষোড়শটী প্রবন্ধে অঙ্কিত করিয়াছেন। পুস্তকের গুণ সামান্য প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ স্থানে প্রকাশ সম্ভবপর নহে। চিন্তাশীল ভক্ত পাঠকের নিকট, এই ষোলটী প্রবন্ধ যে গ্রন্থকারের মানসোদ্যানের ষোলটী বাছা বাছা ভক্তি-সিঞ্চিত ফুল বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সাধারণে পরিচিত হউন আর নাই হউন, এ ধর্ম্ম-হীনতার দুরবস্থায় এরূপ পুস্তক জনসাধারণের হস্তে উপহার স্বরূপ দান করিবার জন্য ভক্ত পাঠক পাঠিকা যে তাঁহার নিকট ঋণী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বাছা বাছা কয়টী ফুলের যেটীই সচ্চিন্তার সাধন-থালাতে তুলিয়া ধরা যায়, সেটীতেই স্বর্গের মন্দার-গন্ধ ছড়াইয়া দেবপূজার উপযুক্ত হইয়া উঠে ও ভক্তপ্রাণ সাধনার প্রাথমিক জ্যোতিতে বিভোর হইয়া, পূজ্যের দিকে এই ফুল সহায় করিয়া উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবেন তাহ তে আর সন্দেহ কি? প্রত্যেক ফুলটী যেন অমানুষিক স্বর্গের দিব্য পরাগমাখা জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির চিন্ময়ী গঙ্গাবারিসিঞ্চিত—যেন উহাদের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রস্রবণের গতিতে দেবরাজ্য অতি নিকট প্রতীয়মান করিয়া দিতেছে। আধ্যাত্মিকতার একটানা স্রোত—একটীতেও এই মায়া মোহ জ্বালা যন্ত্রণার রাজ্যের অলীক কথার সংস্পর্শ নাই—কেবল ইঙ্গিতে দেবরাজ্যের দ্বার নিদর্শন করাইতেছে। এই

ষোলটী পুষ্পের কোনটী ছাড়িয়া কোনটী বাছিয়া লইব? গ্রন্থকারের এই ফুলগুচ্ছ হইতে একটী প্রাণস্পর্শী বৈরাগ্য-চন্দনমাখা ফুল আমি বাছিয়া লইয়া কিয়ং পরিমাণে উহার কতকটী অংশ জনসাধারণকে এস্থলে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কি বৈরাগ্যভরা ভক্তি-প্রেমের প্রস্রবণ—কি অনিত্যতা শিক্ষার ভাব কোশল। এ কয়টী পংক্তি পাঠ করিলে কাহার না হৃদয়ে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়? কাহার না মনে হয়, এ সংসারে যদি কোনও শান্তির স্থল থাকে—শোক তাপে শান্তি পাইবার স্থান থাকে, সেটী হল শ্মশান। গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"মা শ্মশানবাসিনী কেন? জগতে এত সুরম্য সুদৃশ্য স্থান থাকিতে, মায়ের এমন কুস্থানে অবস্থিতি কেন? স্বার্থপর জীব! মায়ামোহবিমুগ্ধ জীব! তুমি শ্মশান মাহাত্ম্য কি বুঝিবে? তোমার চক্ষে এ পবিত্র স্থান অপবিত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া আর কাহার নিকটে হইবে? কিন্তু যে মায়ামোহ কাটাইয়াছে, যে সংসারকে বুঝিয়াছে, তাহার পক্ষে শ্মশান বড় আরামের স্থান। তাই, সাধক দিবানিশি শ্মশানে থাকিতে সাধ করেন। সংসার শ্মশানকে তাড়াইতে চায়, যাহা পবিত্র, যাহা মহামহিমাপূর্ণ, সংসার তাহাকে তাড়ায়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তাই শ্মশান লোকালয় হইতে দূরে, তাই শ্মশানের হাওয়া গায়ে লাগার ভয়ে মানুষ শ্মশানপথে চলে না। হে মানব, তুমি এত করিলেও জানিও—শ্মশান বিজন নহে। শ্মশানে আমার শবাসনা মা আছেন, শূলপাণি পিতা আছেন। শ্মশানে বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, শ্মশানে টাকা নাই, কড়ি নাই, শ্মশানে স্নেহ নাই, মমতা নাই, শ্মশানে অস্থিরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। মহাঘোরা তামসী রজনীতেও তথায় চিতাবহ্নি ধূ ধূ জ্বলিতেছে। সেই আলোকে আমার সর্ব্বকালের জনক জননী, আমার চির পিতা মাতা চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া, অস্থিমালা গলে পরিয়া, আনন্দে বিরাজমান রহিয়াছেন।

"যেখানে শিবশক্তি, যেখানে ব্রহ্মশক্তি, যেখানে পিতামাতা থাকেন, সেস্থান যদি অপবিত্র হয়, তবে পবিত্র স্থান কোথায়,—জানিনা। কিন্তু সংসার ইহাকে অপবিত্র বলে। সংসার পিতামাতাকে তাড়াইয়া বন্ধুবান্ধব ও কামিনীকাঞ্চন লইয়া মজে। সংসারের লোক পিতামাতাকে ভাত দিতে চাহে না, কিন্তু বারবিলাসিনীর জননীকে মস্তকে লইয়া নাচে। সংসারের গতিই বিচিত্র! যে এই বিচিত্র ক্রীড়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে চায় শ্মশান। শ্মশানে যাইবার অধিকারী সেই, যাহার আর নড়চড় নাই, যাহার কোনও সাড়াশব্দ

নাই। তত্ত্বপক্ষে, যে মানব-অন্তরে আমিত্ব নাই, যে আর আপনার ইচ্ছায় চলে না, যে আর সকাম কর্ম্মে ফেরে না, যাহার প্রাণে আর বাসনা নাই, কামনা নাই, লালসা নাই, যাহার এ সংসারে আর বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, যাহার আর এ জগতসুখের আকাঙ্ক্ষা নাই, সেই অন্তরই শ্মশান। নিষ্কাম অন্তরই শ্মশান। তাহাতে যে চিতাবহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার নাম জ্ঞানাগ্নি। এই জ্ঞানাগ্নিতে যত কিছু লালসা বাসনা শবরূপে ভস্মীভূত হইতেছে। এই চিতার ইন্ধন সাধুসঙ্গ বা মহাজন সহবাস। যত সাধুসঙ্গ করা যায়, যত মহাজন-চরিত অনুসরণ করা যায়, এ শ্মশানের চিতা ততই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই চিতার যে ভস্ম, তাহাই শিব শিবা অঙ্গে ধারণ করেন। অর্থাৎ যে সমস্ত বাসনা ও কামনা, তুমি পিতামাতাকে লাভ করিবার জন্য জ্বালাইয়া দিলে, সেগুলি তাঁহাদেরই এক প্রকার ঐশ্বর্য্য—সংসার নিয়োগে প্রযোজিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পদাশ্রিত ব্যক্তি আর সেগুলিকে ঐশ্বর্য্যরূপে দেখিতে পায় না, তাহার চক্ষে সেগুলি পিতামাতার অঙ্গের ভস্মরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আর যে অস্থিমালা তাঁহাদের গলে শোভা পায়, উহা ভক্তজনের স্মৃতিস্তম্ভ বিশেষ। অস্থি ভিন্ন যেমন জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব, সেই প্রকার সাধু মহাত্মগণ এই জগতের অস্থি-বিশেষ, অর্থাৎ তাহারাই জগতের আদর্শ-জীব, আদর্শ-প্রাণী, সকলের শিক্ষাস্থল। তাই জগতপিতা ও জগজ্জননী সকলকে দেখাইবার জন্য, তাহাদের কীর্ত্তি অস্থিরূপে গলদেশে ধারণ করিয়া, শ্মশান আলো করতঃ সদানন্দে বিরাজমান আছেন।

"বুঝিলাম—প্রকৃত শ্মশান কি। কোন শ্মশানে পুড়িলে বাস্তবিক গতাগতি বন্ধ হইয়া যায়, কোন শ্মশানে ভস্মীভূত হইলে, আর জগৎ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, কোন শ্মশানে গেলে একেবারে নিবৃত্তি। হে মঙ্গলময় পিতা, হে হ্লাদিনী জননী, এ দীন সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, আমার হৃদয় শ্মশানরূপে পরিণত হউক; তোমরা সেই শ্মশানে আসিয়া সদারঙ্গে নৃত্য করিতে থাক। আমার আমিত্ব বিনাশ করিয়া, তোমরা আমার অন্তরে প্রকাশিত হও। আমি তোমাদের অভয় চরণ সার করিয়া, এ জগৎ সংসার ভুলিয়া যাই।"

এই কয়টী কথা পাঠ করিলে কাহার না স্মরণ হইবে—শ্মশান আমাদের একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি। আর যা কিছু আপনার বস্তু বলিয়া মায়া করিতেছি, সকলই অনিত্য—আপনার বস্তু নহে। এই পবিত্র স্থানে আমাদের পিতা মাতা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—পিতা যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণ—মাতা নরকপালিনী—মা শ্যাম

রণোন্মত্তা। এই স্থানে চিরবাস লইয়াছেন কেন, গ্রন্থকারের এই "শ্মশান"-পুষ্পনিঃসৃত সুগন্ধে বেশ প্রতীয়মান হইবে। সাধনায় প্রাথমিক শিক্ষাই বৈরাগ্য-সাধন। এ কারণে এই পুষ্পটী, সকল পুষ্পের অগ্রে গ্রন্থকার বসাইলে বেশ যেন—অন্ততঃ আমার মনের মত সাজান হইত। সে যাহা হউক, বস্তু লইয়া কথা, সাজানতে কি আসে যায়? তবে ব্যক্তিগত মনোভাব একটু প্রকাশ মাত্র। মুখবন্ধের স্থানান্তরে ভক্ত গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি হৃদয়পাত্রে আকুলতা-ব্যাকুলতারূপ তুলসী চয়ন করিয়াছেন, যিনি মানসথালে শ্যামলসুন্দর নিষ্কলঙ্ক তীব্রবৈরাগ্যরূপ দূর্ব্বাদল বাছিয়া আনিয়াছেন, যাঁহার প্রাণের করুণ-ক্রন্দন-সুরভিচন্দনে পরিণত হইয়াছে, যাঁহার দেহ, মন, প্রাণ, ধন, জন, সর্ব্বস্ব, দেবতার নৈবেদ্যরূপে সুসজ্জিত রহিয়াছে,—তিনি যখন এই সমস্ত একত্রিত করিয়া, 'জয় নাথ, তোমারই জয়' রবে ডঙ্কা বাজাইয়া প্রেমফুল সহযোগে ঈশ্বরপূজায় প্রবৃত্ত হন, তখন কোন্ ফুলের সৌরভ ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে? এই প্রকার দেবরঞ্জন পূজার ফুল ও উপকরণ যিনি সংগ্রহ করিতে পারেন, অভীষ্টদেবতা তাঁহার পূজা লনই লন, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হনই হন। তিনি প্রাণপ্রিয়কে লাভ করিয়া তাঁহারই প্রেমে বিভোর থাকেন। এ জগৎ সংসার তাঁহার নিকট তুচ্ছ।" ভক্তের কথা—প্রাণের কথা। উপলব্ধির কথা—ধর্ম্মজীবনে ধর্ম্মনীতির প্রয়োযোগিতার কথা। এ কথায় প্রাণ আকৃষ্ট করিবেই করিবে। মিথ্যা হইবার নহে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে পুষ্পটী ধরিয়া তুলিবেন, ভক্ত ও প্রেমিক পাঠক পাঠিকা সেইটীরই আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বিভোর হইবেন ও আলোক অনুসন্ধান পাইবেন। এই পুষ্পগুলিতে আরও একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। আমার বেশ মনে হয়—জগৎসেব্য সেই কাঙ্গালের পিতা মাতা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণকথিত ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব পংক্তিতে পংক্তিতে ছত্রে ছত্রে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই পুরুষোত্তমের ধর্ম্মোপদেশ যেন তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া গিয়াছে। এই মহা সমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ গ্রন্থকারের জীবনের উপর অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া আমার স্পষ্টই মনে হয়। তাঁহার "এক ঈশ্বরই সকলের উপাস্য" প্রথম পুষ্পে উহার সজীব প্রমাণ দৃষ্ট হয়। আর একটী মাধুর্য্য—গ্রন্থকারের পুষ্প চয়নের মধ্যে দেখিয়াছি। তিনি প্রকৃতি-সেবক কবির মত আধিভৌতিক কোনও কিছু সম্বন্ধে বলিতে বলিতে হঠাৎ আধ্যাত্মিক-জগতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষিতত্ত্ব" সম্বন্ধে বলিতে বলিতে রামপ্রসাদের 'কৃষি-কাজের' তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। এ পুষ্পে

এমন সুন্দর গন্ধ বাহির করিয়াছেন যে, ভক্ত আধ্যাত্মিকতার পরাগে বিভোর হইয়া 'আত্ম-চাষ' যে সাধনার মোক্ষ উপায়—অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের দু একটী পংক্তি জনসাধারণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"এক্ষণে আর একটী চাষের কথা বলিব, যাহা অন্নের ন্যায় অথবা তদপেক্ষাও প্রত্যেকের আবশ্যকীয় বিষয়। এই চাষকে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, আত্মোন্নতি, যোগাভ্যাস বা আত্মচাষ কহে। দেহের পুষ্টির নিমিত্ত, দেহের সুস্থতার নিমিত্ত, দেহের বলাধানের নিমিত্ত, অন্নের যেরূপ বিশেষ প্রয়োজন—আত্মার সুস্থতার নিমিত্ত, আত্মার বলের নিমিত্ত, আত্মার শান্তির নিমিত্ত, আত্মার হাহাকার নিবৃত্তির নিমিত্ত, আত্মচর্চ্চাও সেই প্রকার। অন্ন উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত যেরূপ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে হয়, এইরূপ আত্মার অন্নের জন্য আমাদের দেহরূপ ভূমিতে চাষ দিতে হয়। এই চাষকে সোজা কথায় সাধনভজন কহে। চাষ না করিলে যেমন ফসল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সাধনভজন ব্যতীত কেহ কখন আত্মদর্শন, আত্মতত্ত্ব-লাভ বা ঈশ্বর-সহবাসে সক্ষম হয় না। জমি চাষের সময় বলিয়াছি যে, সর্ব্বাগ্রে অলসতা পরিহার করিতে হইবে, ইহাতেও ঠিক সেই প্রকার আলস্য পরিত্যাগ ও একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। তৎপরে নিজের জমিতে বেড়া দিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের দেহের অবস্থা এবং প্রাণের ভাব একত্র মিলাইয়া, যে ভাবে সাধনভজন করিলে সত্বর সুফল ফলিবার সম্ভাবনা, সেই ভাবের প্রতিকূল যে সমস্ত ভাব, তাহা আপনার ভাবে মিশিতে না দেওয়াকে—বেড়া দেওয়া কহে। যিনি আপনার ভাবে বেড়া দিতে না পারেন, ছাগল গরুর ন্যায় অপরের ভাব আসিয়া, তাঁহার ভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলিবে। তৎপরে কণ্টক বৃক্ষাদির উৎপাটন আবশ্যক, আমাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপ কণ্টক বৃক্ষসমূহ বদ্ধমূল হইয়া বড়ই জাঁকালরূপে গজাইয়া উঠিয়াছে। এই বৃক্ষসমূহের মূল হইতে শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত 'ছুঁই (সূচ) কাঁটা' গাছের ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই কণ্টক বৃক্ষগুলি থাকিতে, এ দেহক্ষেত্র চাষ হওয়া অসম্ভব। তাই এ গাছগুলি কাটিতে হইবে। একেবারে মূল (অনিষ্টকারক ভাব) উঠাইয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা চাষ হইবার আশা করা বৃথা। আমরা দেখিতে পাই যে, অনিষ্টকারী জীব জন্তু হইতে শস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত, চাষারা কণ্টক বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া, তাহাকে বেড়ার ধারে ধারে রাখিয়া দেয়; সেইরূপ যাঁহারা সাধনভজনের

বিঘ্নকারী হইবার সম্ভব, তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদেরও ঐ সমস্ত রিপুরূপী কণ্টক বৃক্ষাদি হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটন করিয়া স্বীয় ভাবের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করা বিধেয়। তৎপরে দুইটী গরুর প্রয়োজন। গাই অথবা ষাঁড় লইয়া চাষের সুবিধা হয় না; দামড়া গরুর প্রয়োজন। আত্মচাষ করিতে হইলেও ঠিক সেইরূপ। মনের সাংসারিক কোনও পদার্থে আকর্ষণ বা আসক্তি থাকিলে, মন দুর্ব্বল থাকে, সেই মনে চাষের সুবিধা হয় না। সুতরাং সাংসরাসক্তি বিনাশক দুইটী দামড়া,—বিবেক ও বৈরাগ্যরূপ গরু চাই। এই বিবেকবৈরাগ্যরূপ দামড়া গরু যে সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহার জমি চাষ হইবেই হইবে। ইহার ঘাড়ে জোঙ্গাল অর্থাৎ মনকে চাপাইয়া দিতে হইবে। এক্ষণে একজন চাষী বা 'হেলোর' প্রয়োজন, এবং ঐ গরু তাড়াইবার জন্য একখানি যষ্টিরও আবশ্যক। এই 'হেলো'ই গুরু, এবং বিবেক-বৈরাগ্যের কার্য্য নরম পড়িয়া গেলে, তাহাদের উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহার উপদেশ ও তাড়না রূপ লাঠির বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপে জমি কর্ষিত হইলে, তাহাকে মই দিয়া সমান করিতে ও অপরাপর জঞ্জাল বাছিয়া ফেলিয়া সরল করিতে হইবে। জমি সমান এবং জঞ্জাল বাছিয়া ফেলা না হইলে, তাহাতে বীজ ছড়ান যায় না। সেইরূপ যতক্ষণ না অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ আবর্জ্জনারাশি গুরু উপদেশ ও বিচাররূপ মই দ্বারা দূরীভূত হইয়া অন্তর নির্ম্মল ও সরল হয়, ততক্ষণ তাহাকে "বীজমন্ত্র" দেওয়া বিশেষ ফলদায়ক নহে। এইজন্য আমাদের মধ্যে, পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, শিষ্য অন্ততঃ কিছুকাল গুরুর নিকট বাস করিবে, গুরু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে তাহাকে মন্ত্র দিবেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন গুরুকরণ বা মন্ত্র লওয়া পুতুল-খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিঞ্চিৎ অর্থ ফেলিতে পারিলে, আজকাল আর মন্ত্র লইবার অভাব নাই। আজকাল গুরুগিরি ব্যবসা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, তখন শিষ্যকে নিজগৃহে রাখিয়া, শিক্ষা দ্বারা তাহাকে উপযুক্ত করিয়া, তবে তাহার ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান হইত; এবং এখনও যাহারা জমি ঠিক করিয়া মন্ত্রদান করেন, তাঁহাদেরই শিষ্যগণের আত্মক্ষেত্র সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

"বীজবপণের পর জলের আবশ্যক। এই জলকে ঈশ্বর-প্রীতি, প্রেম বা তাঁহার প্রতি ভালবাসার সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। বৃষ্টির অভাব হইলে যেমন কূপ খাৎ বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, সেইরূপ

যতদিন না প্রাণ ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হয়, যতদিন না তাঁহাকেই একমাত্র প্রেমাস্পদ বলিয়া ধারণা হয়, ততদিন বিশেষ অনুরাগ ও ব্যাকুলতা সহকারে সাধুসঙ্গ করার নিতান্ত প্রয়োজন, অধ্যবসায় অবলম্বনে সাধনভজন করার একান্ত আবশ্যক। নিম্ন জমিতে উচ্চ জমি অপেক্ষা শস্য বেশ ভাল হয়। সেইরূপ অভিমানী হৃদয় অপেক্ষা, ঈশ্বরের দাসভাবাপন্ন বিনীত হৃদয়ে, অধিক পরিমাণে ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে।

কখন কখন বন্যা আসে। এই বন্যাকে ভগবৎকৃপা বা তাঁহার অবতারত্বের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। বন্যার জল স্থানাস্থান কোথাও বিচার না করিয়া সমস্ত ডুবাইয়া ফেলে, সেইরূপ অবতারগণ, পাপী, সাধু, দীন, অভিমানী ইত্যাদির বিচার না করিয়াই কৃপাবারি দ্বারা প্লাবিত করিয়া ফেলেন। বন্যার জল অল্পদিন থাকিয়া সরিয়া গেলে, উচু নীচু সকল স্থানেই প্রচুর ফসল হয়, সেইরূপ ভগবান লীলারূপে যেথানে অল্পদিন কার্য্য করেন, তথাকার সকল জীব বিশ্বাসী হইয়া, প্রেমভক্তি লাভ করে, ইহার দৃষ্টান্ত—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ। কিন্তু বন্যার জল যদি বেশীদিন থাকে, তবে নীচু জমির ফসল আদি ডুবিয়া বিকৃত হইতে পারে; অর্থাৎ ভগবান যে স্থানে অবতীর্ণ হয়েন, অথবা অনবরত যাহারা তাঁহাকে দেখে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নয়, যাহারা একটু দুর্ব্বল, তাহারা তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া বিকৃত হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা একটু উচ্চ, যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফললাভ করে। ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার সময়ে নদীয়াধামে দেখা গিয়াছে। অদ্বৈত, মুরারী, শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিত মহাত্মারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন, এবং প্রচুর ফলবানও হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরাপর সাধারণ লোকে "নিমাই পণ্ডিতটা হ'ল কি!" বলিয়া উপেক্ষা করিত। কিন্তু বলিয়াছি, বন্যা সরিয়া গেলে, সেই সমস্ত জমিতে পলি পড়ে, তাহাতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, জমিতে সার হয়; সেইরূপ ভগবান তথা হইতে অপ্রকট হইলে, তথন ঐ সমস্ত লোক তাঁহাকে বুঝিতে পারে, ভবিষ্যতে ঐ সার লাভ করিয়া তাহারা প্রচুর ফলবান হইয়া থাকে।

যাহারা জমি চাষ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যে যত ভালরূপে তাহার জমি প্রস্তুত করিবে, যে তাহার জমি যত ভালরূপে নিড়াইবে, সমান করিবে, চষিবে, তাহার ক্ষেত্রে ততই ভালরূপ ফসলের সম্ভাবনা। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনেকে অসমর্থ হইয়া তাহার জমিতে চাষ দিতে পারে না, সুতরাং

তাহারা 'বরগাতি' দিয়া থাকে। আত্মচাষেও এ 'বরগাতি' রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজে সাধনভজন করিতে অসমর্থ হয়, যে ব্যক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপ কণ্টক বৃক্ষাদি উৎপাটন করিতে অক্ষম হয়, যে ব্যক্তি বিবেকবৈরাগ্যরূপ বলদের সংগ্রহ করিতে না পারে, যাহার 'কেলো' অর্থাৎ গুরু না জোটে, তাহারও জন্য ধর্ম্মরাজ্যে 'বরগাতি' দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই 'বরগাতি' লইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে কেহ সাধনভজনে অক্ষম, যে কেহ কামিনীকাঞ্চনের মোহ-হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ, সে যদি রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, সে যদি তাহার জমির ভার তাঁহাকে অর্পণ করে, তবে ফললাভ করিতে সক্ষম হইবে। তিনি আপনি চাষ করিয়া তাহাকে ফসল প্রদান করিবেন।"

কোনটীকে ধরিব—কোনটীকে ছাড়িব, স্থির করিতে পারি নাই। "চাই কি" পুষ্পটী স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয়—প্রকৃত আমাদের চাহিবার বস্তুটী কি! এখানে কি চাহিবার কি ফেলিবার, গ্রন্থকার বেশ বুঝাইয়াছেন। 'দাস-আমি' পড়িলে প্রকৃতই দীনতার ফোয়ারা হৃদয়মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়। "বিশ্বাস", "ভক্তি", "সংসার ধর্ম্ম" ও "সেবা" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ধর্ম্মপ্রাণ নর নারীকে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা একটু মনোযোগ সহকারে ভক্ত গ্রন্থকারের এই অতি যত্নের বাছা ফুল-কয়টী একবার অন্ততঃ হস্তে তুলিয়া অমর-গন্ধে মৃতপ্রাণ উজ্জীবিত করেন ও কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবন ভগবৎ-চরণে কামনা করি। জীবনের ক্রমোন্নতির দ্বারা ভগবৎ-জীবনের উৎকর্ষ সাধন আরও করিয়া, আমাদিগকে এইরূপ ভক্তিকুসুমের ডালি অকাতরে বিলাইতে থাকুন। পুস্তকখানির মূল্য অতিশয় অল্প। হিন্দুমাত্রকেই এহেন অমূল্য রত্ন গৃহে গৃহে রাখিতে আমি অনুরোধ করি।

সেবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পাগলের কথা।

—:-০-:—

আমি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্বের চতুর্দ্দিক খুঁজিলাম, আপন জুটিল না। প্রচণ্ড রৌদ্রে তপ্ত বালি ঠেলিয়া, দারুণ শীতে তুষারস্তূপ ভাঙ্গিয়া, মুসল বর্ষার দিনে অজস্রবর্ষণ মাথায় পাতিয়া চলিলাম—চলিলাম জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, কই কোথাও কাহাকে আপন বলিতে শুনিলাম না, কেহ ত আমি "তোমার" বলিয়া হৃদয় বেষ্টন করিল না। আমি যাহা চাহি, তাহা আমায় নিকট চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দেয় না কেন? আমি প্রেম চাহি, প্রেম আমার নিকট মৃদুহাস্য না করিয়া অট্টহাস্য করে কেন? সংসার-মায়া-মন্ত্রে কাণ পাতিলাম, ভুবন-ভুলান ভ্রূভঙ্গির দিকে চাহিলাম, ভুজঙ্গ সদৃশ বক্রগতির অনুসরণ করিলাম, সকলই সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ—আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কিন্তু তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ছুটিলাম,—মান নাই, সম্ভ্রম জ্ঞান নাই, জাতি মর্য্যাদা রাখিলাম না, পদ-গৌরব পদদলিত করিলাম, আত্ম-দুঃখকে দেহের সীমা অতিক্রম করিতে দিলাম না, প্রাণ অফুরন্ত যন্ত্রণার রাজ্য হইল, প্রলোভন প্রতি পদে ঠেলিলাম, খুঁজিলাম কেবল আপন, দেখিলাম কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে সাধের বিনিময়। আমি দু'হাত দিয়া নয়ন-যুগল আবৃত করিলাম, বাঁধ মানিল না, দর দর ধারে স্রোত বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম, বিশ্ব ধাঁধাঁর রাজ্য মনে হইল, আমি নিরাশ হইয়া অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে ফিরিলাম। আবার হৃদয়ে বল সঞ্চার হইল—আবার দ্বিগুণ উৎসাহে হৃদয়-বোঝা মাথায় লইয়া পথে হাঁকিতে হাঁকিতে চলিলাম। বলিলাম "আমি পাপস্বার্থে মুদ্রা-বিনিময়ে এ হৃদয় সমর্পণ করিব না—ষড়রিপুর সেবার জন্য অর্থ-প্রয়াসী হইয়া এ চিত্তপট বিক্রয় করিব না—এ বোঝা সমব্যবসায়ীর কাছে পরিবর্ত্তন করিয়া, পণ্যভার বিনিময় করিয়া, আমার নিজ-হৃদয়ের চিত্র একখানি তাহাকে দিয়া তাহার হৃদয়-চিত্র একখানি গ্রহণ করিব।" কিন্তু কেহই কর্ণপাত করিল না—এ পাগলের কথায় একবার ফিরিয়াও চাহিল না—আমি ক্ষোভমনে ফিরিয়া আসিলাম।

তোমরা কি কেউ এ পাগলের নিবেদন শুনিবে? বেশী নয় আমার একটী নিবেদন। আমার নিবেদন এই, আমি তোমার দাস হইব, তোমার আজ্ঞানু-বর্ত্তী ভৃত্য হইব, তোমার ইঙ্গিতমাত্রে আমি কার্য্যে ব্রতী হইব; কিন্তু তোমার

প্রাণের উপর আমার একটা আধিপত্য থাকিবে। তোমার প্রাণে আমার প্রাণ এক সূত্রে গাঁথা থাকিবে। যেন তুমিই আমি, আমিই তুমি, দু'জনে সমযোগে সংসারে ঈশ্বরত্ব উদ্বোধন করিব, সাধ্যমত জগতের কল্যাণ সাধন করিব, প্রাণ খুলিয়া লোককে ভালবাসিব, পরসুখে হাসিব, পরদুঃখে কাঁদিব, এবম্বিধ "তুমি আমি" "আমি তুমি" হরিহরের সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমার ইচ্ছা। তোমার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি মরিব, আমার মৃত্যু-দুর্লভ সুখ শান্তির আধার সাধারণ ঈর্ষোদ্দীপক জীবন বায়ুরাশিতে ডালি প্রদান করিব, তোমার জন্য আমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিব, তুমি আমার হইবে কি? তুমিও আমার জন্য তোমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিবে কি?

কই কেউ ত উত্তর দেয় না—এ পাগলের কথায় কেহ ত কোন উত্তর করে না? তবে আর আমি বৃথা চীৎকার করিতেছি কেন? আপন ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা, মাতা প্রভৃতি কাহারও হৃদয় যখন স্বচ্ছ দেখিলাম না, তখন কোন্ আশায় আমি পরের হৃদয়-লাভে চীৎকার করিতেছি? যাকে ভাবি ইনি আমার প্রাণের বন্ধু, অকপট আত্মীয়, রামকৃষ্ণের যুগল-মিলনে অংশভাগী, হায়! হায়! পর মুহূর্ত্তে দেখি সে সব আত্ম-স্বার্থ-সাধনে উদ্যোগী! পরকে কি দোষ দিব, আজকাল সহজ ভ্রাতা সহজেই বৈরী হইয়া বসেন। সবল সুস্থ, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া ভ্রাতার সংসারে জলের ন্যায় স্বোপার্জ্জিত ধন বর্ষণ কর, সহোদরের আলিঙ্গন পাইবে, রোগের সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার আসিয়া ব্যবস্থা করিবে, ঔষধ খাওয়াইবে। বহুকাল পীড়িত অথবা জরাগ্রস্ত থাকিয়া মুদ্রা-স্রোতের আশা বন্ধ কর, এতাবৎ কালের প্রতিদানও ক্রমে ক্রমে লাভের নিরাশায় স্থগিত হইবে। ভ্রাতা যদি আবার আরও বর্ত্তমানকালের বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অকর্ম্মণ্য ভ্রাতাটীর অক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে পৈতৃক এবং অপরাপর ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতারিত করিতেও ইতস্ততঃ করিবেন না। বলিতে কি, মাতার স্নেহও যেন আজকাল কি জানি কেন স্বার্থের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীচরণে কিছু সমর্পণ কর, মস্তকে ধান দূর্ব্বা পাইবে; দেও—মিষ্ট কথা শুনিবে, নইলে কুকুর বিড়ালের জঘন্য অন্ন। নর নারীর প্রেমসম্ভাষণ কালকূটের উদ্গার অর্জ্জনমাত্র। পিতা সন্তানকে পালন করিয়াছেন, অন্নবস্ত্র দিয়াছেন, শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, ভালবাসেন, পরিণামে বৃদ্ধবয়সে অক্ষমাবস্থায় প্রতিদান পাইবেন বলিয়া। আদান-প্রদান সম্বন্ধ; তাহাও নিষ্কামভাবে নয়,

পরিণামে পুনঃপ্রাপ্তির আশায়, সুদসমেত আসল আদায় করিবার জন্য এ ভালবাসার অছিলা। ধর্ম্মের সবল ও সুদৃঢ় ধ্বজা তুলিবার এখন লোকের বাসনা নাই। ধর্ম্মপ্রাণতা নাই, আছে ধর্ম্মের ছলনা। সকলে এক প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া দণ্ডায়মান হইতে শিখিলেই ধর্ম্মের ধ্বজা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। এই আকর্ষণের নামই প্রেম, ভালবাসা। সে আকর্ষণ দেখিতে পাই না। ভালবাসার ঘটনা বিবিধ ইন্দ্রিয় প্ররোচনায় ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ছাড়িয়া, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি হইয়া গেলে পুনঃ পুনঃ ভোগারামে যখন লালসা একেবারে যায়, তখনই এ প্রেমের ধ্বজা ভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমি ভাবি মানুষগুলো কি অপ্রেমিক, কি প্রেম-রাজ্যের দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা; প্রেম জিনিষটাকেও নিজেদের মত অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে। যে স্বার্থ ভবিষ্যতে অথবা জীবনান্তে নিজেরই অনিষ্টের কারণ, সেই ভ্রমাত্মক স্বার্থকে মাথায় মাথায় রাখিয়া আসল স্বার্থকে পদতলে মর্দ্দন করে! তাহারা বুঝে না যে, আজ যাহা পরিতৃপ্তির—কাল তাহা পরিতাপের; আজ যাহাতে সুমিষ্ট আস্বাদ, কাল তাহাতে গরলের তীব্রতা; আজ যাহা শ্রবণে বীণা-বিনিন্দিত স্বর, কাল তাহা কুক্কুটের অশিবনাদী চীৎকার! আমি জগতের কিছুরই স্পৃহা রাখি না, রাজমন্দির বৃক্ষতল আমার তুল্যজ্ঞান; কদন্ন আমার কাছে দেবভোগ হইতেও প্রিয়তর, কর্ত্তৃত্ব অথবা আধিপত্য অধীনতার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত, ধনরত্নে যে যত্ন, ধূলিরাশিতেও তাহাই,—এ কেন আমার অভীষ্ট মিলে না, জানি না। আমি আড়ম্বরশূন্য জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত, বাহ্য হাবভাবকে অনেকদিন বিদায় দিয়াছি, মাত্র ভাষায় ভালবাসা প্রকাশ আমার প্রকৃতির লক্ষণ নয়, আমার কেন কাম্য পূরে না, বুঝিলাম না। রিপু ষট্‌চক্রের নেমি রেখায় আমি বুক পাতিয়া দিই না, কলহ বিবাদে মনোভঙ্গ করিতে জানি না, তথাপি আমার কাছে কেহ হৃদয় গচ্ছিত রাখিতে চাহে না, বড়ই খেদের বিষয়। আমি ভ্রমেও পরের অনিষ্ট করিতে চাহি না, পরের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আমি অগ্রসর নহি, পর যাহাতে সুখে অবস্থান করে, আমি কেবল তাহাই দেখি। পরকে আপন করিতে আমার ইচ্ছা, পরের কি উচিত নয় আমাকে তাদের আপন করা? এরূপ সংসারের আর উন্নতি হয় কি করিয়া বল? যেখানে নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, সে ধর্ম্ম-সংসার সজ্জিত হইবে কি করিয়া? যে আকাশে নিরবধি ঘনঘটার আড়ম্বর, পূর্ণিমাচন্দ্রের ষোলআনা ইচ্ছা থাকিলেও কি করিয়া

উদিত হইবেন? একি দায়, আমি যে থাকিতে পারি না, আমার অন্তরে যে বিষম-জ্বালা উপস্থিত, হৃদয় যে আর একাকী এ আবাসে থাকিতে পারে না, অনেকদিন এখানে থাকিয়া ইহাতে যে বড়ই বিরক্তি জন্মিয়াছে,—এ যে অন্য হৃদয়কে নিজাবাসে রাখিয়া তাঁর সঙ্গে সখের আলাপ করিয়া কাল কাটাইতে চায়। মাঝে মাঝে আমার হৃদয় প্রতিবাসীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু কেহ কথাটি ক্ষয় করিয়া আলাপ করে না, দূর দূর করিয়া তাড়াইতে পারিলে বসিতে আসন দিতে চায় না। জগতে এ বড় বিস্ময়কর ব্যাপার—যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না; যে যাহার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, তাহার হৃদয়েও আঘাত বাজিয়া উঠে না, আমি যাহার জন্য অন্নজল ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, সে হয়ত অসঙ্কোচে বলে, "আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম না।" কিছু খসাও, কিছুকাল তোষামোদ মন্ত্র তাঁহার কর্ণে জপ কর, পরিশ্রম করিয়া কিছুকাল তাঁহার উপকার করিতেই থাক—মাটী কামড়াইয়া প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া জীবনের কিয়দংশ এরূপ করিতে থাকিলে পর যদি কর্ত্তার চোক কখন ফুটে, কখন তোমার প্রতি একটু প্রীতির নয়ন ফিরান, ইহাই তোমার ভাগ্য। তোমার অন্তর কেহ পরীক্ষা করিবে না, তোমার দ্বারা কতটুকু কাজ হয়, তাহাই প্রথমে দেখিবে; তারপর স্বার্থের মূল্যানুসারে তোমার আদর হইবে। মরিতে বসিয়াও "গেল, গেল, সর্ব্বস্ব গেল" বলিয়া প্রলাপ বকে। বুদ্ধি-বিকারবশতঃ কাকে কিছু দান করিয়া ফেলিলে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কে যেন বুকে বিশ-মণ পাথর চাপাইয়া দেয়। যাঁহার ত্রিকূলে কেহ নাই, তিনিও পরের মাথায় লাঠি মারিয়া পুঁজি-পাটা জবরদস্তি করিতে পারিলে হয়ত সুযোগ ছাড়েন না। ব্রহ্মচারীর কমণ্ডলু বিক্রয় করিয়া যদি সুদের কিছু ঘরে আসে, মহাজন তাহাতেও পশ্চাৎপদ কি না ঠিক জানি না। এখানে সুপরামর্শের মূল্য টাকা। যেমন বিধাতা পৃথিবীর তিল তিল সৌন্দর্য্য লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি স্তর হইতে বিন্দু বিন্দু স্বার্থ লইয়া মনুষ্য জীবনের গঠন। কাকুতি মিনতি কিছু বুঝিবে না, স্বার্থ অগ্রিম লইয়া তারপর তার সঙ্গে রক্ষার বন্দোবস্ত।

আমি সব বুঝি, কিন্তু মন যে আমার প্রবোধ মানে না, কি করি, কাহাকে পাই, আমার প্রাণের বন্ধু কি কেহ হইবে না? জগতের একজনও কি আমায় ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইবে না? তবে জীবন-যাপন একপ্রকার বিড়ম্ব।

দেখিতেছি। হায়! হায়! আপনা হইতে কেহ হৃদয় বিনিময় করিবে না, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া শুধু বর্ত্তমানের ব্যবহার দেখিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না, সরল মুক্ত পথ দিয়া কেহ হাটিবে না, গোপনে গোপনে চলিয়া কাজ সাধিবে। আমি যাহাকে অসঙ্কোচে হৃদয় দান করিলাম, সে আমাকে হৃদয়ের কথা থাক্‌, একটা সরল ব্যবহার পর্য্যন্ত প্রদান করিল না, বরং আমাকে হাবার ন্যায় পাইয়া করস্থিত সূত্রবদ্ধ বানরের ক্রীড়া করাইয়া লইল! কিন্তু যাই হউক, আমি অপর হৃদয়কে আপনার করিবার চেষ্টা করিব। আমার ধ্বংস কিংবা সর্ব্বনাশে যদি একটা হৃদয়কেও উন্নত করিতে পারি, হৃদয়-ভার অনেকটা লঘু হইবে। যদি আমি মরিয়া অপর কাহাকেও মানুষ করিতে পারি—আহার নিদ্রা মৈথুনশীল মানুষ নয়,—যদি একজনকেও প্রকৃত মানুষ করিতে পারি, তবু অনেক স্বস্তি—অনেক অভিপ্সিত সম্পন্ন হয়। হউক আমার উচ্ছেদ—তাহাতে জগতের যৎসামান্য উপকারও যদি হয়, মানুষ হওয়ার একটা ধারা দেখাইতেও পারি, তাহা হইলেও যেন কামনা অনেক পূর্ণ হয়। পরহিত-ব্রতে অর্থাৎ প্রকারান্তরে আত্ম-সদনুষ্ঠানে প্রাণ বিয়োগ কিছুমাত্র অসুখের নয়, কিন্তু জগতের গতি দেখিয়া আমার যে মস্তিষ্ক বিকৃত হইতেছে! তবে কি ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলন আর হইবে না, অংশীকৃত রক্ত সেই এক পরমপিতার বলিয়া স্বীকার করিবে না, আপনার জিনিস আপন হইবে না! উঃ, এ চিন্তা বড় ক্লেশকর! জগতের কলহই দেখিলাম, শুভ সম্মিলন কি আর দেখিতে পাইব না? কে যেন বলিতেছে সে সম্ভাবনা বড় নাই, এখন সংস্কারের গতি অধোদিকে, মাধ্যাকর্ষণের প্রবল বেগের বিরুদ্ধে উৎপাত বহুল আয়াসকর। তবে যদি, যে কয়জন সাধু সাধারণহিতপ্রাণ মহা-প্রেমিক আছেন, তাঁহারা ক্রমাগত আপামর সকলকে ভালবাসিতেই থাকেন, শরীরের উপর যন্ত্রণার রাজ্য করিয়া পর সেবাই করেন, তাহা হইলে যুগ যুগান্তর পরে মানুষ হয় ত আবার পূর্ব্বের মানুষ হইতে পারে, একে অন্যের আপন হইতে পারে, আবার ধর্ম্মের রাজত্ব হইতে পারে, জঘন্য স্বার্থের নিঃশেষে আবার নির্ম্মল পূত স্বার্থ অঙ্কুরিত হইতে পারে।

তবে এস ভাই, সকলে এক হইয়া—এক ভাবে প্রেমপদাঙ্কচিহ্নিত পুণ্যচিহ্নিত মার্গে পদবিক্ষেপ করি, স্বকামপরতা, মিথ্যা, হিংসা, শঠতা, কামুকতা, প্রভৃতি পথ দস্যুভয়ে সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিবে না। একের সম্পত্তিতে যদি অন্যের সম ব্যবহার থাকে, একের মনের উপর যদি অন্যের ক্ষমতা

প্রভুত্ব দেওয়া হয়, যদি পরস্পর সুখ দুঃখ বিভক্ত হইয়া যাইলেও যুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়, যদি ধর্ম্মের শতাংশ শত মূর্ত্তিতে সাহ্লাদে বিলম্বিতভূজে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া শিশু-সুলভ নির্দ্দোষ ক্রীড়া করে, তাহা হইলে সত্যযুগের সূত্রপাত আবার এই ধরিত্রীপৃষ্ঠে দৃষ্ট হইবে—আবার নিবিড় কুয়াশার মধ্যে আলোকরেখা প্রবেশ করিবে—অকালমৃত্যু, অধঃপতন, মনুষ্যত্বহীনতার লোপ পাইবে, মনুষ্য সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম্ম পালন করিবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার, সালিখা অনাথবন্ধু সমিতি কর্ত্তৃক সালিখায় বৃহৎ সমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড়মঠস্থ সন্ন্যাসীভক্তগণ প্রমুখ শত শত ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া উৎসবক্ষেত্র আনন্দধামে পরিণত করেন। সংগীত সংকীর্ত্তন ও স্তবাদি পাঠে এবং কালীকীর্ত্তনে উৎসবক্ষেত্র মুখরিত হইয়াছিল। প্রায় ২০০০ কাঙ্গালীকে পরিতোষরূপে প্রসাদ প্রদত্ত হয়।

গত ২৫শে ফাল্গুন, রবিবার, শুক্লদ্বিতীয়ায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে সেবকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ পূজাদি সম্পন্ন হয় এবং তৎ পরদিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব এবং সেবক রামচন্দ্রপ্রবর্ত্তিত রাজভোগ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। শত শত ভক্ত উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিবস কীর্ত্তন ও জয় রামকৃষ্ণ নাদে যোগোদ্যান আনন্দপূর্ণ করিয়াছিলেন।

২৫শে ফাল্গুন, শুক্লদ্বিতীয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাঁকুড়াজেলাস্থ কোয়ালপাড়া রামকৃষ্ণ-যোগাশ্রমে বিশেষ পূজা পাঠ হোম এবং নামকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সমাগত প্রায় ১৫০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণগণকে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

৩রা চৈত্র রবিবার, বেলুড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠে এবং তদীয় ভিন্ন ভিন্ন নানা স্থানীয় শাখা সমূহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের অঙ্গস্বরূপ সংগীত সংকীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ সর্ব্বত্রই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, আলসুর, বাঙ্গালোরে ঐ তারিখে বিশেষ সমারোহে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। নগরকীর্ত্তন ও কাঙ্গালী-ভোজন প্রভৃতি কার্য্য, বিশেষ অনুরাগের সহিত নিষ্পন্ন হয়।

৯ই চৈত্র, শনিবার, দোলপূর্ণিমার দিবস, যশোহর চেঙ্গটীয়া-ধর্ম্মাশ্রমে সেবক-সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ উৎসবের বিশেষ অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১০ই চৈত্র, রবিবার, হবিগঞ্জনিবাসী রামকৃষ্ণসেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষ সমারোহে উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উৎসবক্ষেত্রে কীর্ত্তনানন্দের বিশাল তুফান ছুটিয়াছিল। জয় রামকৃষ্ণ নাদের মহারোলে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বসাধারণকে সযত্নে প্রভুর প্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল।

যশোহর, হরিণাকুণ্ড, বিবেকানন্দ আশ্রমে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক ১৭ই চৈত্র, রবিবার, বিশেষ সমারোহে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, সংকীর্ত্তন, কথকতা, জারী প্রভৃতি হইবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল। আজকাল নানাস্থানে ঠাকুরের উৎসব ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা পরম প্রীত ও তাঁহার অপার মহিমায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হইতেছি।

৩১শে চৈত্র, রবিবার, পূজ্যপাদ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইটালী রামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ের ত্রয়োদশ বাষিক উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব এবং তাহার আনুসঙ্গিক দেবার্চ্চনা, সঙ্গীত ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থায় উৎসবক্ষেত্র জনসাধারণের মনপ্রাণ আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রায় ১৫।১৬টী সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ভগবৎ-নামে উৎসবস্থল মহা আরাম ও শান্তিধাম করিয়া তুলিয়াছিলেন। একটী খৃষ্টীয় সম্প্রদায়, একটী ইস্‌লাম সম্প্রদায় এবং একটী মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন আসিয়া ভক্তগণের প্রাণে যে কি আনন্দ দান করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যে প্রাণের উদারতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা দেখিয়া, আমরা ভগবৎ-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীনামের জয়ধ্বনি করিতেছি।

—:০:—

ভিক্ষা

চির　দুখের মাঝে রাখিতে রাখিতে
　　কেন প্রভু, দাও সুখের কণা ?
মোরে　ভুলাইয়া দেয় ধেয়ান তোমার
　　সদা ক'রে দেয় সে আনমনা।
তুমি　দুখ দাও মোরে—কঠোর শাস্তি,
　　সে যে গো আমার পরম সুখ,
তারে　লইব বরিয়া বন্ধুর মত
　　না করিব কভু পরাঙ্মুখ।
যবে　সতত তাহার কঠোর পীড়নে,
　　হেরিব সকলি অন্ধকার ;—
আমি　পরিমাণ মোর পাইব খুঁজিয়া,
　　হবে অনুভূত স্কন্ধভার !
তার　দুর্গম পথে চলিব সহিয়া
　　নিয়তির কত তিরস্কার,
দিবে　সান্ত্বনা তবে ত্রস্ত আমারে
　　চির-ভাস্বর পুরুষকার।
হেরি　আমাতে পূর্ণ শত সহস্র
　　সঙ্কটময় অস্ত্রলেখা,
হবে　জগৎ পৃথক, নিভৃতে তোমার
　　নাম নিয়ে আমি রহিব একা।
তবে　একাগ্র-চিত্ত যাতনা-ক্লিষ্ট,
　　শত ক্রন্দন-ধ্বনিতে মোর,
সদা　ডাকিব তোমায় কাতর-কণ্ঠে
　　তোমারি ধেয়ানে রহিব ভোর।
তুমি　কাঙ্গালের সখা, বিপদ-বন্ধু,
　　ধ্রুব হবে তায় তোমার বুক ;—
মোরে　দাও প্রভু, শত যন্ত্রণা—যাহে
　　পূর্ণ দিব্য মহান্ সুখ।

শ্রীনলিনীকান্ত [illegible]।

একটী গান।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দয়া ক'রে দেখা দে মা তনয়ে।
কার কাছে যাব কারে জিজ্ঞাসিব
কোথা আছ তুমি আঁধারে লুকায়ে॥

কেহ বলে তব কৈলাসেতে বাস,
কেহ বলে জীবে সর্ব্বদা প্রকাশ,
কেহ বলে তব শিব-শিরে বাস,
কেহ বলে থাক তুমি হিমালয়ে॥

কেহ বলে তুমি বৈকুণ্ঠে বিরাজ,
কেহ বলে তুমি সালোক্য সাযুজ্য,
কেহ বলে তুমি বিভাগে বিভাজ্য,
কেহ কাঁদে ব'সে অন্ত নাহি পেয়ে॥

কেহ বলে আছ কাশী বৃন্দাবনে,
শিবকৃষ্ণরূপে স্বরূপ গোপনে,
কেহ বলে আছ মথুরা-ভবনে,
নিত্য মধুবনে মাধব সাজিয়ে॥

যোগী যতী-জন বসি যোগাসনে,
অন্ত নাহি পায় অনন্ত কারণে,
নিজে নারায়ণ ভ্রমে বনে বনে,
যজ্ঞেশ্বর র'ন্ চরণে পড়িয়ে॥

রূপে অপরূপা বা বিহীন স্বরূপা,
কেহ বলে তুমি নিজেই অজপা,
কেহ বলে তুমি ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপা,
সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড নিজে প্রসবিয়ে।

বিচার আচার যোগ যুক্তিহারা,
সাধন ভজন জানিনে মা তারা,
দেখা দাও দীনে দীনদুঃখহরা,
জনম মরণ দাও মা ঘুচায়ে ॥

শিখায়ে দিয়েছ ওমা, মা মা বুলি,
শয়নে স্বপনে তাই মা মা বলি,
ছেলে যদি ডাকে মাকে মা মা বলি,
মাতা কিগো পারে থাকিতে লুকায়ে ॥

পাষাণের মেয়ে পাষাণহৃদয়,
একথা এখন হয় মা প্রত্যয়,
নইলে জননী কতকাল রয়,
অঞ্চলের-ধন সন্তান ছাড়িয়ে ॥

পড়েছি বিপাকে অকূল পাথারে,
এস মা পাষাণি, থেকনা অন্তরে,
শকতি সঞ্চার, প্রকাশ অন্তরে,
ধন্য হই আমি নয়নে হেরিয়ে ॥

সেবক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

অর্ঘ্য-মঞ্জরীর সহিত আমার চির-সম্বন্ধ সত্বেও গত ১৩১৩ সাল হইতে বর্ত্তমান ১৩১৯ সাল অবধি আরও বিশেষভাবে সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু আমার শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ আগামী ১৩২০ সাল হইতে এই পত্রিকার পরিচালন ভার আমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী যোগোদ্যানস্থ শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতৃগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। আমার আশা ও বিশ্বাস—তাঁহারা এ ক্ষুদ্রজনাপেক্ষা শতগুণ সুচারুরূপে এই পত্রিকা পরিচালনে সক্ষম হইবেন।

এই পত্রিকা প্রকাশে মাঝে মাঝে আমার বিলম্ব-ত্রুটী ঘটিয়াছে, আপনাদের সমীপে আমি তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বিশ্বাস, আপনাদের সহৃদয়তা

গুণে, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। পত্রিকার আদি হইতে ইহার উন্নতি এবং সেবা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও কামনা, আমার ক্ষুদ্রশক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আমি বরাবরই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং চিরদিনই সে সম্বন্ধে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটী করিব না। আপনারা কৃপাগুণে এ অধীন ও অকৃতিজনকে স্নেহ করেন—ভালবাসেন—তাহা আমি আমার ষোড়শবর্ষের অভিজ্ঞতায় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। আপনাদের এ মহত্ত্ব আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আমি সে জন্য আপনাদের চিরমঙ্গল কামনা করি, তিনি আপনাদিগকে ধর্ম্ম, প্রীতি ও শান্তির পথে উন্নীত করুন। এইক্ষণ মাঝে মাঝে তত্ত্ব-মঞ্জরীতে প্রবন্ধাকারে আমি আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিব। আশা করি, এ দীনের প্রতি আপনাদের চির সহানুভূতি থাকিবে।

তত্ত্ব-মঞ্জরী শ্রীশ্রীঠাকুরের বার্ত্তাবহ, এবং ইহা আমার পরমপূজ্য আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার অমরত্ব আমার আন্তরিক কামনা। আপনারাই তদুদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র সহায়। সেই জন্য আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, আপনারা তত্ত্ব-মঞ্জরীকে এতাবৎকাল যেরূপ সমাদরের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, চিরদিনই সেইরূপ সমাদরের সহিত দেখিবেন, এবং উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সকলে সহায়তা করিবেন। আপনারা এইক্ষণ আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন ঠাকুরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাপন করিয়া যাইতে পারি। দিন দিন গণাদিন ফুরাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছি। এখন যে কয়দিন দুনিয়ায় থাকি, আপনাদের শুভ আশীর্ব্বাদই যেন আমার সম্বল হয়।

আপনারা অনেকে পত্রাদির দ্বারায় আমার সহিত প্রীতির যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, আশা করি সে সম্বন্ধ রাখিয়া আমাকে ধন্য করিবেন।

তবে এখন বিদায় হই! অনুমতি দিন।

চিরানুগ্রহপ্রার্থী—

সেবক—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।